শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ

মোঃ আশরাফুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

মে ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

RB
B
891.443009
ISS

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আশরাফুল ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত 'শামসুদ্দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

২৪.০৫.২০০৭

(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

425589

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষে নাম নিবন্ধন করি। পিএইচ ডি গবেষণায় নিবন্ধন দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিলো আমার অন্যতম শ্রম-উৎস। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের দুষ্প্রাপ্য টেক্সট সংগ্রহ থেকে শুরু করে সর্ব বিষয়ে স্যারের সুচিন্তিত পরামর্শ, নির্দেশনা ও মীমাংসা আমার গবেষণাকর্মকে অনেক সহজসাধ্য করে দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম।

অন্বিষ্ট বিষয় নির্বাচন, গবেষণা-পরিকল্পনা ও বিষয় মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন-এর সুচিন্তিত অভিমত ও প্রাজ্ঞ বিবেচনা আমার অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর করে দিয়েছে। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে গ্রন্থ সাহায্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাঁরা আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর বেগম আকতার কামাল ; প্রফেসর ডক্টর রফিকউল্লাহ খান ; প্রফেসর ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

425589

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ফিরোজ মাহমুদ খান, মোঃ হুমায়ুন কবির ও বন্ধু মোয়াজ্জেম-এর সহযোগিতা সতত স্মরণীয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মিল্টন বিশ্বাস তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গ্রন্থ দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে ঋণী করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করছি আমার সাবেক কর্মস্থল রাজবাড়ি সরকারি কলেজের সহকর্মীদের ও বর্তমান কর্মস্থল সরকারি তোলারাম কলেজের সহকর্মীদের নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার কথা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ও গণ-গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারের সাবেক কর্মী রশিদ মিয়ার সহায়তার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি।

সংসারের প্রাত্যহিক কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমার গবেষণা কাজে সতত সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন আমার বাবা-মা, ছোটবোন তিথি ও ভগ্নিপতি বন্ধু রানা এবং সহধর্মিণী কস্তুরী পারভীন। তাঁদের সাথে আমার সম্পর্ক ধন্যবাদের ঊর্ধ্বে।

২৪.০৫.২০০৭

(মোঃ আশরাফুল ইসলাম)

Dhaka University Institutional Repository

সূচী

	পৃষ্ঠা
অবতরণিকা	৬
প্রথম অধ্যায় : নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর তাত্ত্বিক পরিচিতি	৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের জীবনকথা ও মানসগঠন	২৭
তৃতীয় অধ্যায় : শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাস : নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ	৪০
প্রথম পরিচ্ছেদ : শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাস : গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ	৪১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাস : নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ	৯১
চতুর্থ অধ্যায় : শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্প : নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ	১০১
প্রথম পরিচ্ছেদ : শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্প : গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ	১০২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্প : নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ	১২৬
উপসংহার	১৪৩
পরিশিষ্ট	১৪৫
সহায়ক-গ্রন্থ	১৪৬
শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম : জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি	১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) জীবনবোধ গঠিত হয়েছে সমকালীন জাতিক - আন্তর্জাতিক নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, আর্থ-সামাজিক পটভূমি – ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবনবোধের যে স্বরূপ অঙ্কন করেছেন, তাতে পরাধীন ভারত, পশ্চিমা উপনিবেশের অধীন স্বদেশ এবং বাংলাদেশে জীবন সংগ্রামে মুখর মানুষ, পরাধীনতার গ্লানিতে তাদের পীড়িত আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অরাজকতা বিশেষত মধ্যশ্রেণী ও নিম্নবর্গের যাপিত জীবনের খুঁটিনাটি এবং আধুনিকতার বিকাশ ও পরিপুষ্টিসহ সমকালের একটি সার্বিক প্রতিভাস ফুটে উঠেছে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কালিক চেতনায় তাঁর সময়ের পরাধীন ভারতের মধ্যশ্রেণী ও নিম্নবর্গ যে অনেকান্ত বিষয় ও অনুষঙ্গের প্রতিবেদন সৃষ্টি করেছে সেই আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক চিহ্নসমৃদ্ধ ছবিতেই তাঁর জীবনবোধের স্বরূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে – প্রাসঙ্গিকভাবেই যা আধুনিক কথাসাহিত্যেও প্রতিভাত। আবার স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণী ও নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন পেশাজীবী ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর নিরন্তর জীবনসংগ্রাম তথা অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধও শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে বিধৃত। পরাধীনতা পরাধীনতাই। যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর একটি অবদমনজাত নঞর্থ রয়েছে তেমনি ভৌগোলিক স্বাধীনতায় বসবাসকারী স্বাধীন মানুষের অর্থনৈতিক পরাধীনতাও কম গ্লানি ও অবদমনের জন্ম দেয় না। এদেশের মধ্যবিত্ত যেমন উচ্চবিত্তের কাছে অনেক বিষয়ে পরাধীন, এ দেশের নিম্নবিত্ত ও ছিন্নমূল সমাজের বাসিন্দারাও পরাধীনতার শৃঙ্খলেই বাধা পড়ে আছে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের তথাকথিত রুচি ও আর্থিক সচ্ছলতার বেড়াজালে। আমাদের বর্তমান অভিসন্দর্ভে এই নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে কীভাবে রূপায়িত, তা-ই শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ' শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে 'প্রসঙ্গকথা', 'উপসংহার' ও 'জীবনপঞ্জি' ব্যতীত চারটি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর তাত্ত্বিক পরিচিতি উপস্থাপিত হয়েছে। পশ্চিমে এই দুই শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে ভারতবর্ষে এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর চারিত্র্য লক্ষণ বিশ্লেষিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণের নানাদিকও আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে শামসুদ্দীন আবুল কালামের মানসগঠন ও জীবনবোধের মৌল সূত্র সমূহ। শামসুদ্দীন আবুল কালামের জীবন-ইতিহাস ও মানসগঠনের প্রধান স্তরগুলোর বিবেচনা করে তাঁর মানসতার নাগরিক ও গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর সাধারণ মানুষের কথা নিপুণভাবে বলার কারণসমূহ শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এ-পরিচ্ছেদে।

তৃতীয় অধ্যায়ের দুটি পরিচ্ছেদে শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাস অংশে গ্রামীণ ও নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন যেভাবে রূপায়িত হয়েছে তা বিশ্লেষিত হয়েছে। এ পর্যন্ত শামসুদ্দীন আবুল কালামের তেরটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যুর পরে *কাঞ্চনগ্রাম* (১৯৯৮) ছাড়াও *অন্যদিন* ঈদসংখ্যা – ২০০৫ এ *কূল উপকূল* ও *প্রথম আলো* ঈদ সংখ্যা – ২০০৬ এ *বয়ঃসন্ধিকাল* নামক দু'টি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। শেষোক্ত উপন্যাস দু'টি এবং বিদেশি পটভূমিকায় রচিত *মনের মাঝে ঠাঁই* (১৯৮৫) উপন্যাসটিতে আমরা নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবনের তেমন রূপায়ণ লক্ষ করি না। তাই এ তিনটি উপন্যাস আমাদের মূল্যায়নের বাইরে থেকেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের দু'টি পরিচ্ছেদে শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে গ্রামীণ ও নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন যেভাবে রূপায়িত হয়েছে, তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছয়টি ছোটগল্পগ্রন্থই এ পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে শামসুদ্দীন আবুল কালামের ভাষা ও সংলাপরীতি বিশ্লেষিত হয়েছে।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের রচনাসংগ্রহ নেই। স্বতন্ত্র গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে বর্তমান আলোচনায়, যা *পরিশিষ্ট* অংশে সংযুক্ত *মূলগ্রন্থ* উপ-শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণী: তাত্ত্বিক পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর তাত্ত্বিক পরিচিতি

নিম্নবর্গ

সমাজ কাঠামোর তলানিতে পড়ে থাকা সামাজিকভাবে অ-গুরুত্বপূর্ণ, অর্থনৈতিক দিক থেকে নিম্ন আয়ের এবং সার্বিকভাবে সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর অধীন যে মানবগোষ্ঠী তা-ই নিম্নবর্গ (Subaltern)। লক্ষণীয় এটাই যে যতই গুরুত্বহীন বা ক্ষমতাহীন হোক তলানিতে অবস্থিত নিম্নবর্গীয় এই জনগোষ্ঠীটি, সমাজ কাঠামোর বাইরে কিন্তু তার অবস্থান নয় এবং সংখ্যায়ও তারা নগণ্য নয়; অথচ প্রচলিত ইতিহাসে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নেই। একটি সমাজবৃত্তের পরিধিতে (Periphery) অবস্থান করে এই নিম্নবর্গ, যে পরিধির অব্যবহিত পরেই মোটামুটি অনুপস্থিত মানুষের গড়া সমাজ কাঠামোর চিহ্ন। সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নবর্গই সমাজ কাঠামোর সীমান্ত, যার ওপারে উঁকি দিলে দেখা মিলবে না আর কোন নিম্নতর সমাজস্তরের। তবে এ হলো স্থূল অর্থে এবং মোটা দাগে আঁকা নিম্নবর্গের চিত্র। সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক অর্থে একটি সমাজের কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকে বা মর্যাদার দিক থেকে নিম্নস্থিত, পরাধীন জনগোষ্ঠীই নিম্নবর্গ নয় বরং সমাজ অভ্যন্তরে যে গোত্র, ধর্ম, পেশা, প্রতিষ্ঠান তথা ভাবাদর্শগত বিষয়াবলী রয়েছে তার ভেতরও যারা নিম্নস্থিত, অধীন এবং অপাঙ্‌তেয় তারাও নিম্নবর্গ পদবাচ্য।[১] নিম্নবর্গের উপেক্ষিত জীবনেতিহাস উপস্থাপন এবং তার ব্যাখ্যার বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান-শাখার উদ্ভব হয়েছে, যা Subaltern Studies নামে পরিচিত। Subaltern Studies নিম্নবর্গের যাবতীয় ইতিবৃত্ত ব্যাপকতর ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধানী বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে তুলে ধরে। তাই নিম্নবর্গকে ভাল করে বুঝতে হলে Subaltern Studies -এর উদ্ভব এবং বিকাশকেও জেনে নেওয়া দরকার।

পরিপ্রেক্ষিত

যে-সব অনুষঙ্গ বিশ শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে Subaltern Studies -এর উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিত রচনায় পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. প্রচলিত ইতিহাস চর্চায় উপেক্ষিত নিম্নবর্গ

একই সমাজ কাঠামোয় এবং সময়ের পটভূমিতে অবস্থান করেও নিম্নবর্গ বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে প্রচলিত ইতিহাস চর্চায়। ভারতবর্ষের প্রচলিত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে হয় পৌরাণিক কাহিনীর অনুষঙ্গ হিসেবে পার্থিব জীবনের প্রতিভাস কিংবা রাজা-বাদশা ও তাদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধিত্বকারী উচ্চবর্গের কাহিনী সন-তারিখসহ আড়ম্বরপূর্ণভাবে সন্নিবেশিত ; যেখানে বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত সে-সময়ের বৃহত্তর শ্রমজীবী খেটে খাওয়া নিম্নবর্গের জীবন-চিত্র। প্রচলিত ইতিহাস বিদ্যার এই অপূর্ণাঙ্গতা প্রকৃত ইতিহাসবিদ্যার চারিত্র্যলক্ষণ নয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ইতিহাসচর্চার সনাতন ধারা সম্পর্কে রণজিৎ গুহের ব্যাখ্যা – 'কিন্তু প্রভুর জীবনই যেহেতু প্রজা ও রাষ্ট্রের জীবনের একমাত্র প্রতিভূ, তাঁর প্রতিভা ও কীর্তির ছটায় উজ্জ্বল অথচ সংকীর্ণ ক্ষেত্রটির বাইরে সবটাই অন্ধকার ছিল। তাছাড়া আরও একটা কথা ভাবতে হবে। রাজরাজড়ার নামাঙ্কিত এই রচনাগুলিকে কি সত্যিই ইতিহাস বলা যায়? এগুলি সমসাময়িক ও আঞ্চলিক তথ্যের আকর সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীতকাল সম্পর্কে পরিপ্রেক্ষিতের যে গভীরতা ইতিহাসবিদ্যার প্রধান লক্ষণ তার অভাব এর রচনায় তো খুবই স্পষ্ট।'[২] প্রচলিত ইতিহাসের এই অপূর্ণাঙ্গতা, যথোচিত পরিপ্রেক্ষিতের উপেক্ষা তথা বর্ণিত সময়ের প্রকৃত ও সমগ্র সমাজচিত্রের উপস্থিতির অভাবই নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছে।

খ. ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের সমালোচনা

'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস রচনায় দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে আসছে।'[৩] রণজিৎ গুহর Subaltern Studies, Vol-1-এর প্রথম বাক্যে উচ্চারিত এই ঘোষণা বাস্তবিকই অর্থময় হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় একদিকে ব্রিটিশ ও মার্কিন ঐতিহাসিক তৎকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কেবল হাতে গোনা উচ্চবর্গের নীতিহীন, আদর্শহীন কৌশলরূপে আখ্যায়িত করার প্রয়াসী হয়েছেন ; আবার দেশীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা তার প্রতিবাদে জাতীয়বাদী আদর্শের কথা, জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণের কথা জোরেশোরে প্রচার করছেন। রণজিৎ গুহ-র প্রবন্ধে ঘোষণা করা হল, এই দুই ইতিহাস আসলে উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত, কারণ দুটি ইতিহাসই ধরে নিয়েছে যে জাতীয়তাবাদ হল উচ্চবর্গের ক্রিয়াকলাপের ফসল। বিবাদ শুধু সেই ক্রিয়াকলাপের নৈতিক চরিত্র নিয়ে – তা সংকীর্ণ ব্যক্তি বা শ্রেণীস্বার্থের সাময়িক যোগফল, নাকি আদর্শ আর স্বার্থত্যাগের জাদুকাঠির স্পর্শে ব্যাপক জনসাধারণের চেতনার উন্মেষ। এই দুটি ইতিহাসের কোনওটাতেই জনগণের নিজস্ব রাজনীতির কোন স্থান নেই।[৪] ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে নিম্নবর্গের প্রকৃত স্থানিক ও কালিক (Time & Space) উপস্থিতির ভূমিকা নির্ধারণের এই তাগিদই রচনা করেছে Subaltern Studies- এর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট।

Dhaka University Institutional Repository

গ. প্রকৃত কৃষক চেতনার স্বরূপ সন্ধান

রণজিৎ গুহ রচিত *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* (Delhi: Oxford University Press, 1983) গ্রন্থে কৃষক বিদ্রোহের প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখানে তিনি দেখিয়েছেন কেবলমাত্র কতগুলো অর্থনৈতিক শর্ত কৃষক বিদ্রোহের স্বরূপ ব্যাখ্যায় যথেষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে এই ব্যর্থ কৃষক বিদ্রোহকে আকস্মিক বা কিছুটা অবাস্তব কল্পনার ফসল বলে মনে হলেও এর পশ্চাৎপটে রয়ে গেছে বিদ্রোহের প্রস্তুতি তথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি অনিবার্য পর্যায়ক্রমিক পর্ব, যে পর্বের সম্পূর্ণতা মুদ্রিত আছে কৃষক চেতনায় – যে চেতনার সৃষ্টি হয়েছে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। নিম্নবর্গের কৃষকশ্রেণীর এই রাজনৈতিক সক্রিয়তা – তার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে প্রকাশিত ও বিশিষ্ট করেছে যা এতদিনের চর্চিত ইতিহাসে ছিল উপেক্ষিত। রণজিৎ গুহ-র এই 'এলিমেন্টারি আসপেকটস্ অব পেজেন্ট ইনসারজেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া' গ্রন্থটি নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার পরিপ্রেক্ষিত তৈরির একটি বীজমন্ত্রের মতো কাজ করেছে।

নিম্নবর্গ-সম্পর্কিত পঠন-পাঠনের উদ্ভব ও বিকাশ

নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার ব্যতিক্রমী ব্রত নিয়ে ১৯৮২ সালে Subaltern Studies-এর প্রথম সংঘবদ্ধ আত্মপ্রকাশ ঘটে রণজিৎ গুহ সম্পাদিত Subaltern Studies I (Writings on South Asian History and Society)[৫] নামে প্রকাশিত প্রবন্ধগুচ্ছের মধ্যে দিয়ে। রণজিৎ গুহ ছাড়াও জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, গৌতম ভদ্র, ডেভিড হার্ডিম্যান, শাহিদ আমন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং ডেভিড আর্নল্ডের সুচিন্তিত ও গভীর নিরীক্ষাপ্রসূত প্রবন্ধ *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এঁরাই সাবলটার্ন স্টাডিজের পথিকৃৎ আর তাই এই সুস্পষ্ট নামাবলির অবতারণা। প্রচলিত ইতিহাসে উপেক্ষিত প্রান্তিক নিম্নবর্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক, আত্মিক তথা রাজনৈতিক জীবনেতিহাসের গুরুত্ববহ প্রতিফলন ও গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার ব্রত নিয়ে Subaltern Studies -এর যাত্রা শুরু হলেও আমরা দেখতে পাই, পথপরিক্রমার দেড় যুগের মধ্যেই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের ন্যায় মনস্বী ও দূরদর্শী সমালোচকের আশীর্বাদপুষ্ট জিজ্ঞাসা আর মার্কিস্ট সমালোচকগোষ্ঠীর বিপ্রতীপ অথচ বিশ্লেষণী সমালোচনার আলোয় Subaltern Studies ঈর্ষণীয় ঋদ্ধি লাভ করে এবং Subaltern Studies -এর এক পর্যায়ের স্বাতিক্রমণ (Transcendence) ঘটে বিষয়-এর সীমাবদ্ধতা থেকে বিষয়োত্তর 'দৃষ্টিভঙ্গি'তে। নানান সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

Subaltern Studies নিজেকেও আরো গভীরভাবে আবিষ্কার করে, স্পষ্টতর করে তোলে তার প্রত্যয়গুলোকে এবং বিস্তৃত করে দেয় তার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে সমস্ত সমাজ কাঠামো আর সে-সমাজের অধীত সামাজিক বিদ্যার তাবৎ অধিক্ষেত্রে। অর্থাৎ Subaltern Studies বর্তমানে আর একটি বিষয় মাত্র নয় যা নিছক নিম্নবর্গেরই ইতিহাস প্রণয়নে ব্যাপৃত বরং যুগপৎভাবে সাবলটার্ন স্টাডিজ আজ সমাজের অপরাপর বিষয়ের দিকে আধুনিক চোখে ফিরে তাকাবার একটি ফলদায়ক দৃষ্টিভঙ্গি বা Approach-ও বটে, যেখানে নিম্নবর্গের জীবন রহস্য উন্মোচনের প্রেরণা থাকে ক্রিয়াশীল।

Subaltern Studies শব্দটির আভিধানিক অর্থ "an army officer lower in rank than a captain"।[৬] দেখা যায়, সামরিক ক্ষেত্রে শব্দটি *ক্যাপ্টেন* পদের অধস্তন সামরিক ব্যক্তিবর্গকে যারা নির্দেশ দিতে নয় বরং পালন করতে অভ্যস্ত, তাদের পরিচয়জ্ঞাপক। প্রচলিত ইংরেজি ভাষায় Subaltern শব্দটি অধস্তন কিংবা নিম্ন মানের অর্থবাহী। এরিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্রে[৭] এই শব্দটির মানে এমন একটি "প্রতিজ্ঞা" যা অপর কোন "প্রতিজ্ঞা"র অধীন। অর্থাৎ Subaltern শব্দটির সকল রকম অর্থ নিম্নস্থিতি, অধীনতা, অপূর্ণতা, অমর্যাদাশীল ইত্যাকার ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে। সাবলটার্ন স্টাডিজ এর অন্যতম মুখপাত্র এবং সাবলটার্ন স্টাডিজের প্রথম খণ্ডের সম্পাদক রণজিৎ গুহ তাই Subaltern শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করে নিয়েছেন "নিম্নবর্গ",[৮] যা বিদগ্ধ মহল কর্তৃক গৃহীতও হয়েছে বলে মনে হয়।

আন্তেনিও গ্রামশি (Antonio Gramsci) তাঁর "Prison Notebooks" এর "Notes on Italian History" অংশে Subaltern শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

"The Subaltern classes, by definition, are not unified and cannot unite until they are able to become a "State"; their history therefore, is inter wined with that of civil society, and thereby, with the history of states and groups of state." [৯]

গ্রামশির এই Subaltern মূলত প্রলেতারিয়েত এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মুসোলিনির সেন্সর ফাঁকি দিতে তৎকালীন ইতালিতে। তথাপি, গ্রামশির Subaltern শ্রেণীর বিশদ ব্যাখ্যা এবং গ্রামশি কর্তৃক প্রস্তাবিত সাবলটার্ন শ্রেণীর ইতিহাস বয়নের ছয়টি[১০] সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনার (পয়েন্টস্‌কে) অনুসরণ ও বিশ্লেষণের পথ বেয়েই আজকের Subaltern Studies -এর বিকাশ ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। Subaltern Studies এনেছে আরো বহু বিচিত্র বিশ্লেষণ ও

Dhaka University Institutional Repository

অনুসন্ধান নিম্নবর্গের ইতিহাস ব্যাখ্যায় ; তার উৎসমুখ যে মনীষী আন্তেনিও গ্রামশিই এটা অবিসম্বাদিত।

তল থেকে দেখা ইতিহাস

ইউরোপে ১৯৭০ এবং ৮০র দশকে History from Below[১১] বা তল থেকে দেখা ইতিহাস লেখার একটি চল আমরা দেখতে পাই। ক্রিস্টোফার হিল, এডোয়ার্ড টমসন, এরিক হবসন প্রমুখ ইতিহাস রচয়িতা তৎকালীন অবহেলিত, যন্ত্র সভ্যতার তলে চাপা পড়া বিস্মৃত জনগোষ্ঠীর ইতিহাস লেখেন যত্নের সাথে। তাঁদের এ ব্যতিক্রমী ইতিহাস রচনার ধারাকে র‍্যাডিক্যাল ইতিহাস রচয়িতারাও ইতিহাসকে অর্থাৎ সমাজকে 'Below' অর্থাৎ তল থেকে দেখতেন অনেকটা যেন ম্যানেজমেন্ট এর "বটম আপ থিওরি"র মতো। Subaltern Studies এর তার সাথে সাদৃশ্য এবং হয়তো বা সামান্য কিছু ঋণও থাকতে পারে এই "History from Below" ধারার লেখকগোষ্ঠীর কাছে, যেহেতু উভয়েরই বিষয় নিম্নবর্গ। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে সত্তর বা আশির দশকের ইউরোপের র‍্যাডিক্যাল ইতিহাস অপেক্ষা Subaltern Studies স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং আধুনিক।

সমগ্র বিশ্বে শোষিত ও নিপীড়িত মানবশ্রেণীর মুক্তিদূতরূপে এককালে আবির্ভূত সমাজতন্ত্রের যখন যবনিকাপর্ব চলছে, পুঁজির বিরাট দৈত্য যখন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ছদ্মবেশে গণতন্ত্রের আর স্বাধীনতার মধুমন্ত্রে পৃথিবীময় অবাধ বাণিজ্যের মুনাফা লুটছে, এমনকি বহুজাতিক কোম্পানি মুনাফায় স্ফীততরো হতে হতে যখন নিজেকে কংলোমারেট (Conglomerate)[১২] রূপে হাজির করে একাই তাবৎ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতায় মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে; সেই বিশাল উন্নয়নযজ্ঞে Subaltern Studies সত্যিই হাজির হয়েছে এক ব্যতিক্রমী মৌলিক বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। নিম্নবর্গকে করেছে তারা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং শোষিত ও শাসিত মানবশ্রেণী সমাজতন্ত্রের অবসানের পর আবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো পূর্ণ গুরুত্ব নিয়ে। Subaltern Studies কে তাই আজ পড়ানো হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সব নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তা সে যে পরিমাণেই হোক। সমাজ নিরীক্ষণ এবং ইতিহাস বয়নে সাবলটার্ন স্টাডিজ এনেছে নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা। এমনকি অর্থনীতি ও সাহিত্যে সাবলটার্ন স্টাডিজ যোগ করেছে নতুন নতুন সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা। সার্বিকভাবে সাবলটার্ন স্টাডিজ আমাদের চেতনায় জাগিয়ে দিয়েছে ভাবনার দরকারি একটি অনুষঙ্গ, যা ব্যবহার করে নতুন আলো ফেলতে পারছি আমরা অনেক সামাজিক বিদ্যার বিষয় বিশ্লেষণের জটিল ও দুরূহ ক্ষেত্রে, সুবিধা হচ্ছে চিন্তার পথ পরিক্রমা ও অগ্রযাত্রায়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে বৌদ্ধ সাধনতন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বকথা একটি সংকেতময় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে বটে কিন্তু সাথে সাথে সাড়ে ছেচল্লিশটি চর্যার নিবিড় পাঠ গ্রহণ করলে আমরা তাতে সাবলটার্ন একটি শ্রেণীরও সাক্ষাৎ পাই আর চূড়ান্ত বিচারে চর্যাপদকে[১২] তখন সাবলটার্ন শ্রেণীরই সাহিত্য বলে মনে হয় – যাতে বিম্বিত হয়েছে তৎকালীন নিম্নবর্গের সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ধর্মীয় তথা আত্মিক প্রতিবেদন।

বাংলা কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধ টেক্সট্‌কেও আজ সাবলটার্ন স্টাডিজ এর আলোয় আবিষ্কার করা হচ্ছে নতুনভাবে। সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিত মানস* Subaltern Studies -এর এক উর্বর রিপ্রেজেন্টেশান যাতে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি, উপন্যাসের মূল চরিত্র ঢোঁড়াই এর বিকাশ ও বিবর্তন ব্যাখ্যাত হয়েছে নিম্নবর্গীয় 'তাৎমাটুলী'র অখ্যাত প্রতিবেশে একেবারেই আড়ম্বরহীনভাবে। তথাপি ঢোঁড়াই যেন বহুযুগের নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্বকারী পুঞ্জিভূত এক নিরেট চরিত্র। 'তাৎমাটুলী'র উপেক্ষিত সমাজ, নিম্ন আয়ের অবহেলিত মানুষের পরিপ্রেক্ষিত আর অনুল্লেখনীয় কিন্তু নিম্নবর্গের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চরিত্র ঢোঁড়াই বাংলা কথাসাহিত্যে এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি* এবং সমরেশ বসুর *গঙ্গা* উপন্যাসে আমরা ধীবর শ্রেণীর নিম্নবর্গীয় সমাজপট আর তার বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনার সাক্ষাৎ পাই। হাসান আজিজুল হকের *চালচিত্রের খুঁটিনাটি* তে বিম্বিত হয় রাঢ় বঙ্গের নিম্নবর্গের অপূর্ব চিত্র যেখানে নিম্নবর্গই বিষয় হিসেবে বর্ণিত তবু তার অধীনতা, নিম্নস্থিতি, সামাজিক নিম্ন অবস্থান আর নিম্ন অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত কোনমতেই সে নিম্নবর্গকে নায়কের আসনে বসতে) দেয় না যেমন ঢোঁড়াই চরিত মানস এর ঢোঁড়াইকে সে উপন্যাসের নায়ক বললে মানায় না। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যিক উপন্যাস *খোয়াবনামাও* রচিত হয়েছে নিম্নবর্গের জীবন বয়ানের পটভূমিতেই। মুনসীর মিথ, বিল অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষের সামন্ত প্রভু পদানত জীবন আর সে-জীবনের নানান স্বপ্ন, সাধ, বিদ্রোহ সবই নিম্নবর্গের জীবন্ত আখ্যান।

মধ্য শ্রেণী

বিবিধ বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমাজের মধ্যশ্রেণী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞার্থ নিরূপণ সম্ভব হলেও মূলত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই মধ্যশ্রেণীকে নির্ণয় করা হয়। আর্থিক সক্ষমতার একটি বিশেষ গণ্ডির

Dhaka University Institutional Repository

ভেতর জীবনযাপনকারী জনগোষ্ঠীই সমাজে মধ্যশ্রেণী বা মধ্যবিত্তশ্রেণী নামে পরিচিত। সমাজ কাঠামোতে মধ্যশ্রেণী অবস্থান করে উচ্চবর্গের নীচে এবং নিম্নবর্গের ওপরে। মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থানের কারণে মধ্যশ্রেণীর এরূপ নামকরণ। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমালোচকের এই মন্তব্য –

'Middle class is a group of people between the upper class and the lower class in a society ..... sociologist use the term social stratification to describe the process of dividing societies into classes. The process is based on many factors, chiefly a person's occupation; other factors include income, power reputation and wealth. The majority of middle class people work for a living and do not inherit great wealth. Most of middle-class occupation do not involve manual labour. They include those of business owners and managers, clerks, lawyers, doctors and teachers'.[১৪]

১৭৫৭ সালের পূর্বে সহস্রাধিক বছর ব্যাপী ভারতীয় সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হাজার বছরের অচলায়তনিক সামন্ত সমাজে (Feudal society) দেখা দেয় পরিবর্তনের লক্ষণ। ইংরেজের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও স্বার্থের কারণে জন্ম নেয় নানান নতুন নতুন পেশাগোষ্ঠীর। পাদ্রীর জন্য প্রয়োজন হয় মুন্সীর, রাজস্ব আদায়ের জন্য নিয়োজিত হয় দেওয়ানের অধীন কর্মচারীর দল। ইংরেজি শিক্ষায় লালিত হয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে কেরানী-সমাজ এবং আরো অনেক ছোট-বড়ো পেশাগোষ্ঠী, নির্মিত হতে থাকে সামন্তও নয়, কৃষকও নয়, ধনী বা দরিদ্রও নয় অথচ সমাজে নিত্য কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালনকারী নতুন এক শ্রেণীর – এরাই মধ্যশ্রেণী। তবে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। যে সব অন্তর্নিহিত গুণ বাঙালি মধ্যশ্রেণীকে বিশিষ্টতা দান করেছে তার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, আধুনিক জীবনবোধ, নগরচেতনা, গ্রামীণ প্রেক্ষাপট, প্রখর রাজনৈতিক সচেতনতা, সংগ্রামী মনোবৃত্তি, সাংস্কৃতিক চৈতন্য, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, অধীনতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ তথা ভারতীয় সমাজের এই মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এতদঞ্চলের মধ্যশ্রেণীকে ব্যাখ্যা করার জন্য এর উদ্ভব ও বিকাশ জানা দরকার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে।

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপীয় মধ্যশ্রেণী

চৌদ্দ শতকের ইউরোপে বণিক সমাজের স্বতন্ত্র বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতকেই মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাবের প্রথম সোপান বলে চিহ্নিত করেছেন মনস্বী পণ্ডিত বি. বি. মিশ্র –

'In England in the fourteenth century the emergence of the trader as a separate social and functional category formed the first step in the rise of a middle class.' [১৫]

বণিক সমাজের এই উত্থান ছিল সামন্তপ্রভু বা Fudalism এর যুগে। অর্থাৎ তখনকার ইউরোপের নিম্নবর্গ এবং উচ্চবর্গ সামন্ত সমাজের মাঝে তৃতীয় একশ্রেণীর মানুষ সক্ষম হয়েছিল সমাজে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে বিকশিত হতে যারা ছিল মূলত বণিক, আর এরাই গোড়াপত্তন করেছিল সমাজে মধ্যশ্রেণীর। নিজেদের ব্যবসায়ের স্বার্থে এই বণিকশ্রেণী হয়েছিল সংঘবদ্ধ নানান সমিতি ও সংগঠনের মাধ্যমে। এরপর পনের ও ষোল শতকে ইংরেজ বণিকেরা দলে দলে পাড়ি জমালো অজানা সমুদ্রের বুকে ব্যাপকতর বাণিজ্যের সন্ধানে এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো বণিকের ধনভাণ্ডার জ্ঞান রাজ্যের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর নানান ভৌগোলিক তথ্যের অভিনব সব সমাহারে। বাণিজ্যের এই ব্যাপ্তির কারণে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে তৎকালীন ইউরোপে একচেটিয়াভাবে প্রচলিত চার্চের শিক্ষা পদ্ধতিও হলো প্রশ্নের সম্মুখীন। বিজ্ঞান, আইন, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ও প্রবেশ করতে লাগলো পাঠ্যতালিকায় এবং এরই ফলে বণিকশ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে একটি শিক্ষিত সমাজও গড়ে উঠতে লাগলো, যারা বণিকসমাজ রচিত মধ্যশ্রেণীরই অংশ বৈ নয়। অতঃপর ১৬০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর Royal Charter এর অধীনে সৃষ্ট English East India Company' র যৌথপুঁজির বাণিজ্যযাত্রা কতদূর অবধি এগিয়েছিল তা, লেখাই বাহুল্য। তবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে চৌদ্দ শতক থেকে ষোল শতক পর্যন্ত বণিকশ্রেণীর দ্বারাই সূচিত হয়েছে ইউরোপীয় মধ্যশ্রেণীর প্রেক্ষাপট, যার চূড়ান্ত বিকাশ ও পরিণতি লাভ ঘটেছে ফরাসি বিপ্লব, ইতালির রেনেসাঁ, আমেরিকার বিপ্লব এবং সর্বোপরি ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের বিশাল পটভূমিতে।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় মধ্যশ্রেণী

ইউরোপীয় মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের পশ্চাতে বণিকশ্রেণীর উত্থান, ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লব, রেনেসাঁ এবং শিল্প বিপ্লবের মতো বিচিত্র ও বেগবান প্রেক্ষাপট থাকলেও ভারতবর্ষে কিন্তু মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ভিন্নতর কারণ ও প্রেক্ষাপটে –

'In India, on the contrary, they emerged more in consequence of changes in the system of law and public administration than in economic development, and they mainly belonged to the learned professions. India's traditional emphasis on literary education combined with Britain's rule and her imperialist economy to make the intelligentsia the dominant strand in the composition of the Indian middle classes.' [১৬]

অর্থাৎ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মধ্যশ্রেণীর সূতিকাগার। উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে বি. বি. মিশ্র 'System of law and public administration' দ্বারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার কথাই বলেছেন। একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে ভারতবর্ষের মধ্যশ্রেণী বৃটিশ ঔপনিবেশিকতারই উপজাত। এবং এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে হাজারো উদাহরণ দাঁড় করানো যায় অনায়াসে। ইংরেজদের কেবল আইন কিংবা প্রশাসনিক ব্যবস্থাই নয়, টমাস ব্যাবিঙটন মেকলে'র সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রণীত শিক্ষানীতি ও ভারতবর্ষের মধ্যশ্রেণীর গড়ে উঠবার এবং তার চারিত্রিক গুণাবলী নির্ধারণের পথকেও সুগম করেছে। মেকলে বলেছিলেন –

"আমাদের এখন সর্বোতভাবে চেষ্টা করা উচিত যাতে আমাদের ও কোটি কোটি ভারতীয়দের মধ্যে এক দোভাষী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, এমন এক শ্রেণী, যার সদস্যরা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় হয়েও রুচি, মতামত, নীতি ও মননে হবে ইংরেজ।"[১৭]

মেকলে'র এই দোভাষী শ্রেণীই ভারতবর্ষে মধ্যশ্রেণীর জন্ম-উৎস। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা তার শাসনযন্ত্রকে সুদৃঢ়, নিষ্কন্টক আর কার্যকর করে তোলবার হাতিয়ার রূপে গড়ে তুলেছিল ইংরেজি শিক্ষিত তৎকালীন মধ্যশ্রেণীকে যে শ্রেণীর আদর্শ প্রতিনিধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাঙলার বিদ্বৎসমাজ' গ্রন্থে বলেন, 'বিদ্যাসাগরের মতো নির্ভীক সমাজ সংস্কারক ও মেকলে'র Filtration Policy-র অসহায় Victim হয়ে নিজের মধ্যবিত্তসুলভ মানসিক সীমাবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং জনশিক্ষা ও শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষার নীতি প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হননি।'[১৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি ঐতিহাসিক-পণ্ডিত বি. বি. মিশ্রের প্রাসঙ্গিক এ

Dhaka University Institutional Repository

উক্তিটি – 'The Indian middle class which the British aimed at creating was to be a class of imitators, not the originators of new values and methods.' [১৯]

জন্মের চারিত্র্যলক্ষণই ইউরোপীয় মধ্যশ্রেণীকে করে তুলেছিল স্বাধীন, বিদ্রোহী আর অভিযাত্রিকরূপে পক্ষান্তরে জন্মপ্রেক্ষাপটই ভারতবর্ষের মধ্যশ্রেণীকে পরাধীন, অনুগত, অস্বচ্ছল আর বৃত্তবদ্ধ করে গড়ে তুলেছে, যার পরিচয় ফুটে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত ব্যঙ্গাত্মক রচনাংশে –

"জগদীশ্বরকৃপায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙালি নামে এক অদ্ভুত জন্তু এই জগতে দেখা গিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্যলক্ষণাক্রান্ত; হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ আঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই; এবং অস্থি ও মস্তিস্ক 'বাইমেনা' জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ বলেন ইহারা অন্তঃসম্বন্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন ইহারা বাহিরে মনুষ্য এবং অন্তরে পশু। ..... আমরা কোন্ মতাবলম্বী? আমরাও বাঙালির পশুত্ববাদী। আমরা ইংরেজি সম্বাদপত্র হইতে এ পুশতত্ত্ব অভ্যাস করিয়াছি। কোন কোন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহপূর্বক এই অপূর্ব নব্য বাঙালিচরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুকুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষাণুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা এবং গর্দভ হইতে গর্জন – এই সকল একত্র করিয়া, দিঙমণ্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট ও মক্ষমূলরের আদরের স্থল নব্য-বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। যেমন সুন্দরমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থ মধ্যে রিচার্ডসন্স সিলেকশন্স, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের জামা, মদের মধ্যে পঞ্চ, খাদ্যের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি এই মহাত্মাদিগের মতে মনুষ্যের মধ্যে নব্য-বাঙ্গালি। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল – তেমনি পশুচরিত্রসাগর মন্থর করিয়া এই অনিন্দনীয় বাবু চাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছে। ...গোরুও যেমন উপকারী, নব্য-বাঙালিও সেইরূপ। ইহারা সম্বাদপত্ররূপ ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে, চাকরি-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া জীবনক্ষেত্র কর্ষণ-পূর্বক ইংরেজ চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে, বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কলেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া চিনির বলদের নাম রাখিতেছে, সমাজসংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই দিয়া রসের বাজারে চোলাই করিতেছে, এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থসর্ষপ পেষণ করিয়া যশের তেল বাহির করিতেছে।"[২০]

Dhaka University Institutional Repository

বণিকের ধন আহরণের আর পৃথিবীময় অভিযান পরিচালনার স্বপ্ন কোনটাই খুঁজে পাওয়া যায় না ভারতবর্ষের মধ্যশ্রেণীর চারিত্র্যলক্ষণে বরং বিপরীত সব লক্ষণই পরিলক্ষিত হয় এদেশের মধ্যশ্রেণীর সামাজিক, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক জীবন-প্রেক্ষাপটে। তবে ভারতীয় এই মধ্যশ্রেণীর অন্তরে সব সময় প্রজ্জ্বলিত থাকে একটি আত্মাভিমানী সাংস্কৃতিক বোধ। 'মধ্যবিত্ত'[২১] নামাঙ্কিত একটি আধুনিক কবিতায় এদেশের মধ্যশ্রেণীর স্বরূপ ফুটে উঠেছে প্রকৃতভাবে : 'পদতল মৃত্তিকাহীন/এক পায়ে কাকাবাবু হাত রাখে বাঁকা চাঁদে/লোনা ধরা দালানের ঘরে/বাস করে গণেশ ঠাকুর/মেড-ইন-জাপান দুঃখ ভর করে গৃহিণীর বুকে/মধ্যবিত্ত ধুঁকে মরে বৃত্তের ছিদ্রের ফাঁকে/তবুও সে বিত্তহীন, বৃত্তময়, চিত্তবাবু/মধ্যবিত্ত।

এই পায়ের তলা মাটিহীন তথাচ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে চাঁদে হাত রাখবার রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষয়িকভাবে মেড-ইন-জাপানের দিকে প্রলুব্ধ চেয়ে থাকা মধ্যশ্রেণী বাস্তবিকই ধুঁকে মরছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক 'বৃত্তের ছিদ্রের ফাঁকে'। কিন্তু এত বিপ্রতীপ প্রতিবেশে অবস্থান করেও বিত্তহীন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বৃত্তময় মধ্যবিত্ত মানুষটি আবার 'চিত্তবাবু'ও বটে। উদ্ধৃত কবিতাটিতে এদেশের মধ্যশ্রেণীর জীবন, সংস্কৃতি, সামর্থ্য, স্বপ্ন আর মধ্যশ্রেণীর সাংস্কৃতিক অগ্রনায়কোচিত গুরুত্ব স্ফটিকস্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়েছে।

বাঙালি মধ্যশ্রেণী

বাঙালি মধ্যশ্রেণীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বেশ কিছু শ্রেণীবদ্ধ পেশাজীবীর একত্রীভূত রূপই হলো বাঙালি মধ্যশ্রেণী। একদিকে কলকাতা এবং অপরদিকে রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলিই বিভিন্ন উপাদানে ঋদ্ধ বাঙালি মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ও স্বরূপ নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে, যাতে ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত স্বাধীনতা সংগ্রাম (যেমন - সাঁওতাল বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, ফকির বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ), ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতার বর্ণাঢ্য ঘটনাবলি ইত্যাদি পালন করেছে মুখ্য ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে মসলিনের সুখ্যাতিময়, কুটিরশিল্পের ছাদের নীচে সমৃদ্ধ কৃষিনির্ভর অর্থনীতিই ছিল ভারতবর্ষের আর্থ-অবকাঠামো। ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীনে এসে ক্রমশই শুকিয়ে যায় কৃষি ও কুটির শিল্পের সমৃদ্ধ স্রোতাস্বিনী। নীলকর ও ল্যাঙ্কাশায়ার এবং ম্যানচেস্টারের কাপড়ের কল যুগপৎ ধ্বংস করতে থাকে কৃষির ভূমি ও কুটিরশিল্পের কারখানা; এমনকি কুটিরশিল্পীও স্বয়ং যা থেকে রেহাই পায়নি। ইংরেজ প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে আর্থিক সঙ্কট মাঝে মাঝেই প্রবল হয়ে ওঠে যার উদাহরণ তখনকার দুর্ভিক্ষগুলো। এ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা মধ্যশ্রেণীই বিরাজিত ছিল সমাজবৃত্তের বিভিন্ন অংশে। সরল বিভাজনে পেশাজীবী মধ্যশ্রেণী, ভূমিনির্ভর মধ্যশ্রেণী, শিল্পাশ্রয়ী মধ্যশ্রেণী, বাণিজ্যিক মধ্যশ্রেণী ইত্যাদি বিভিন্ন মোটা দাগে মধ্যশ্রেণীকে বিভক্ত করা যায়। তন্মধ্যে পেশাজীবী ও শিল্পাশ্রয়ী মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা ছিল মুখ্য তৎকালীন সমাজ, সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেবার কাজে। তবে উদ্ধৃত সকল ধরনের মধ্যশ্রেণীরই আর্থিক প্রেক্ষাপট ছিল বেশ দুর্বল। ঔপনিবেশিক নগরায়ণের ফলে গ্রামীণ সমাজের গুরুত্ব তথা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। এককালের 'গোয়ালভরা গরু', 'পুকুরভরা মাছ' গ্রামের ইত্যাদি স্বচ্ছলতার গল্প কেবলই গল্প হয়ে ওঠে। শহুরে মধ্যশ্রেণীই হয়ে ওঠে মধ্যশ্রেণীর প্রকৃত প্রতিনিধি ও রূপকার। মানুষের শহরমুখী অভিগমন প্রবাহিত হতে শুরু করে অপ্রতিরোধ্য স্রোতের মতো, যেন শহরেই জীবনের প্রকৃত স্পন্দন খুঁজে পাওয়া যাবে। উপরি-উক্ত বাস্তব আর্থিক প্রেক্ষাপটই রূপায়িত করেছে বাঙালি মধ্যশ্রেণীর জীবনচিত্র যেখানে স্বপ্নের স্বাধীনতা অবারিত কিন্তু আর্থিক অসামর্থ্য প্রকট। সীমিত গণ্ডির এই আর্থিক প্রতিবেশেই লালিত হয় মধ্যশ্রেণী, রচনা করে তার স্বপ্নের সাধের সংসার, আপ্লুত হয় ছোট ছোট দিনানুদৈনিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায়।

অন্যদিকে দেখা যায় বাঙালি মধ্যশ্রেণী তাঁর সাংস্কৃতিক স্বরূপ নির্মাণে পরিপুষ্ট হয়েছে প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতি ও সভ্যতা, হিন্দু সম্রাট ও রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা (রাজা অশোক, রাজা লক্ষ্মণ সেন, রাজা বিক্রমাদিত্য), মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা (সম্রাট আকবর, সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, আরাকান রাজাগণ), ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক বাঙালি রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ অগ্রদূতের সংস্কৃতি চর্চা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণমূলক রচনা ও আন্দোলন দ্বারা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে মধ্যশ্রেণী

বাংলা সাহিত্যে মধ্যশ্রেণীর উপস্থিতি ও প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই মধ্যশ্রেণী অধ্যুষিত বললে অত্যুক্তি হয় না। 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে আবুল কাসেম ফজলুল হক এ কথাই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন – 'উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের যে মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির ধারাটি ... আমরা অনুসন্ধান করলাম, আধুনিক যুগের বাঙলা সাহিত্যে সেই শ্রেণীরই জীবন-ভাবনার জীবনোৎকণ্ঠার ও বিচার-বিবেচনার অভিব্যক্তি ঘটেছে। যে সাহিত্য আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে বলে অভিহিত হয়, বৈশিষ্ট্য বিচারে তা সমগ্র বাঙালির সাহিত্য নয়, এই মধ্যশ্রেণীরই সাহিত্য।'[২২]

ভারতবর্ষে মধ্যশ্রেণীর জন্ম আর বাংলা কথাসাহিত্য মধ্যশ্রেণীর সদর্প উপস্থিতি প্রায় সমসাময়িক। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পালামউ,* কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা* তারও আগে প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল,* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কৃষ্ণকান্তের উইল* বা *কপালকুণ্ডলা* এবং তারপর রবীন্দ্র কথা সাহিত্য, শরৎ সাহিত্য থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং পরবর্তীকালে সমরেশ বসু, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ শামসুল হক, জহির রায়হান, শহীদুল্লা কায়সার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং হালের বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কথাসাহিত্যে সমাজের মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ অনেকটা মূল সুরের মতো ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে। উল্লেখিত মনস্বী লেখকবর্গের সমৃদ্ধ কথাসাহিত্যে সমাজের মধ্যশ্রেণী ব্যাপকভাবে বর্ণিত, বিশ্লেষিত, উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে কখনো রাজনৈতিক, কখনো সামাজিক, কখনো অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে। সমাজের মধ্যশ্রেণীর মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও ঋদ্ধ হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্য।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই, বাংলা সাহিত্যে মধ্যশ্রেণী ও নিম্নবর্গের জীবন-রূপায়ণের প্রয়াস একেবারেই মূলগত, বা বলা যায় ঐতিহ্যগত যা চর্যাপদ থেকে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য পর্যন্ত বিস্তৃত। এর অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই এই যে বাংলা কথাসাহিত্য নির্মিত হয়েছে মূলত মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সাহিত্যিকবর্গ কর্তৃক। শামসুদ্দীন আবুল কালামও এই মধ্যশ্রেণীরই ফসল যিনি তাঁর সাহিত্য সাধনার বিষয় হিসেবে নিবিড়ভাবে চর্চা করেছেন সমাজের নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন ও তার পরিপ্রেক্ষিত । গভীর পর্যবেক্ষণ, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অবলোকন, বাস্তব-সংলগ্ন অভিজ্ঞতা ও তার নিরেট উপস্থাপন, শিল্পীর তন্ময়তা, সর্বোপরি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যকে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণে বিশিষ্টতা দান করেছে। মেধাবী কথাশিল্পী শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে আমরা সাক্ষাৎ পাই সমাজের নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর বলিষ্ঠ উপস্থিতির। তাঁর উপন্যাস আর ছোটগল্পে যত্নের সাথে গাঁথা হয়েছে নিম্নবর্গের সমাজচিত্র, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে নিম্নবর্গের ব্যক্তিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে সমাজের মধ্যশ্রেণীর পাশাপাশি। তুলে ধরা হয়েছে মধ্যশ্রেণী ও নিম্নবর্গের বাস্তব সামাজিক অবস্থান, সে অবস্থিতির প্রাত্যহিকতা ও বিবর্তন নিপুণ দক্ষতায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবর্গের সামাজিক, আর্থিক, ধর্মীয় তথা আত্মিক, রাজনৈতিক জীবনের ছবি শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর অসাধারণ সমাজবীক্ষণ, বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যা, বাস্তবঘনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানী পর্যবেক্ষণ আর বাক্য সংগঠনের অপূর্ব দক্ষতার গুণে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের নৈর্ব্যক্তিক লেখনী তাঁর কথাসাহিত্যে মধ্যশ্রেণী ও নিম্নবর্গের জীবন রূপায়ণে যে সাফল্য লাভ করেছে তার পশ্চাতে তাঁর নির্মোহ সাবলটার্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকাই যে মুখ্য, তা তাঁর কথাসাহিত্যের মনোযোগী অধ্যয়নে স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায়। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণের স্বরূপ ও শিল্পসফলতা নিরূপণের লক্ষ্যে আমরা তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে প্রয়াসী হবো – সাবলটার্ন ও মধ্যশ্রেণীর বিষয়গত অবস্থান, আর্থিক জীবন, ধর্মীয় জীবন, সামাজিক জীবন, আন্তঃমানবিক সম্পর্ক, বিদ্রোহের চেতনা, নারী, স্বপ্নের স্বরূপ, জীবনতৃষ্ণা, দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, সামাজিক গুরুত্ব ও মৌলিকতা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. The term 'subaltern' is used to denote the entire people that is subordinate in terms of class, caste, age, gender and office, or in any other way. 'Subaltern studies: Capital, Class and Community by ASOK SEN' *Subaltern studies* Vol-V, edited by Ranjit Guha. Delhi, Oxford, University Press, Page-203.

২. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *নিম্নবর্গের ইতিহাস* : কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ১৯৯৮ পৃ. ১১।

৩. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *নিম্নবর্গের ইতিহাস* : কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ১৯৯৮ পৃ. ২৩।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৫. Ranajit Guha (edited.) : Subaltern Studies I, Writings on South Asian History and Society, (Delhi, Oxford University Press, 1982)

৬. Longman Dictionary of Contemporary English, 1987 Edition

৭. Aristotle, *Ethics*

৮. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *নিম্নবর্গের ইতিহাস* : পূর্বোক্ত, ভূমিকা. পৃ. ৫

৯. Horem Q. & Smith, G.N., (1996), Antonio Gramsci: Selection from Prison Note Books, Orient Longman, India.

১০. The subaltern classes, by definition, are not unified and canot unite until they are able to become a "state": their history, therefore, is intertwined with that of civil society, and thereby with the history of states and groups of states. Hence it is necessary to study:

I. the objective formation of the subaltern social groups, by hte developments and transformations occuring in the sphere of economic production, their quantitative diffusion and their origins in

Dhaka University Institutional Repository

pre-existing social groups, whose mentality, ideology and aims they conserve for a time;

II. their active or passive affiliation to the dominat political formations, their attempts to influence the programmes of these formations in order to press claims of their own, and the consequences of these attempts in determining processes of decomposition, renovation or neo-formation;

III. the birth of new parties of the dominat groups, intended to conserve the assent of the subaltern groups and to maintain control over them;

IV. the formations which the subaltern groups themselves produce, in order to press claims of a limited and partial character.

V. those new formations which assert the autunomy of the subaltern groups, but within the old frame work;

VI. those formations which assert the integral autonomy, ...Quintin Hoare And Geoffry Nowell Smith. (Edited & Translated) : Antonio Gramsci: Selections from The Prison Note Books (Madras, India 1996, Orient Longman)

১১. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *নিম্নবর্গের ইতিহাস* : পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

১২. *Conglomerate*: A large business organization consisting of different companies the produce goods of very different kinds, a multinational conglomerate.

১৩. চর্যাপদে অঙ্কিত সমাজচিত্রে আমরা যে শ্রেণীর মানুষের সন্ধান পাই তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিম্নস্থ, অবহেলিত, বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠী। এই সাবলটার্ন শ্রেণীর বাসস্থান সমাজের অভিজাত মানুষ থেকে দূরে, গ্রামের প্রান্তে, পর্বত গাত্রে কিংবা টিলায়।

'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।

মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥ (২৮নং চর্যা)

Dhaka University Institutional Repository

–নগরের বাইরে সাবলটার্ন শ্রেণীর মানুষের বসবাস। ১০নং চর্যায় বলা হয়েছে নগরের বাইরে ডোম্বির কুড়ে ঘরের কথা,

'নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া।'

সবালটার্ন এই জনগোষ্ঠীর দুঃখ ও অশান্তির চিত্র এবং রিক্ততায় পরিপূর্ণ জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত চর্যায়,

'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥

বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।

দুহিল দুধু কি বেন্টে সামায় ॥ (৩৩নং চর্যা)

নিম্নবর্গীয় এই মানুষগুলোর সমাজে নীতি বা নৈতিকতার চিত্রটি ২নং চর্যায় উঠে এসেছে এভাবে –

'দিবসহি বহুড়ী কাউ হি ডর ভাই।

রাতি ভইলে কামরূ জাই ॥'

চর্যাপদে বর্ণিত জনগোষ্ঠীর পেশা ও তাদের নিম্ন অবস্থানও দুর্বল অর্থনীতির সাক্ষ্যবাহী –

'তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।' (২৬নং চর্যা)

কিংবা

'এক সো পদমা চউসট্ঠী পাখুড়ি।

তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি ॥' (১০নং চর্যা)

১৪. The World Book Encyclopedia. M-Vol. 13, London, World Book Inc., 1943, P-452.

১৫. B. B. Misra: *The Indian Middle Class*, Oxford University Press, London, 1978, First Published 1961, Page-4.

১৬. B. B. Misra: *The Indian Middle Class*, Oxford University Press, London, 1978, First Published 1961, Page – Preface-V.

Dhaka University Institutional Repository

১৭. টমাস ব্যবিঙটন মেকলে : 'মিনিটস্ অন এডুকেশন' কলকাতা, ১৮৩৫।

১৮. বিনয় ঘোষ : *বাঙলার বিদ্বৎসমাজ,* কলকাতা, ১৯৭৩ পৃ. ১৫-১৮।

১৯. B.B. Misra: *The Indian Middle Class*, Oxford University Press, London, 1978, First Published 1961, Page : 236-237.

২০. আবুল কাসেম ফজলুল হক : *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য,* আহমদ পাবলিসার্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৬৭-৬৮।

২১. সোহেল অমিতাভ : *শুধু তোমার জন্য,* গৌরব প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৫৮।

২২. আবুল কাসেম ফজলুল হক : উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য, গৌরব প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের জীবনকথা ও মানসগঠন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের জীবনকথা ও মানসগঠন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৭) পরবর্তী পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতি, পৃথিবীব্যাপী সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধের স্খলন, বিপন্ন অস্তিত্ব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সূচনালগ্ন - এমনি দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী অস্থির সময়সীমায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের জন্ম। কথাসাহিত্যিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর সৃষ্টিরাজিতে তাঁর মানসগঠনের স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন, যা দক্ষিণ-বাংলার নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর মানুষের মিছিলে প্রোথিত। জাতিক ও আন্ত র্জাতিক নানান অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এই বরেণ্য কথাসাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন। কিন্তু গল্প-উপন্যাস রচনার সময় তিনি বারংবার পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের গ্রাম-জনপদ ও সেখানকার নিম্নবর্গীয় ও মধ্যশ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের মানসগঠন ও জীবনকথা নিয়ে আলোচনা করবো।

পারিবারিক উত্তরাধিকার ও শৈশবজীবন

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ১৯২৬ সনের ১৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিল কাঞ্চন। বরিশালের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। বিশখালি সুগন্ধা নদীর পারে ভবানীপুর স্টেশন। ভবানীপুর থেকে এক মাইল পার হলে কামদেবপুর গ্রাম। এ গ্রামেই কাঞ্চনের জন্ম। এ গ্রামে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের পূর্ব-পুরুষরা প্রতাপশালী ছিলেন।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তারা কৃষকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। কৃষক পরিবারে প্রতাপশালী দুই ভাই জহির এবং জব্বর। এই জহিরের পুত্র জিকিরউল্যা আর জব্বরের পুত্র রাজাউল্যা। জিকিরউল্যার দুই ছেলে আকরাম এবং একরাম। রাজউল্যার পুত্র যথাক্রমে ফজলে আলী ও ইউসুফ আলী। জিকিরউল্যার পুত্র আকরাম আলীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে একমাত্র পুত্র সন্তান শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ওরফে কাঞ্চন।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের বংশলতিকা নিম্নরূপ –

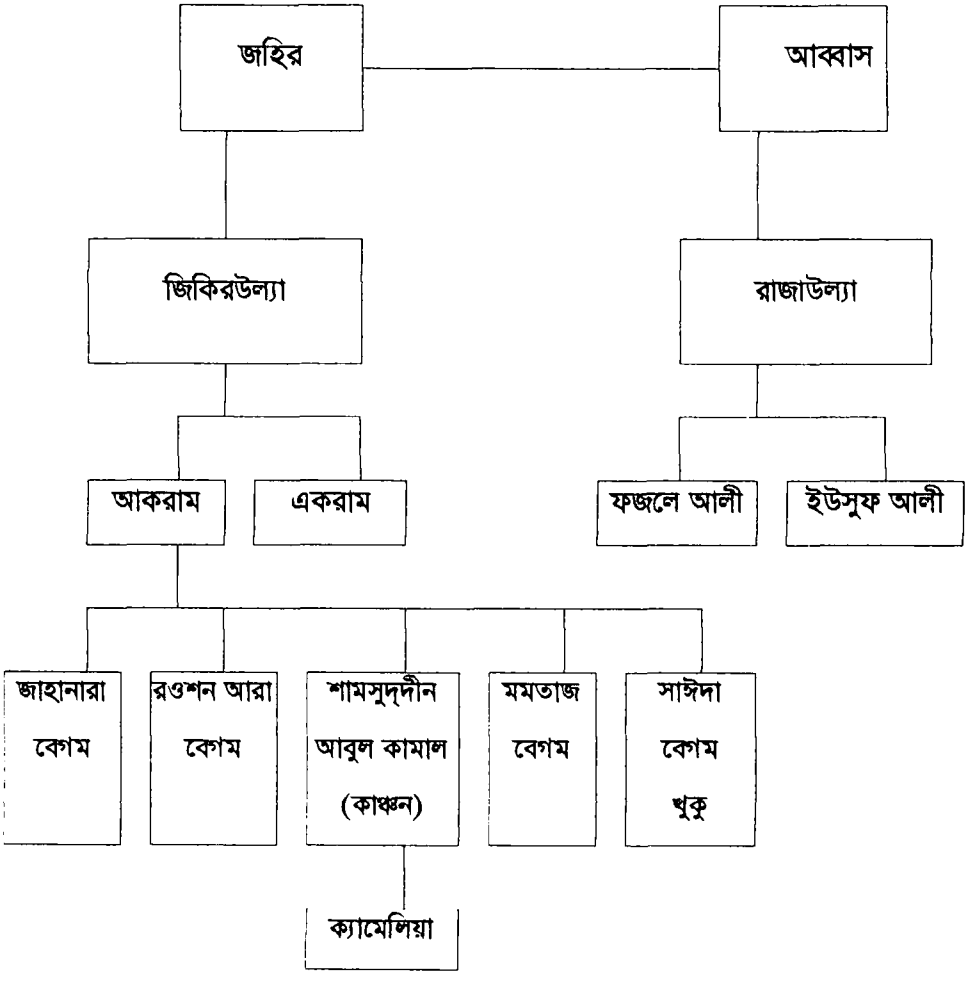

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের পিতার নাম মৌলভী আকরাম মুন্সী। তিনি সমাজসেবী ছিলেন। মাতার নাম গুলমেহের মেহেরুউন্নিসা খানম।

Dhaka University Institutional Repository

নাম বিভ্রাট ও পরিবর্তন

১৯৫৫ সালের পূর্বে তিনি আবুল কালাম শামসুদ্দিন নামে পরিচিত ছিলেন। এ বছরের পর থেকে তিনি শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম নামে পরিচিত হন। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কামাল শামসুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর নামের হুবহু মিল ছিল। এই বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম হন। এ সম্পর্কে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত আশিয়ানা গ্রন্থের 'নিবেদক' অংশে বলেছেন –

'আজাদ' সম্পাদকের নাম ও আমার নাম হুবহু এক হওয়াতে যে সব অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসানের জন্য এখন হইতে আমার নাম 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম' বলিয়া লিখিত হইবে। অনেকে নামের শেষে 'বরিশাল' লিখিতে বলিয়াছিলেন, তাহা শোভন মনে হইল না।'[১]

শিক্ষাজীবন

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিক্ষাজীবন দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময়। ১৯৪১ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্থানীয় ব্রজমোহন কলেজ হতে তিনি ১৯৪৩ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতা হতে তিনি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৬১ সালে ইতালির রোম বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন। এর আগে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে ইতালীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান 'সিনে সিত্তা'-য় (Cine Citta) ফটোগ্রাফি, সেট-ডিজাইনিং, পাশ্চাত্য সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্র সম্পাদনা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। ইতালীর রোমে এবং রোমের "এক্সপেরিমেন্টাল সেন্টার অব সিনেমেটোগ্রাফি" থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ শেষে একটি ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্ম ও সাহিত্যজীবন

১৯৪৮ সালে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসের ছাত্রকালীন পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে ঢাকায় এসে রেডিও পাকিস্তানে যোগদান করেন। প্রথমে স্টাফ আর্টিস্ট এবং পরে ইন্টারভিউ দিয়ে প্রোগ্রাম এসিসটেন্ট পদে নিযুক্তি পান। ১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তরে এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় তিনি ঢাকায় কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসে যোগ দেন। এ সূত্রে

Dhaka University Institutional Repository

'মাহে নও' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কবি আবদুল কাদিরের এই পদে যোগদানের কারণে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামকে ঐ দায়িত্ব ছাড়তে হয়েছিল।

১৯৫৬ সালে চলচ্চিত্র বিষয়ে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোর ফেলোশীপ লাভ করেন। ছয় মাসেরও অধিক কাল পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর করেন। এছাড়াও তিনি জাতিসঙ্গের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব খাদ্য কার্যক্রমের অধীনে গণসংযোগ বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবে দীর্ঘকাল কাজ করেন।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাহিত্যে হাতেখড়ি স্কুলজীবন থেকে শুরু। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র থাকাকালীন একদিন কলেজের ব্ল্যাকবোর্ডে তাঁর এক সতীর্থ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে একটি ছড়া লিখেছিল। ছড়াটি নিম্নরূপ :

আবুল কামাল শামসুদ্‌দীন
তার হাতে একমুঠো ভাত দিন।
দুর্ভিক্ষ-দুঃসময়ের উপরে
কতো গল্প লিখলেন,
আব্দুল-আমেনাকেও দুধুভাত
খাওয়ালেন।[২]

১৯৪৩ সালের মানুষ-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সেই দুর্ভিক্ষের কবিতা লিখেছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম আর সে কবিতাকে উদ্দেশ্য করেই শিশির গুপ্তের উপরি-উক্ত কবিতা রচনার পটভূমি। সেই ষোল সতের বছর বয়স থেকে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাহিত্য সৃষ্টি শুরু। দেশের বাড়ির লোকদের জীবনযাপন, কথাবার্তা, সমাজব্যবস্থা থেকে তিনি লেখার উপকরণ সংগ্রহ করতেন। ছেলেবেলায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর বাবার কাছ থেকে দেশ ও মানুষ সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেন তা-ই পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের বাবা মৌলভী আকরাম মুন্সীর উচ্চতর ডিগ্রী না থাকলেও স্বীয় শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা এবং সম্পূর্ণ নিজ যোগ্যতার বলে সবার কাছে সমাদৃত ছিলেন। সমাজ সচেতন এই ব্যক্তি তৎকালে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ একজন সংগঠক ছিলেন। জারি, ভাটিয়ালী গান গেয়ে তিনি সবাইকে

Dhaka University Institutional Repository

শোনাতেন। বাবার এ গুণটি শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি ভালো সরোদ বাজাতেন।

বাল্যকালের শিক্ষা, পরিবেশ এবং চারপাশের জগৎ শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর কথাসাহিত্যে যেসব মানুষের আনাগোনা, তারা সবাই প্রায় গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নিম্নবর্গ ও তার জগৎ এবং মধ্যশ্রেণীর মানুষই তাঁর কথাসাহিত্যে বহুল উচ্চারিত বিষয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের নদী ও সমুদ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত বিচিত্র চরিত্রের নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণী। তাই তিনি এদেশে জীবন বাস্তবতার কথাসাহিত্যিক রূপে পরিগণিত হয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে এ জগৎ এসেছে আরো অকৃত্রিমভাবে। বরিশালের নিম্নাঞ্চলের মানুষ তিনি। বন্যা, থৈ থৈ করা পানি, চাষী ও জেলের প্রায় অভিন্ন জীবন – এগুলো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সাহিত্যে অঙ্কন করেছেন। শহরের মানুষকে নিয়ে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম লিখেছেন, তবে তাঁর লেখায় গ্রামেরই প্রাধান্য, আর সে-গ্রাম অজো পাড়াগাঁ বিশেষত দক্ষিণ বঙ্গের নিম্নাঞ্চল। ব্যক্তি শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম যেখানেই থাকেন না কেন লেখক শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম সেখানেই ছিলেন।

লেখক হতে হলে অবিরাম পড়তে হয় – এ চেতনায় বিশ্বাসী শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের পঠন-পাঠনের জগৎ ছিল সর্ববিষয়ে বিস্তৃত। সঙ্গীত, চিত্রলকলাও বাদ পড়েনি তাঁর পড়াশুনার জগৎ থেকে। তাই তাঁর লেখার ভিত নির্মিত হয়েছিল শৈল্পিক শোভনতার আশ্রয়ে।

বি.এ. ক্লাসের ছাত্র হবার পূর্বেই শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর বিখ্যাত গল্প *শাহের বানু* রচনা করেন, যা তৎকালীন পটুয়াখালীর মুন্সেফ সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর গল্প *'কলম'* তখনকার ম্যাট্রিকের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

৩৮ বছরের দীর্ঘ প্রবাসজীবনে মাইকেলের মতোই শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম সর্বদাই দেশ, দেশের মানুষ, মাটির কথা ভেবেছেন। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর এক লেখায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথা তাঁর জবানীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'বিদেশে থাকি কিন্তু আমার মনের মধ্যে আমার দেশ একটি স্থায়ী আসন গড়েছে। বরিশালের মানুষ আমি, বরিশালের নদীর কথা, খাল-বিলের কথা এবং জঙ্গলের কথা আমার খুব মনে পড়ে। এগুলো আমার মনে আছে বলেই আমি বেঁচে আছি।'[৩] মাটি জড়িয়ে থাকা কৃষকদের ছবি যে কয়জন সাহিত্যিক বলার চেষ্টা করেছেন, শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

দেশবিভাগের পর 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের জন্ম। আর এই 'পাকিস্তান' যাদের জন্যে ফাঁকিস্তান হয়ে দেখা দিয়েছিল শামসুদ্দীন আবুল কালাম ছিলেন তাদেরই একজন। হৃদয়বান এই লেখক যৌবনে অনেক বেশি হেনস্তার শিকার হন; যে কারণে তিনি দেশ, মাটি, মানুষ ও ভালো চাকুরির তথা নিশ্চিন্ত জীবনের মায়া কাটিয়ে স্থায়ী প্রবাস জীবন বেছে নিতে বাধ্য হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – 'দেশজ সংস্কৃতি ও জীবনকে উপেক্ষা করতে না পেরে, দেশের প্রতি ভালোবাসা বশতঃই আয়ুবী আমলে দেশত্যাগে বাধ্য হই।'[৪] কিন্তু দেশের চরম দুর্দিনে তিনি চুপ করে থাকেননি। ১৯৭১ সালে প্রবাসি বাঙালিদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। মুজিবনগর সরকারের পক্ষে সরকারি সমর্থন লাভের জন্য এবং নির্যাতিত বাঙালিদের পক্ষে সহানুভূতিশীল মনোভাব গড়ে তুলতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি। সে উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইউরোপে বাংলাদেশ আন্দোলন ও মুজিবনগর থেকে প্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ ইতালীয় ও জার্মান ভাষায় লিখে তিনি নিয়মিতভাবে তা বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলোকে সরবরাহ করেন।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম সমাজসচেতন ও নিবেদিতপ্রাণ সাহিত্যিক, বিশেষত কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র, মধ্যবর্তী চরিত্র ও পরিপ্রেক্ষিতের চরিত্রগুলো প্রায় সকলেই নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর মানুষ। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসটিকে সমালোচকগণ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে রায় দিয়েছেন। ১৯৫৬ সালে *কাশবনের কন্যা* অনুবাদের জন্য UNESCO কর্তৃক ৫০০ ডলার বরাদ্দ,দেওয়া হয়েছিল।[৫]

শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর অনেক রচনাই প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। জীবিত অবস্থায় বিদেশে থাকার কারণে তাঁর প্রকাশক সংকট ছিল। মৃত্যুর পরে তাঁর লেখাগুলো সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় অনেক লেখাই হারিয়ে গেছে। তাই শামসুদ্দীন আবুল কালামের রচনার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় দুরূহ কাজ। তবে উপন্যাস ও ছোটগল্প দুই শাখাতেই তিনি সমানভাবে সৃষ্টিশীল ছিলেন। তাঁর ছোটগল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে : *শাহের বানু* (১৯৪৫), *দুই হৃদয়ের তীর* (১৯৫৫), *মজা গাঙের গান* (১৯৮৭), *পুঁই ডালিমের কাব্য* (১৯৮৭)।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের বিখ্যাত উপন্যাস *কাশবনের কন্যা* ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সালে বইটির রজত জয়ন্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে : *দুই মহল,* যা পরে নামকরণ করা হয় *আলমনগরের উপকথা* নামে (১৯৫৫), *আশিয়ানা* (১৯৫৫), *জীবনকাব্য*

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৫৬), *কাঞ্চনমালা* (১৯৬১), *জায়জঙ্গল* (১৯৭৩), *মনের মতো ঠাঁই* (১৯৮৫), *সমুদ্রবাসর* (১৯৮৬) *যার সাথে যার* (১৯৮৬), *নবান্ন* (১৯৮৭) এবং *কাঞ্চনগ্রাম* (১৯৮৭)।

কিশোর রহস্য উপন্যাস *রাতের অতিথি* ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও দু'টি কিশোর উপন্যাস *কাকলি মুখর* (১৯৪৫) এবং *সবাই যাকে করলো হেলা* (১৯৫৯) সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে আছে : *সোনারগাঁও, দুমড়ি, সময়, নাট্যমণ্ডপ, পালতোলা নাও, ঢেউভরা নদী, সাগর ঠিকানা, কূল-উপকূল, জীবনবহতা, ঈষদাভাস* (আত্মজীবনী প্রথম খণ্ড) এবং একমাত্র ইংরেজি উপন্যাস *The Garden of Cane Fruits;* এছাড়াও *জয় জীবন* নামে তাঁর একটি প্রবন্ধের সংকলন রয়েছে।

চল্লিশের দশকে কলকাতা থেকে একাধিক সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হত। এগুলোর মধ্যে *পরিচয়, পূর্বাশা* ও *সওগাত* ছিল অন্যতম। এ পত্রিকাগুলোতে দু'জন তরুণ লেখকের ছোটগল্প নিয়মিত ছাপা হতো। লেখকদ্বয় হচ্ছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও শামসুদ্দীন আবুল কালাম। শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে গ্রামের সাধারণ মানুষের সমস্যা প্রাধান্য পেত। তাঁর রচনায় রোমান্টিসিজমও লক্ষণীয়। নিরন্ন, দুঃখী-দরিদ্র মানুষের সুখ-দুখের কথা বলতে গিয়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই অতিমাত্রায় রোমান্টিক হয়ে পড়েছেন। 'গ্রামের মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুবই যথাযথ।'[৬]

বিশ শতকের চল্লিশ দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে মুসলমানদের অবস্থান জীবনের নানাক্ষেত্রে ছিল পশ্চাৎপদ। এর কারণ সন্ধান করলে আমরা লক্ষ করি রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে মুসলমানগণ তখন নানা সংকটের মুখোমুখি। এ অবস্থার জন্য বিদেশী শাসকদের ঔদাসিন্যের পাশাপাশি নিজেরাও কম দায়ী ছিল না। ইংরেজে শাসনাধীনে থেকেও শরীয়তী শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের ছিল উদাসীনতা। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি এই অনীহার জন্য অগ্রসরমান শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কোনটিই ছিল না। ফলে নতুন কালের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে তারা থাকে একেবারেই অজ্ঞ। সুতরাং হিন্দুদের তুলনায় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে নতুন জীবনবোধ, নতুন শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনা জগতে বেশ বিলম্ব হয়। মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের অবস্থা এই পরিবেশে সব দিক থেকেই ছিল অস্বস্তিকর। বৃটিশ ভারতে তাদের দীর্ঘদিন করুণার পাত্র হয়েই থাকতে হয়। এবং বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা তখন সাহিত্য ও জাতির সাংস্কৃতিক অন্বেষায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁরা যে সবাই প্রায় মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ত্রিশ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

চল্লিশের দশকে এঁদের দ্বারাই আধুনিক মুসলিম সাহিত্যের একটা রূপরেখা প্রণীত হয়। সেই শুভক্ষণে আমরা কিছু মুসলিম সাহিত্যিকের আবির্ভাব লক্ষ করি। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁদের অন্যতম। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাহিত্যচর্চার পথটি বন্ধুর ছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু সৃজনশীলতা দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করতে সমর্থ হন। এদেশের গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্তে লালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাত, লোভ-লালসা-ভন্ডামির চিত্র সহজ সরল প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ও বৃত্তিধারী জীবনের বিচিত্র বিকাশের মধ্যে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর সাহিত্যের যথার্থ রহস্যের সন্ধান পান। 'তাঁর মনন ও মানসিকতায় এই স্বদেশ-অন্বেষা তাঁর গল্প-উপন্যাসের চিত্রচরিত্রকে করেছে অসাধারণ উজ্জ্বল ও অকৃত্রিম।'[৭]

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ইতালির রাজধানী রোমে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুবাদে ইতালিয়ান ভাষা আয়ত্ত করেন। 'সিনে সিত্তা'য় (সিনেমা নগরী) শিক্ষানবিশী ছাড়াও তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। সে সময়ের বিখ্যাত সিনেমা পরিচালক 'ভিত্তোরিয়া ডিসিকা'র (Victtorio Desica) সহকারী হিসেবে একটি চলচ্চিত্র পরিচালনার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তিনি 'জাবা' চিত্রটির সিনোরিয়ো রচনা করেন। জাতি ও বর্ণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর কাঠামো রচনা করা হয়েছিল। তাছাড়া 'লাস্ট্রাড়া' (The Road) নামের বিখ্যাত চলচ্চিত্রের পরবর্তী ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করারও তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তার কিছুকাল আগে 'লাদলচিভিটা' (The Sweet Life) নামের একটি চলচ্চিত্র তৈরি করে তিনি ইতালির চিত্রজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ইতালির আর কোনও চলচ্চিত্র সম্পর্কে সম্ভবত এত বেশি আলোচনা ও সমালোচনা হয়নি। চলচ্চিত্রটিকে অনেকে আধুনিক চলচ্চিত্র শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলে মনে করেন। ইতালির আধুনিক সমাজ জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও নৈতিক অধঃপতনের উপর ভিত্তি করে এ সিনেমার কাহিনী গড়ে উঠেছে। 'The River' চলচ্চিত্রের পরিচালক 'ক্লদ রোনোয়া'র (Claude Renoir) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পের চিত্ররূপ দেয়া সম্পর্কেও তিনি প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা করেন।

প্রবাস জীবনে এত কিছুর সঙ্গে জড়িত হয়েও শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম নিজ দেশ, দেশের মানুষকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাননি। ১৯৭১ সালে সাধ্যমত তিনি মুজিবনগর সরকারের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন। দূরদর্শী এই লেখক পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি তাঁর রচনায়, বক্তব্যে একথা বার বার স্পষ্ট করেই বলেছেন যে এই বিভাজন (পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান) একদিন বিপর্যয় ডেকে আনবে। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে 'বাংলার বাণীসত্তা নেতৃত্ব' শীর্ষক এক নিবন্ধে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম বলেন যে দেশের

Dhaka University Institutional Repository

(তৎকালীন পাকিস্তান) পশ্চিম ও পূর্ব অংশের মধ্যে একদিন যে একটা গুরুতর সংঘর্ষ ঘটবেই এ সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই নিশ্চিত ছিলেন। তিনি আরো বলেন –

১৯৭৪ সালেই বরিশাল থেকে প্রকাশিত "নকীব" পত্রিকার সম্পাদক প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং সাহিত্যিক নূর আহমদের অনুরোধে পরপর দু'টি প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেই প্রবন্ধে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে ধনতান্ত্রিক বিবাদ বৈষম্য এবং স্বার্থের দিক ইঙ্গিত করেছিলাম। একদিন যে তারই পথ ধরে বাংলাদেশে বিপর্যয় দেখা দেবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। আমার তখনকার দেশ-চিন্তা সেই সময়কার সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর জন্য যে আদৌ বাচ্য হবেনা জেনেই সে প্রবন্ধের নাম ছিল "লেখা দিতে পারলুমনা", তার ফলাফল হয়েছিল উৎকট। সম্পাদক নূর আহমদ হয়েছিলেন লাঞ্ছিত আর আমি প্রহৃত।[৮]

১৯৭২ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর শামসুদ্দীন আবুল কালামের বিরাট উপন্যাস 'The Battle of Bangladesh' বইটি (চিত্রনাট্য) প্রকাশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার সংগ্রামকে তিনি 'The Battle of Bangladesh' বলে আখ্যা দেন। দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছুক প্রবাসী বাঙালি নায়ক ও আন্তর্জাতিকতায় আস্থাবান ইউরোপিয়ান নায়িকার সম্পর্ক বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে কিনা তাই ছিল এই বইয়ের মূল কাহিনী।[৯]

বইটি লেখার পর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় শামসুদ্দীন আবুল কালাম আর একটি ইংরেজি উপন্যাস লিখেন, নাম 'The Garden of Cane Fruits'। দারিদ্র পীড়িত গ্রামাঞ্চলের অনেকেই বেতফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করে। দারিদ্রের প্রতীক হিসেবে বইটির নামকরণ করা হয় 'The Garden of Cane Fruits.'

১৯৭২ সালের জুন-জুলাই মাসে ঢাকায় অবস্থান কালে এবং সেপ্টেম্বর মাসে রোমে ফিরে আসার পর ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে শামসুদ্দীন আবুল কালাম "কাঞ্চনগ্রাম" উপন্যাসের খসড়া পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। ১৯৮৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে রোম ও মিলান শহরের 'সান রাফায়েল' হাসপাতালে থাকাকালীন তিনি উপন্যাসটি পুনর্লিখনে মনোনিবেশ করেন এবং ১৯৮৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ঢাকায় অবস্থানকালে লেখার কাজ সমাপ্ত করেন। 'কাঞ্চনগ্রাম' ৫৮৩ পৃষ্ঠার বিশাল আকারের উপন্যাস। উপন্যাসটি নিয়ে শামসুদ্দীন আবুল কালাম খুব আশাবাদী ছিলেন যে উপন্যাসটি সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে। এই উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও চেতনা ব্যাখ্যা করে শামসুদ্দীন আবুল কালাম বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

'অনেকদিন ধরেই আমার জন্মভূমির মানুষের জীবন ও সংগ্রামের ছোট বড় কিছু কাহিনী বর্ণনার চেষ্টা করেছি। ক্রমে ক্রমে মনে একটা গভীর প্রেরণা অনুভব করেছিলাম যে, একটা ব্যাপক জীবনচেতনা ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তাকে উপস্থাপন হয়তো আরও সার্থক এবং কার্যকরী হবে। ইতিমধ্যে নিজস্ব জীবনচর্চার বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু কিছু চেষ্টাও করেছিলাম; কিন্তু তাতে মন ভরেনি; তাছাড়া গল্প-উপন্যাসের কথকতা উপযুক্ত ব্যাখ্যানুশীলন ছাড়া যেন কোনও প্রকার জীবনদৃষ্টিকেও স্পষ্ট করে তোলে না; যে মনোভাব অবলম্বন করে কাহিনীটি বর্ণিত হয় তা শুধু পাঠকদের নয়, সাহিত্যানুরাগী সমালোচকদেরও মনে অনুরণন সৃষ্টি করতে সক্ষম না হলে সমস্ত পরিশ্রমকেই অপব্যয় বলে মনে হয়।'[১০] সাহিত্যচর্চা করে সমকালীন সমাজে অনেকের মতো শামসুদ্দীন আবুল কালামও নন্দিত হয়েছেন। সাহিত্যে স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন শ্রদ্ধা, সম্মান ও পুরস্কার। ১৯৬৪ সালে শামসুদ্দীন আবুল কালাম সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। শামসুদ্দীন আবুল কালামের মানসগঠন ও জীবনকথা বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ করি তাঁর দৃষ্টি সব সময় নিবদ্ধ ছিল গ্রামীণ ও শহুরে নিম্নবর্গ এবং মধ্যশ্রেণীর প্রতি যারা সমাজে সব সময় নির্যাতিত ও নিপীড়িত ছিল। সেই সঙ্গে তাঁর সাহিত্যে যুক্ত হয়েছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা।

এই মহান লেখকের মৃত্যু সম্পর্কে একটা রহস্য রয়েই গেছে যা আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। স্বদেশ থেকে বহুদূরে পরবাসে নির্জনে মৃত্যুবরণ করেছেন এ কালজয়ী কথাসাহিত্যিক। ইতালিতে যেদিন তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, সেদিন ছিল ১০ জানুয়ারি, ১৯৯৭ । তবে মৃত্যু যে ওই তারিখের আগেই হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। কেননা তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষ বলেন, ১০ জানুয়ারি, ১৯৯৭ তারিখে স্নানাগারে পানির পাইপ মেরামতের জন্য একজন মিস্ত্রি তার এ্যাপার্টমেন্টে আসে। কোন সাড়া না পেয়ে মিস্ত্রি বাড়ির দ্বার রক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বহুকালের পুরনো এই দ্বার রক্ষক অ্যান্টোনিয়ো কয়েকদিন তাঁকে দেখেনি বলে জানায়। তাই তারা ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেয়। ফায়ার ব্রিগেড কর্মী পেছনের জানালা দিয়ে ঢুকে সোফা-বেডের উপর তাঁর মৃতদেহ, দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মৃত দেহের দায়িত্ব গ্রহণ করে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে 'সিমিটেরো কমিউনালে ডেল ভেরোনা' (Cimetero Comunale Del Verona) নামে পরিচিত রোমের প্রধান কবরস্থানে তাঁর মৃতদেহ দাফন করা হয়। 'পোস্টমর্টেম' রিপোর্টে উল্লেখিত তাঁর মৃত্যুর কারণ এবং সঠিক তারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ রাজি হয়নি। তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে, 'গত ৭ মার্চ, ১৯৯৭ ভোরবেলা চায়ের টেবিলে 'ভোরের কাগজ' আর 'জনকণ্ঠে' দেখলাম কালাম ভাইয়ের মৃত্যুর খবর। গত পাঁচ তারিখে রোমে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।[১১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের মৃত্যুর সংবাদ ঢাকায় এসেছে লেখক ও সাংবাদিক জনাব আবদুল মতিনের মাধ্যমে।[১২] শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুর খবর তাঁর কাছ থেকে জানতে পারে। '২৭ দিন আগে নাকি তার মৃত্যু হয়েছে আর আমরা জানলাম ২৭ দিন পর'।[১৩] 'প্রখ্যাত সাহিত্যিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম আর নেই। গত মঙ্গলবার ইতালির রাজধানী রোমে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর'।[১৪] শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের প্রকৃত মৃত্যুর তারিখ হয়তো আর কোনোদিনই জানা যাবে না, যেমন জানা যাবে না তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল কি না। দুটো বিষয়ই এখনও রহস্যাবৃত।

তথ্যনির্দেশ

১. শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, 'নিবেদন', *আশিয়ানা,* জাহাঙ্গীর নগর পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৫৫।

২. আব্দুল মতিন, *শামসুদ্‌দীন আবুল কামাল ও তাঁর পত্রাবলী,* র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৬২।* এ প্রসঙ্গটি নির্মল সেন -এর '*শামসুদ্‌দীনদা*' শিরোনামে স্মৃতিচারণমূলক লেখায় উঠে এসেছে এভাবে :

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ ভবনের সেকালের সাত নম্বর কক্ষের দেয়ালে একটি ব্যঙ্গ কবিতা সেঁটে দেয়া হয়েছে –

আবুল কালাম শামসুদ্‌দীন
তার মুখে দুটো ভাত দিন
কত যে লিখেছেন কবিতা
যেন ভাত খায়নি বহুত দিন।

*এ লেখা সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম* স্মারক গ্রন্থ, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। ১৯৪৩ সালের মানুষ-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষ মরেছে। আর সেই দুর্ভিক্ষের কবিতা লিখেছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। তাঁকে ব্যঙ্গ করে তাঁর সহপাঠী শিশির গুপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

(অর্থনীতির ছাত্র, পরবর্তীকালে নয়াদিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং হ্যানয়ে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত) উপর্যুক্ত ব্যঙ্গ কবিতাটি লিখেছেন।

৩. সেলিনা বাহার জামান কর্তৃক সম্পাদিত *শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৯।

৪. সেলিনা বাহার জামান কর্তৃক সম্পাদিত *শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, তদেব, পৃ. ১২৪।

৫. তদেব, পৃ. ১২৫।

৬. তদেব, পৃ. ৯৫।

৭. তদেব, পৃ. ১০৯।

৮. আব্দুল মতিন, *শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও তাঁর পত্রাবলী*, তদেব, পৃ. ১২।

৯. তদেব, পৃ. ২২।

১০. তদেব, পৃ. ২৩।

১১. সেলিনা বাহার জামান, "আমার স্মৃতিতে কালাম ভাই," *সংবাদ*, ২০ মার্চ, ১৯৯৭।

১২. সেলিনা বাহার জামান, "আমার স্মৃতিতে কালাম ভাই," *সংবাদ*, ২০ মার্চ, ১৯৯৭।

১৩. তদেব।

১৪. "প্রখ্যাত সাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালামের জীবনাবসান," *ভোরের কাগজ*, ৭ মার্চ, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: প্রথম পরিচ্ছেদ
শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাস: গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: প্রথম পরিচ্ছেদ
শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাস: গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ

১.

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের *আলমনগরের উপকথা* (১৯৫৪) উপন্যাসে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে গ্রামে প্রভাব বিস্তারকারী ধর্মাশ্রয়ী পীরের কাহিনী বর্ণনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ নিম্নবর্গের বাস্তব জীবনচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসটি লেখকের ইতিহাসজ্ঞান, সময় ও সমাজ-অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরবাহী। উপন্যাস-কাহিনীকে একই সঙ্গে 'উপকথা এবং ইতিহাস' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক। লোকজীবনে প্রচলিত কাহিনী, কিংবদন্তি ও ইতিহাসবোধের সমন্বয়ে পরিকল্পিত হয়েছে উপন্যাসের ঘটনাংশ। আলমনগর আসলে বাংলাদেশেরই প্রতিরূপ। ঐশ্বর্য, সম্পদ ও জনবল থাকা সত্ত্বেও কালপরম্পরায় শাসন, শোষণে, নিপীড়নে বিপন্ন নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের সূচনায় উপন্যাসের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এভাবে– স্মরণাতীত কাল হইতে এই দেশ 'ধনে-ধান্যে-পুষ্পে ভরা' বলিয়া কীর্তিত হইয়া আসিয়াছে; ইহার ক্ষীরের মত মাটি, তরঙ্গ-চঞ্চল নদী ও বিল, গাঁএর সীমানায় সীমানায় বহমান শান্ত খাল-নালা এবং আকাশের উদার নীলিমার পরিবেশ ইহার অধিবাসীদের জীবন যোগাইয়াছে। তাহারও সহিত অপরাজেয় সংগ্রাম করিয়া সারা দেশের আহার জোগাইয়াছে ; অন্ন-সন্ধানী দূরাগত অতিথিও আত্মীয়ের মর্যাদা লইয়া তাহাদের মাঝে বসতি করিয়াছে। কিন্তু নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার উপযোগী আহারের সংস্থান করিতে পারে নাই ; বাদ সাধিয়াছে বন্যা-অজন্মা ও মারী-মন্বন্তর ; আর যখন অতিথি ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া শাসন ও প্রতাপের গদা ঘুরাইয়া শোষকের ভূমিকা লইয়াছে। সে বলিয়াছে ঃ আমি মালিক হইয়া শাসন করিব, তোমরা শাসিত হইবে, ইহা বিধির বিধান। তাঁহার এবং আমার বশ্যতা স্বীকার করো আর লুণ্ঠিত ও অত্যাচারিত হইবে না।' - অধিবাসীরা কৃষিজীবী, স্বভাবতঃই খরা ও পানির জন্য সেই মহাশক্তিধর বিধির, – যাহার ইঙ্গিত মাত্র সৃষ্টি কায়েম হয়, ধ্বংস, বান-তুফান, মহামারী শান্ত হয়, অমোঘ নিয়মে মৌসুমের পুঞ্জ মেঘ ধাইয়া আসিয়া জমিনে জমিনে পশলার পর পশলা নবজীবনের প্রাণ-সঞ্জীবনী বহাইয়া যায়, - করুণা নির্ভর। তাহাদের সরল হৃদয় নির্বিরোধ জীবনকাঙ্ক্ষায় তাহা মানিয়া লয়; কিন্তু নিজেদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে আহৃত যে সম্পদের বুনিয়াদে সফল জীবন সাজাইবার স্বপ্ন দেখে, তাহার উপর কোনো অধিকারই অনুভব করে না; হয়তো একদিন দেখে মরিয়া যে জমিনে আশ্রয় লইবে সেখানেও তাহাদের অধিকার নাই।' (পৃ.২)

উপন্যাসে মূল কাহিনীর সঙ্গে একাধিক উপকাহিনী যুক্ত হয়েছে। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন- 'একটি শ্রুত কাহিনীর আংশিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে।' উপন্যাসের মূল কাহিনীতে আমরা লক্ষ করি 'মধ্যভারতের মোগল-দরবারের পীর হজরত

Dhaka University Institutional Repository

জামালুদ্দীনের' ধর্মপ্রচারের লক্ষ্যে ক্ষীরসায়রে আগমন। বহু লোকলস্কর ও ভৃত্য তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। সামন্তপ্রভু অরাতিদমন দেবের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জয়ী হয়ে এ অঞ্চলে ধর্মের কল্যাণময় আদর্শের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন পীর জামালুদ্দীন। কালক্রমে ধর্মের প্রভাবে ক্ষীরসায়রের নাম পরিবর্তিত হয়ে দাড়ায় আলমনগর। পীর জামালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র আলমউদ্দীন পিতার আদর্শচ্যুত হয়ে শাসক শোষকে রূপান্তরিত হয়। এবং বিলাসে ভোগে অত্যাচারে নিজ জীবন ও জনজীবনকে বিপর্যয়ের চরমাবস্থায় নিক্ষেপ করে। একমাত্র পুত্র আলমগীরকে তিনি বিলেতে পাঠিয়ে বাঈজী ও সঙ্গীতে আত্মমগ্ন জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হন। সামন্ত পরিবারের অবক্ষয়ের এ কালে দৃশ্যপটে স্বরূপে আবির্ভাব হয় মীর খাঁর মতো অসৎ মধ্যশ্রেণীর। কৌশলে ও ষড়যন্ত্রে মীর খাঁ নবাব পরিবারের সমস্ত সোনা-রূপা নিজ সিন্ধুকে বন্দী করে। নবাব বাড়ির অবস্থা হয় করুণ থেকে করুণতর। ইতোমধ্যে মানবতা, প্রেম ও সাম্যবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে আলমগীর। ধ্বংসোন্মুখ সামন্ততন্ত্র ও উচ্চবর্গ এবং মধ্যশ্রেণীর বিকাশলগ্নের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় আলমনগরের গণজাগরণে নবাবপুত্র আলমগীর অবতীর্ণ হয় মৌল ভূমিকায়। নবাবের মৃত্যুজনিত শূণ্যতার সুযোগে উঠতি মধ্যশ্রেণীর প্রধান মীর খাঁ এবার আলমগীরকে অধিকার করতে উশৃঙ্খল কন্যা শ্যালীকে তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে উৎসাহী হয়। কিন্তু রেনেসাঁর আলোকিত আলমগীর বাঈজী কন্যা রোশনবাইয়ের প্রেমাসক্ত। মীর খাঁ-র রুদ্ররোষ নিক্ষিপ্ত হয় রোশনবাই এর প্রতি। তার হিংসা ও রিরংসা চরম রূপ ধারণ করলে অভাবজনিত কারণে পাগলা ময়েজের অস্ত্রাঘাতে মীর খাঁ মারা যায়। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত শ্যালী নবাবপুরীতে অগ্নিসংযোগ করলে সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। উপন্যাস অন্তে আমরা দেখি ঐ ধ্বংসস্তুপের সামনে দাঁড়িয়ে আলমগীর রোশনবাইকে নতুন জীবনের কথা শোনায় ।

উপন্যাসের মূল কাহিনী উচ্চবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও উপ-কাহিনীর পুরোটা জুড়ে আছে গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও তাদের জীবনচিত্র। এদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের অন্যতম পেশা কৃষি। কিন্তু এ পেশায় কঠোর পরিশ্রম করেও তারা দু' বেলা দু' মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারে না। তার উপর আছে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। 'বন্যা, অজন্মা, মহামারী ও মন্বন্তরের কালো কালো ঢেউ আসিয়া জীবন-যাত্রা ক্রমান্বয়ে পর্যুদস্ত' করে দেয়। গ্রামীণ নিম্নবর্গের দরিদ্র গ্রামবাসীদের পর্যুদস্ত অবস্থার চিত্র এঁকেছেন ঔপন্যাসিক –

'আলমনগরের ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ জীবনযাত্রা। চাষী রৌদ্রে পুড়িয়া চাষ করিতেছে, অস্থি-কংকালসার গৃহস্থবধূ পুকুরের কলমি শাক তুলিতেছে, রুগ্ন শিশুগুলো মাছ ধরিতেছে ধুলা কাদা মাখিয়া, কলা গাছ চিরিয়া তাহার ''থোড়'' খাইতেছে ; বৃদ্ধেরা বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।'

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যার আধিক্য এবং জমির অনুর্বরতা ও দুর্ভিক্ষ গ্রামীণ নিম্নবর্গকে পেশা পরিবর্তনে বাধ্য করে। উপন্যাসে মীর-খাঁ চটকলের শ্রমিক হয় তারাই, যারা এককালে গ্রামে ছিল ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন, দিনমজুর। আজীবন কৃষিতে অভ্যস্ত মানুষেরা যোগ দেয় ভূমি-বিচ্ছিন্ন নতুন পেশায়। তাদের পরিচয় বদলে যায় কৃষিজীবী নিম্নবর্গ হয়ে যায় শ্রমজীবী নিম্নবর্গ।

গ্রামীণ নিম্নবর্গের এই শ্রমজীবী মানুষগুলো মুক্তি খোঁজে। তারা পরীসাহেবের বার্ষিক ওরসের সময়' দলে দলে মাজারে জমায়েত হয় জীবনের কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় –

'সযত্ন-সঞ্চিত সম্পদ তাহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দোয়া মাঙে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাঁদিয়া প্রাণের প্রার্থনা পৌছায় ; কিন্তু দুঃখ-নিশার অবসান হয় না।'

সম্পদের সুষম বণ্টনের অভাবের কারণেই তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি মেলে না। ইংরেজের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' গ্রামীণ নিম্নবর্গের কৃষিজীবীদের দুর্দশাকে চরমে উন্নীত করে। জমিদার-মহাজনের যৌথ নিয়ন্ত্রণে শাসিত গ্রামাঞ্চলে জমিদার-পুত্র আলমগীর যাদের শ্রীহীন জীবনের দুর্গতি-মোচন কামনা করে, তারা 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, জোঁকের কামড় খেয়ে, রোদে-বৃষ্টিতে পুড়ে..... বন্যার সাথে লড়াই করে, ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরে ভুগে' ফসল ফলায় এবং সেই ফসল 'নিজেরা উপবাসী থেকে' তুলে-দেয় জমিদার-মহাজনের ঘরে। সমাজ-ব্যবস্থার জ্বাজ্জল্যমান বৈষম্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্রের চোখে স্পষ্ট –

'উৎপাদন ও বণ্টনের অসম-ব্যবস্থা সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষের দুঃখ মোচনের পথে প্রধান অন্তরায়। আলমনগরে তাহার-ই পুনরাবৃত্তি।'

অভাবগ্রস্ত কৃষিজীবী নিম্নবর্গের শ্রেণী সংকট থেকে মুক্তি পেতে তাদের শেষ সম্বল স্বল্প জমি মহাজনের কাছে বন্ধক দেয় এবং পরবর্তীকালে ঋণ শোধ করতে না পারায় 'জমি বন্ধকের টাকা চক্রবৃদ্ধি' হারে বাড়ে। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের হাত থেকে ক্রমান্বয়ে হাতছাড়া হতে থাকে ভূমি। উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় চাষীর কণ্ঠে তার অভাবগ্রস্ত জীবনের কষ্টের বর্ণনা –

'..... উপবাস। তা তো লেগেই আছে। এমন অবস্থা কী একলার আমার হুজুর? এ দেশের জনে জনের। ... এখন তো দু' এক মাসের খোরাকি ঘরে আছে,... অভাব শুরু হবে বর্ষা আসার শুরুতে–তখন পেটে খিল লাগিয়ে কেবল ঘরে শুয়ে থাকা। কবিলাটা তো এমনি একদিনে বিনা ওষুধে মরে গেল। বেশি অসহ্য হলে ঘটি-বাটি, জমি-জমা বন্ধক রেখে টাকা আনো – '

আলমনগরের সর্বস্বান্ত কৃষক মফেজ নিম্নবর্গীয় দুর্গত কৃষক-সমাজের একজন। সর্বস্ব হারিয়ে সে উন্মাদগ্রস্ত। সকলের কাছে তার একটাই আর্জি- 'খেতে দিবি? দু'টো ভাত ? .... হাঁ ভাত। কতোকাল

Dhaka University Institutional Repository

খাইনি।' 'গেরস্ত বাড়ির আনাচে-কানাচে কুকুরের মতো ভাতের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়' এককালের কৃষক মফেজ। মফেজের অন্নহীনতা এদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের কৃষিজীবী শ্রেণীর বাস্তবচিত্রকে তুলে ধরেছে।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম এ উপন্যাসে সামাজিক কুসংস্কারের বৃত্তে গ্রামীণ নিম্নবর্গের মনোজগতের পরিচয়ও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। শুধু কুসংস্কার নয়, প্রবল ধর্মভাবাপন্নতায় আচ্ছন্ন তাদের সমগ্র চৈতন্য। ধর্ম-কুসংস্কারের বাইরে যুক্তিবোধের নিরিখে প্রাত্যহিকতার বিচার করতে তাঁরা অক্ষম। বহু যুগ ধরে প্রচলিত অভ্যাস-প্রথার আনুগত্যে তারা বাঁধা। উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গের চেতনার এ দিকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে –

'এ দেশে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের একান্ত অভাব। মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, আচার-বিচার প্রভৃতির বন্ধনে সকলেই অর্ধ-সভ্য জীবন যাপন করিতেছে।'

বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা শেষে পরিবর্তিত জীবনবোধ নিয়ে প্রত্যাবর্তন ঘটে আলমগীরের। গ্রামীণ নিম্নবর্গের মানুষের কল্যাণ-কামনা তার মানস-ভাবনার অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। সমাজের বৈষম্য ও নিম্নজীবী মানুষের দুর্গতি দূর করতে শিক্ষার ভূমিকার উপর জোর দেয় সে। নিম্নবর্গের মুক্তির জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই এ ভাবনা থেকে আলমগীর তাদের জন্য একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সে স্কুল হবে 'অন্য রকম স্কুল। সে স্কুল মানুষকে দুর্দশা থেকে বাঁচার নতুন পথের সন্ধান' দেবে। – গ্রামীণ নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে শিক্ষার অপরিহার্যতার গুরুত্ব এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

'আলমনগরের উপকথা' উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারীদের নির্যাতনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মহাজন মীর খাঁ যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্যে অপহরণ করে সাধারণ গ্রাম্য চাষী রতনের বোন কুলসুমকে। এ-দুষ্কৃতির দ্বারা একদিকে মীর খাঁ তার রিরংসাকে যেমন চরিতার্থ করতে চেয়েছে অন্যদিকে তেমনি সে শায়েস্তা করতে চেয়েছে তার অধীন চাষী রতনকে। নিম্নবর্গকে অধীন করার বহুবিধ প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের নারীরের কুক্ষিগত করার পদ্ধতি এ দেশে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। 'চাষীর ঘরে এই মেয়েটা এতো রূপ কোথা থেকে পায়' কুলসুমের সর্বনাশে উদ্যত মীর খাঁ'র এ মনোবৃত্তিও গ্রামীণ সমাজে অপ্রচলিত নয়। তাছাড়া সমস্ত জমি বন্ধক দিয়ে মীর খাঁ'র কাছে ঋণগ্রস্ত সর্বস্বান্ত রতন যে-দুর্বল অবস্থানের মুখোমুখি, তাতে তার এতটুকু ক্ষমতা নেই অন্যায়কে ঠেকানোর। এ দুর্বলতার সুযোগে কুলসুমকে অপহরণ করে মীর খাঁর বেতনভোগী লোক। বস্তুত নারী হওয়ার কারণেই কুলসুম সহজলভ্য হয়েছে উচ্চবর্গের জমিদার মহাজন মীর খাঁর কাছে। কুলসুমের পক্ষ থেকে সামান্যতম প্রতিরোধের মোকাবেলা করতে হয়নি জমিদার মীর খাঁকে।

Dhaka University Institutional Repository

এ উপন্যাসে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর যে জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে তার আগমন ঘটেছে বাইরে থেকে – মধ্যভারত থেকে। 'লালসালু'র মজিদ যেমন 'গারো পাহাড়' থেকে মহব্বতনগরে আগমনের কারণ হিসেবে 'নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা'র পরিবর্তে ধর্মের মোড়ক দেয়া গল্পের আশ্রয় নিয়েছিল–

'এধারের লোকদের মধ্যে খোদা তা'লার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই তাদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছি।'

ঠিক তেমনিভাবে *আলমনগরের উপকথায়* মধ্যভারত থেকে বাংলার গ্রামে আগমনকারী পীর হজরত জামালুদ্দীনও তেমনি ধর্মের নির্মোকে আবৃত করে তার উদ্দেশ্য প্রচার করে–

এত মনোহর এই দেশ ! ইহার অধিবাসীদের দেখ। কী জীবন ! ইহাদের মধ্যে আল্লার কালাম প্রচার করিয়া তাহাদের জীবনকে সুন্দর করিয়া তুলিতে সহায়তা করা আমার ফরজ।'

বিভিন্ন সময়ে ধর্মাশ্রয়ী পীরেরা অন্য অঞ্চল থেকে এসে গ্রামীণ নিম্নবর্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তারা সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যবহার করে ধর্মকে। বাংলা সাহিত্যে এ ধরেনর চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি 'মজিদ' যে কেরামতি দেখিয়ে একটি সাধারণ মাটির ঢিবিকে রাতারাতি মোদাচ্ছের পীরের মাজারে রূপান্তরিত করেছে। একইভাবে আলমনগরেও ধর্মাশ্রয়ী পীরের প্রভাবে ধর্মভীরু নিম্নবর্গের মানুষের কাছে জামালুদ্দীনের মাজারও পবিত্রতার প্রতীক। উভয় ক্ষেত্রেই এসব ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রধান লক্ষ্য থাকে প্রথমে সাধারণ মানুষের ভীতি-ভক্তি অর্জন, পর্যায়ক্রমে অর্থ আদায়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের নিরঙ্কুশ প্রভাব বিস্তার করা। জামালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র আলমউদ্দীন এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। নবাবীর চেয়ে গান-বাজনা ও বাঈজী নাচের প্রতি আলমউদ্দীনের আকর্ষণ ছিল বেশি। এই সুযোগে মীর খাঁ নব্য মধ্যশ্রেণীরূপে আবির্ভূত হয় দৃশ্যপটে। এই মীর খাঁর অত্যাচারে আলমনগরের গ্রামীণ নিম্নবর্গ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। গ্রাম্য চাষী রতন, তার বোন কুলসুম কিংবা গহরবাই সকলেই মীর খাঁর অত্যাচারের শিকার হয়। এদেশে মধ্যশ্রেণী কর্তৃক গ্রামীণ নিম্নবর্গের অত্যাচারের দীর্ঘদিনের পরিচিত ছবিই শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর *আলমনগরের উপকথা* উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন।

আলমউদ্দীনের পুত্র আলমগীর বিদেশ থেকে পড়াশুনা শেষে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। মধ্যশ্রেণীর হলেও পাশ্চাত্য প্রভাবের স্পর্শে আলমগীর নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ। আর তাই তার চরিত্রে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর সাধারণ বৈশিষ্টগুলো অনুপস্থিত। বরং কিভাবে গ্রামীণ নিম্নবর্গের মুক্তি হবে এ ভাবনায় সে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাকুল। কৃষিজীবী গ্রামীণ নিম্নবর্গের দুঃখ-কষ্ট আলমগীরের মনকে ব্যথিত করেছে, নতুন কোন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে এদের দুঃখ লাঘবের চিন্তা তার –

'এই দেশের লোক প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কৃষক-জীবনের সহিত ধর্মের স্বাভাবিক যোগকে কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। ..... এই আস্থা জীবনানুগ। ধর্ম সেই আস্থারই প্রমাণরূপ। ইহাকে ব্যাহত না করিয়াই জমির বিলিবন্টন ও উৎপাদনকে সমতার ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত করিতে বাধা কোথায় ? ..... আলমগীরের মনে হইতে লাগিল, এই দেশে এক.নোতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়িয়া আদর্শ স্থাপন করা যায়।' (পৃ. ৯১)

অতঃপর আলমগীর মুক্তির পথ সন্ধানে ব্রতী হয়েছে – 'নিজস্ব জীবনযাত্রা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়িয়া না তুলিতে পারিলে, যে-দারিদ্র্য ও দুর্দশা এই দেশবাসীকে জড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি নাই।'

'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' বলতে আলমগীর সংস্কারমুক্ত শিক্ষাকে বুঝিয়েছে যার জন্য সে স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছে। আলমগীর মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি হয়েও গ্রামীণ নিম্নবর্গকে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে এবং মীর খাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেতৃত্ব দান করেছে। সামন্ততন্ত্রকে হটিয়ে পুঁজি সে স্থান দখল করে শোষণ করার নতুন পথ তৈরি করেছে যা আলমগীরের মানস-ভাবনায় উঠে এসেছে এভাবে –

'সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কল বসিয়াছে, ধনতন্ত্র আজ নতুন পথে শোষণের ব্যবস্থা কায়েম করিতেছে',

আলমনগরের উপকথা উপন্যাসে সামন্ত নবাব-পরিবারের পতনকালে মীর-খাঁ সূত্রে পুঁজিবাদী বাজার-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। নবাব-বাড়িরই এক সময়ের খানসামা মীর খাঁ ভূসম্পত্তি ও কারখানার মালিক হয়ে নব্য মধ্যশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তার অত্যাচারের মাত্রা। আলমগীর মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি হলেও শেষ পর্যন্ত মানবতাবাদে বিশ্বাসী এই যুবক মিশে যায় গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় মানুষের সাথে। তাই আলমনগরে একচেটিয়া ক্ষমতার আসনে বসা মীর খাঁ-র পতন ঘটে কৃষক, শ্রমিক, সর্বহারার উত্থানের মুখে। সংঘবদ্ধ সাধারণ মানুষেরা অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে ষড়যন্ত্র করে দখল করা মীর খাঁর প্রাসাদ। আর এভাবেই আলমগীর সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আলমনগরের গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে নবযুগের সূচনা করে। উপন্যাসের শেষ পর্যয়ে রোশনবাইকে উদ্দেশ্য করে আলমগীরের উচ্চারণেও রয়েছে নতুন দিনের ইঙ্গিত।

: 'দুঃখ করো না রোশন, এবার নোতুন রকম জীবন শুরু। চলো, বলবো তার কথা।

: কোথায় ?

:আমাদের ঘরে ! নোতুন 'মহলে'-!' (পৃ-২৬১)

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্দীন আবুল কালামের গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবন-নির্ভর উপন্যাসগুলোর মধ্যে *কাশবনের কন্যা* অন্যতম। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবন এ উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। বরিশাল জেলা ও তৎসংলগ্ন বরগুনা, নলছিটি, ঝালকাঠি প্রভৃতি এলাকার উল্লেখে 'জনপদের বিস্তৃততর পরিচয় মেলে। গ্রামের নিকটেই বঙ্গোপসাগর; এছাড়া রয়েছে 'ভাটি অর্থাৎ দক্ষিণের চর অঞ্চল'। নদীবাহিত সমভূমির মানুষ কঠিন জীবন-সংগ্রামে নিত্য ব্যতিব্যস্ত –

'এই দেশে – এইখানে লড়াই করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে মানুষ। বিরূপ প্রকৃতি, বিরূপ নদী –লোভী মানুষ।'

কাশবনের কন্যা উপন্যাসের পটভূমি গড়ে উঠেছে দুই গ্রাম্য যুবক হোসেন ও শিকদারের জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করে। পিতৃমাতৃহীন হোসেন 'দুই মুঠ ভাত জোগানের চিন্তা'য় সদা ব্যস্ত। তার 'বাপ-মা-ভাই-বোন' ব্যধিগ্রস্ত হয়ে 'দুইরাত্রির মধ্যে' মারা যায়। অস্তিত্ব রক্ষার্থে হোসেন ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হয়েছিল এক সময়। গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় হোসেন কৃষিকাজে অভ্যস্ত হলেও জমির অভাবে বছরের অনেকটা সময়ই তাকে 'কেরায়া' বা নদীতে যাত্রী – পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। হোসেন একই গ্রামের সুন্দরী যুবতী সকিনাকে ভালবাসলেও নিজের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে তাকে বিয়ে করার সাহস নেই তার। 'পথ জানা নাই' গ্রন্থের *কন্যা* গল্পের হেম যেমন দরিদ্র মধুর ভালোবাসাকে উপেক্ষা করেছিল মনসুরের বিত্ত-বৈভবের কারণে তেমনি সকিনাও চালচুলোহীন এক যুবককে নিয়ে – ঘর বাঁধতে আগ্রহী হয় না। একই কারণে গ্রামের জমিদারের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সকিনার জন্য পাঠানো বিয়ের প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করে সকিনার পিতা। এভাবে হোসেনের প্রেমিকা অন্যের গৃহবধূ হয়ে যায়। নৌকা নিয়ে হোসেন গ্রাম থেকে যাত্রা করে বন্দরের দিকে। পথে আরেক মাঝি, ভারুকাঠি গ্রামের ছবদারের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। মুমূর্ষু ছবদারকে হোসেন নৌকায় করে পৌঁছে দেয় তার বাড়ি। সেখানে ছবদারের পরিবারের শোচনীয় অবস্থা দেখে হোসেন। বিয়ের প্রতিশ্রুত যৌতুক দিতে না পারায় ছবদারের মেয়ে মেহেরজাকে পরিত্যাগ করেছে। অত্যাচার - নির্যাতনের পর তার স্বামী তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে পিতৃগৃহে। শর্ত জুড়ে দিয়েছে, নগদ পঞ্চাশ টাকা দিলেই কেবল তাকে তুলে নেবে ঘরে। মানবিক কারণে মুমূর্ষু ছবদারের সেবায় আত্মনিয়োগ করে হোসেন। ছবদারের মৃত্যুর পর তার সৎকার থেকে শুরু করে শোকগ্রস্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়া সব-ই সে করে নির্বিবাদে। এমনকি স্বামী পরিত্যক্তা মেহেরজানের বিয়ের যৌতুক জোগাড় করে আনার প্রতিশ্রুতিও দেয় সে ছবদারের পরিবারকে। 'গাঙের ঘূর্ণির' মধ্যে সে বেরিয়ে-পড়ে নৌকা বিয়ে। ছবদারের বাড়িতে ক্ষণকালীন অবস্থানের সময়ে মেহেরজানের সঙ্গে তার হৃদয়-বিনিময় হলেও, হোসেন পিছুটান প্রত্যাখ্যান করে শেষ পর্যন্ত মেহেরজানকে তার স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে দেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিজ্ঞাকেই বেছে নেয়। অপরদিকে কৃষিজীবী শিকদারও জমির অভাবে পেশা বদল করে নৌকা নিয়ে বন্দরে-বন্দরে যাত্রী পারাপারের কাজ নেয়। হোসেনের মত সে-ও ভালবাসে এক গ্রাম্য যুবতী জোবেদাকে। কিন্তু দরিদ্র পিতার কষ্টকর জীবনের সাক্ষী জোবেদা তার জীবনে একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি মেনে নিতে নারাজ। সে বিয়ে করে সচ্ছল গ্রামবাসী আসগরকে। এ পর্বেও আমরা মধ্যশ্রেণীর আর্থিক সচ্ছলতার কাছে নিম্নবর্গের ভালোবাসার পরাজয় লক্ষ করি। কৃষক এবং মাঝি শিকদারের আরেক পরিচয়, সে গ্রাম্য কবিয়াল। গানে-গানে বয়ান করে মানুষের দুঃখের কাহিনী। জোবেদা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে কষ্ট এবং হতাশার মধ্যেও শিকদার বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে তার শিল্পীসত্তাকে। বন্দরে-বন্দরে ঘোরার এক পর্যায়ে তার সঙ্গে নলছিটি বন্দরের ঘাট-মাস্টারের পরিচয় ঘটে। ঘাট-মাস্টার শিকদারকে প্রেরণা দেয়, যাতে সে নতুন রকমের গান বেঁধে দেশের লক্ষ-লক্ষ হতদরিদ্র নিম্নবর্গীয় মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। এদিকে 'বেশ্যা লইয়া ঘর' করা স্বামীর নির্যাতনে জোবেদার জীবনে ঘটে চরম সর্বনাশ। আসগরের শারীরিক নিপীড়নে অতিষ্ঠ জোবেদা কষ্টে-অপমানে বেছে নেয় রাতের অন্ধকারে 'দড়িগাছা লইয়া' আত্মহত্যার পথ। তবে দ্বিতীয় চিন্তায় সে স্বামীর ঘর ছেড়ে আশ্রয় নেয় শিকদারের কাছে। গ্রাম্যজীবনের অভ্যস্ত তা ছেড়ে শিকদার ক্রমশ অগ্রসর হয় কঠিন বাস্তবতার দিকে। মাঝি ও কবিয়ালের পেশা দারিদ্র্য-বিমোচনে অপ্রতুল হওয়ায় সে বেছে নেয় এক কঠিন জীবন। সে যাত্রা করে ভাটির দেশে; যেখানে মানুষ প্রতি মুহূর্তে বিবাদ-বিসংবাদ, দ্বন্দ্ব- সংঘর্ষে লিপ্ত, যেখানে প্রচণ্ড কায়িক শ্রম ব্যতীত জীবিকা নির্বাহ করা অসম্ভব। দারিদ্র্যের গ্লানি থেকে বাঁচতে শিকাদার তার চির-পরিচিত গ্রামের ভূমি ছেড়ে চলে যায় ঝুঁকিপূর্ণ ভাঁটি অঞ্চলে।

কাশবনের কন্যা উপন্যাসের কাহিনীর দু'টি ধারা, যার একটি হোসেন ও অপরটি শিকদারকে কেন্দ্র করে এগোয়। দু'জনেই গ্রামীণ নিম্নবর্গের প্রান্তিক কৃষক এবং দু'জনের জীবনেই রয়েছে প্রেমে ব্যর্থতার ইতিহাস। ব্যর্থতার কারণ তাদের আর্থিক দুরবস্থা, যা সমাজ-সৃষ্টি। আর্থিক দুরবস্থা কী ভাবে গ্রামীণ নিম্নবর্গের মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে উপন্যাসে তা-ই চিত্রিত হয়েছে। ১৯৮৭-৫৭ কালপর্বে বাংলাদেশের 'অবিকশিত পুঁজিবাদ আশ্রিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী-চরিত্র রোমান্টিকতার 'হ্যাঁ-অর্থক' দিক অপেক্ষা 'না-অর্থক' দিকটিই ছিল অধিকতর সক্রিয়।' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রে এই 'না-অর্থক' দিকটিই সক্রিয় থেকেছে তাই স্বাভাবিক কারণেই। আবার রোমান্টিক জীবনশিল্পী শামসুদ্দীন আবুল কালামের গভীর আশাবাদের কারণে চরিত্রগুলি চূড়ান্ত হতাশায় ভোগে না। নলছিটি বন্দরের ঘাট-মাস্টার শিকদারকে তাই নতুন প্রেরণা যোগাতে পারে –

Dhaka University Institutional Repository

নতুন রকম গান গাইতে হবে তোমাকে শিকদার–দেশে দেশে – মাঠে, বাটে - ঘাটে ঘাটে – তোমার সেই গান গেয়ে দুঃখী মানুষদের জাগাবে, তাদের বল দেবে, ভরসা দেবে।

কৃষিজীবী শিকদার ও হোসেন সংসারের চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়ে 'কেরায়'র বিকল্প কাজ নেয়। কিন্তু তাতেও অভাব দূর হয় না তাদের। জীবন ক্রমশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। অভাবগ্রস্ত গ্রাম্যজীবন ছেড়ে শিকদার তার সংগ্রামময় গন্তব্য 'ভাঁটির দেশে' যেতে সংকল্পবদ্ধ হয়। এই ভাঁটির দেশের জীবন খুব ভয়ঙ্কর –

'প্রকৃতি সেইখানে আরো ঐশ্বর্যশালিনী সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বনাশাও। তুফানে কী কেবল গাঙের পানিতে, আসমানেও তাহার দৌরাত্ম্য গাছ-গাছালি, ঘর-বাড়ি কিছুই নাকি সে পরোয়া করে না চৈত্র-বৈশাখ মাসে। বর্ষায় আসে বন্যা–সব কূল ছাপাইয়া, সমস্ত ভূখণ্ডটাতেই যেন সমুদ্র উঠিয়া আসিয়া গ্রাস করিয়া লইতে চাহে। জানোয়ারের ভয় তো রহিয়াছেই –বাঘ কুমীর, কামট, অজগর, শঙ্খচূড় এই এতো বড় বড় জোঁক তো তখন প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। মানুষও যেন তাহাদের-ই মতো। দেশ - গাঁ ছাড়া হইয়া সেইমতো বন্য পরিবেশে তাহারও নাকি প্রায় অর্ধ-বন্য হইয়া উঠে। বিবাদ-বিসংবাদ, খুন-খারাপি স্বাভাবিক ঘটনা! ছয় মাসে কী বৎসরান্তে জল পুলিশের লঞ্চও আসিয়া ঘুরিয়া যায় সেই এলাকা – কিন্তু কে তাহার পরোয়া রাখে।'

এরকম দুর্গম স্থানে শিকদার যাত্রা করে নতুন প্রত্যয় নিয়ে - 'নতুন জীবন শুরু করমু'। প্রাণান্ত পরিশ্রম করেও গ্রামীণ নিম্নবর্গের মানুষেরা 'উদরান্নের সংস্থান' করতে না পেরেই 'ভাটির দেশে' তাদের যাত্রা। সে মিছিলে শিকদারও যোগ দিয়েছে; ফেরার প্রত্যাশা তার ভাবনায় অনুপস্থিত। গ্রাম ছেড়ে শিকদারের 'ভাঁটির দেশে' যাত্রা আমাদের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের হোসেন মিঞার 'ময়না দ্বীপে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম *কাশবনের কন্যায়* দক্ষিণ বাংলার 'সবুজ-শ্যামে-হরিতে' ভরা গ্রামের 'প্রকৃতির কোলে জন্মপ্রাপ্ত তাহার সন্তান'দের বাস্তব জীবকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গ্রামীণ নিম্নবর্গের মানুষগুলোর প্রকৃত পরিচয়, তারা কৃষিজীবী এবং তাদের 'চাল নাই, চুলা নাই'।'দুই মুঠ ভাত জোগানোর চিন্তা' তাদের সারাক্ষণ, স্বপ্ন, আশা এসব তাদের কাছে কল্পনাবিলাস যা একেবারেই মিথ্যা –

'দুই মুঠ ভাত জোড়ানের চিন্তায় যাগো দিন কাডে, হেগো ওসব হপ্পন দেইখ্যা লাভ নাই। অভাবের জ্বালা-ধরানইয়া দিনডাই আমাগোডা হাচা। আর বেবাকই মিথ্যা। একছের মিথ্যা।'

Dhaka University Institutional Repository

'ডালভাতে আর পান্তাভাতে লঙ্কা গুলিয়া খাওয়া' এসব মানুষগুলোর জীবনের চাহিদা খুবই সামান্য। অভাবের কারণে ভালোবাসার মানুষকে ঘরে আনতেও ভয় পায় এরা। কবিয়াল শিকদারকে জোবেদা উপহাসছলে নির্মম সত্য কথাটি শোনায় এভাবে –

'তুমি বিয়া করইয়া খাওয়াইবা কী আমারে-কেবল গান শুনইয়া তো আর প্যাট ভরবে না।'

গ্রামীণ নিম্নবর্গের অভাবগ্রস্ত মানুষের জীবনে ক্ষুধার জ্বালার কাছে এভাবেই ভালোবাসার বন্ধন পরাভব মানে।

কাশবনের কন্যা উপন্যাসে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবনচিত্র পুরুষচরিত্রের পাশাপাশি মেহেরজান, জোবেদা, সখিনা, জোবেদার শাশুড়ি প্রমুখ নারীচরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। নিম্নবর্গের নারীদের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-সাহস, হতাশা-বিপন্নতা উপর্যুক্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারীদের অসহায়ত্ব উপন্যাসে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি ও নিয়তির কাছে নিজেদের সমর্পণ করা ছাড়া এরা আর কিছুই করতে পারে না। যে-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে এইব নারীর জন্ম, সেখানে বসে জীবন ধারণ করাটাই কঠিন, স্বপ্ন দেখা বিলাসিতা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র কানু শিকদার শৈশবে দাদু করমালীর মুখে যে-কথা শুনেছে, তাতে উপন্যাসের গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় নারীদের চারিত্র্যলক্ষণ ফুটে উঠেছে –

'.. ঠিক ঠিক জিনিশ চিনতে হইলে সব রকম দৃষ্টি চাই, যে-জিনিশ চাই তার সম্বন্ধে একটা ধ্যান চাই। আসলে আমার মাঝে মধ্যে কী মনে কয় জানো ঐ কাশবনের আড়ালে, ঔ দূরে দূরে গাঙ্গ যেইখানে আঁকাইয়া-বাঁকাইয়া দূর দিক সীমানার মধ্যে মিলাইয়া গেছে, তার সব কিছুর মধ্যে দেখি একজন অসহায় কন্যার মুখ ক্যান জানি না, সেই মুখখানি যেন উপবাসে কাতর, নিজ-যৌবনের ঐশ্বর্য লইয়া তার বিড়ম্বনারও শেষ নাই।'

–করমালীর চোখ দিয়ে দেখা এই আসহায় নারীই *কাশবনের কন্যা* উন্যাসে অঙ্কিত নারীচরিত্রগুলোর অবয়ব নিয়ে উপস্থিত। করমালীর কল্পচোখে দেখা নারী এ উপন্যাসের বিভিন্ন প্রতিবেশে বিচিত্র রূপে উপস্থিত। আর এই সব নারীর প্রায় সকলেই 'অসহায় কন্যার মুখে'র প্রতিচ্ছবি–যে-মুখ উপবাসে কাতর ও গোলামীর জিঞ্জরে বাঁধা এদের জীবন।

গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় নারীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, আশ ও হতাশা সাহস-সংগ্রাম ও ব্যক্তিত্ব শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম জোবেদা-চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অসধারণ দক্ষতার আলোকে জীবন্ত করে তুলেছেন। পোড়-খাওয়া গ্রামীণ নারী জোবেদা–হাজার বছরের লঞ্ছনা বঞ্চনা আর নির্যাতিত বাঙালি নারীমূর্তিরই

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিচ্ছবি। আবার নারীত্বের অন্যান্য লক্ষণ যথা মায়া-মমতা ও ভালোবাসার আঁকুতিও এ চরিত্রে বিদ্যমান। ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক কবিয়াল কানু শিকদারকে ঘিরে জোবেদার দেখা স্বপ্ন বাস্তবতার আঘাতে চূর্ণ হয়েছে। বাস্তব জগৎ থেকে কিছুটা দূরে বাস করা কবিয়ালকে জোবেদা নানাভাবে বুঝিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া চাল-চুলোহীন কবিয়ালেরে কাছে কোন পিতাই স্বজ্ঞানে কন্যা দান করবেন না। জোবেদারও যথারীতি অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু জোবেদার আবেগী মন দুমড়ে মুচড়ে গেলেও মেনে নিতেই হয় তাকে এ সমাজ-বাস্তবতা।

জোবেদার মনের চাপা ক্ষোভ কানু শিকদারের উপস্থিতিতে বিস্ফোরিত হয়েছে এভাবে –

'কেবল গীত কথা দিয়া ভরণ - পোষণ হয় না। সকল বাপ-মা-ই চায় নিজ নিজ মাইয়া ভালো পাত্রে দিয়া অবস্থার উন্নতি। তোমার কথা কেউরই বিবেচনায় আসে নাই, আর আমি ও কিছু করতে পারি না। তুমি যাও, যাও, মিছামিছি আর অন্যের রোষের কারণ হইও না।' পৃ-৬৭

দাম্পত্যজীবন জোবেদার কাছে দোজখ বলে মনে হয়েছে। 'বেশ বয়সী ও ব্যবসায়ী' স্বামী আসগরউল্লাহ কাজ শেষে বাড়ি ফিরে স্থূল দেহসম্ভোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আসোহীন একপেশে এই দাম্পত্যজীবন জোবেদাকে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়। শৈশবের স্বপ্নলোকের স্মৃতি জোবেদার ভাবনায় উঠে আসে এভাবে –

'কোথায় গেল জোনাক-জ্বলা রাত্রি-নিশুতির উমের মধ্য হইতে শোনা ডাহুকের ডাক? সে যেন এখনও নিজেকে স্পষ্ট দেখিতে পায়, উঠানের একধারে চুলাসালের কাছে সে কখনও ধাঁধার মীমাংসায় অস্থির হইয়া আছে, কখনও-বা কোন সওদাগর অথবা কোন রাজপুত্রের কাহিনী শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরাট উঠানের মধ্যখানে ধান-মলা চলিতেছে সারা রাত্রিভর, একধারে পুঁথির আসর লইয়া সমস্ত শৈশবের সঙ্গী সেই শিকদার একটা দোতারা গলায় ঝুলাইয়া গীতের পর গীত গাহিয়া বর্ণনা করিতেছে জগৎ-সংসারের কথা, মাঝে মাঝে খুব বিরক্তি ধরিয়াছে শিকদারকে সেই রকম ভাব-বিহ্বল দেখিয়া, তাহার মুখে ভারী ভারী তত্ত্বকথা শুনিয়া। কতবার ইচ্ছা হইয়াছে তাহাকে জোর করিয়া সেইসব আসর হইতে উঠাইয়া লইয়া যায় ঘরের কাছে একটা পেঁপে গাছের তলায় তাহার মিছামিছা সংসার-খেলার আসরে, মিছামিছা রান্না খাওয়াইয়া সে কেবলই জানিতে চায়: পোলার বাপ, রান্না কেমন হইলো? ১১৫ পৃ.

কাশবনের কন্যা উপন্যাসে অঙ্কিত চরিত্রগুলোর মধ্যে আসগরউল্লা ও তার মা যথাক্রমে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর পুরুষ ও নারী চরিত্র হিসেবে শিল্পোত্তীর্ণ বলা যায়। গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ ধারণ করে চরিত্র দুটি উপন্যাসে বিকাশিত হয়েছে। 'বাহিরের জগতের বিভিন্নরকম দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া-জানিয়া' জোবেদা কিছু স্বাধীনতার প্রত্যাশা নিয়ে আসগরউল্লার ঘরে যায়। অথচ

Dhaka University Institutional Repository

আসগরউল্লা 'বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই জোবেদাকে বুঝাইয়া দিয়াছে কতকগুলি স্থূল কর্তব্য ছাড়া তাহার আর কোনও বিশেষ ভূমিকা নাই।' আসগরউল্লার কর্তব্য না থাকলেও জোবেদার কর্তব্য অবশ্য পালনীয়। শাশুড়ির সেবা-যত্ন প্রধান কর্তব্য, স্বামীর বাহিরে থাকা সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ অধিকারের বাইরে জোবেদার। আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সচ্ছল আসগরউল্লার মাতার কাজই হচ্ছে পুত্রবধূ জোবেদাকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখা ও নানাপ্রকারে নির্যাতন করা। শত চেষ্টা করেও জোবেদা তার মন যোগাতে ব্যর্থ-হয় এবং 'সর্বক্ষণ গজগজ করিবার মত একটা না একটা বিষয় সে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।' তার সাথে যুক্ত হয় সন্তানবতী না হওয়ার কারণে নানা রকম কটূক্তি-উপহাস। শাশুড়ি জোবেদাকে বুঝাইতে চাহিল–'আমি এই গৃহের কর্ত্রী। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আমার কর্তব্য আর শিক্ষার মধ্যে একটা সত্যই বড়। বৌকে ফলবতী হইতে হইবে, পুত্রবতী হইতে হইবে। গৃহস্থের মঙ্গল, গৃহস্থের সুখ, তাহার সমৃদ্ধি কেবল সেই একটি উপায়েই চতুর্দিকে মেলিয়া ধরন যায়।' জোবেদা চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, স্বামী সংসর্গ পাওয়ার সব চেষ্টাই সে করেছে, স্বামী আসগরউল্লাকে ঘন ঘন বাড়িতে আসিবার কলা-কৌশলও প্রয়োগ করেছে, কিন্তু জীবন বদলায় নি। দাম্পত্য জীবনে জোবেদা নির্যাতিত হয়েছে, বাস্তবতার আঘাতে তার স্বপ্ন নিদারুণভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক জোবেদার নির্যাতনের ছবি এঁকেছেন এভাবে –'আসগরউল্লা আর কোনও প্রশ্ন করিত না; সমস্ত অভিযোগ-আক্রোশের প্রতিশোধ স্পৃহা লইয়া সে জোবেদার দেহটাকে দলিত মথিত করিতে শুরু করিত; সে শ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত জোবেদা যেন নিঃশ্বাস লইবারও অবকাশ পাইত না; কেবল যখন টের পাইত শাশুড়ি নিদ্রাগ্রস্ত হইয়া থাকিত। বাহিরের অন্ধকার যেন কঠিন-কঠোর দেওয়ালের মত ঘিরিয়া ছিল সব দিকে, কোনও মুক্তির পথ দেখিতে পাইত না।'

আবেগহীন দাম্পত্যজীবনের এই কষ্ট জোবেদাকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ করে তুলে। এ জীবনকে তার কাছে দোজখ বলে মনে হয়।'এমন কোনও দোজখ বাস্তবিকই আছে যা কী না তার এই সংসার হইতেও কঠোর?' মীমাংসাহীন এ প্রশ্ন জোবেদাকে নিরাশ করে, ক্রমাগত নিঝুম নির্বাক হয়ে যায় সে । জীবনের উপর চরম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয় জোবেদার মনে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কপালকুণ্ডলার মনের প্রশ্নগুলো অনুরণিত হয় জোবেদার মনেও – 'কেন এই জীবন রাখা, কী ইহার অর্থ? কী জিনিস সুখ-শান্তি? কিসের মূল্য এই জীবন-যৌবনের যদি সমস্ত রকম কর্মকাণ্ডের প্রতি বাস্তবিক বোধোদয় না হইল?' ১৮০ পৃ.

এ রকম যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে গুমরিয়ে মরা জোবেদার চিওলোকে একটি মুখ উঁকি দিত, আর তা হচ্ছে কবিয়াল কানু শিকদারের মুখ। আসগরউল্লাহর সংসারে টিকতে না পেরে জোবেদা একক ও কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়। সমস্ত প্রতিকূলকতাকে পায়ে দলে শেষ আশ্রয় হিসেবে কানু শিকদারের ঘরে একদিন

Dhaka University Institutional Repository

চলে আসে জোবেদা। আত্মহত্যা করে সমস্ত পাট না চুকিয়ে কেন কানু শিকদারের ঘরে আসে জোবেদা তার বিবরণ জোবেদার জবানীতেই শোনা যেতে পারে:

'গলায় দড়ি দিতে গেছিলাম সব জ্বালা জুড়াইতে। দড়ি লইয়া গাছের ডালে বাঁধিতে গিয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তোমার কথা, সেই ছোটকালে তুমি কোথায় হইতে এই দড়ি, এই তক্তা যোগার করিয়া দোলনা বাঁধিয়া দিতা। আমার কিছুতেই তৃপ্তি হইতো না, হাওয়ায় উড়িয়া যাইতো গায়ের বসন, গুরুজনের শাসনও যেন কেউরই কানে আসিয়া পৌছিত না। তারই কাছে আছিলো একটা হিজল ফুলের গাছ। তার লাল লাল ফুলগুলাণ পুকুরের পানির উপর হাওয়ার গতির সঙ্গে ঘুরিয়া ভাসিয়া বেড়াইতো। তুমি কখনও কখনও কোঁচড় ভরিয়া একগাছা সেই ফুল আমার সামনে উজার করিয়া দিতা। আমিও সেই ফুলের লাহান উড়িয়া ভাসিয়া ছড়াইয়া পড়তে চাইতাম। তোমার সেই জোবেদা, আমি যেন লোহার শিকলেই এই এতোগুলান বছর বাঁধা পড়িয়া আছিলাম। মুক্তি খুঁজিয়া আমি তোমার কাছেই আইলাম।' পৃ.১৯৪

কিন্তু শিকদারের নিস্পৃহতায় জোবেদার মুক্তি অন্বেষণে ভাটা পড়ে। জোবেদা তবুও আশা ছাড়ে না। স্পষ্ট উচ্চারণে শিকদারকে বুঝিয়ে দেয় তার আকাঙ্ক্ষার কথা –

'তোমারেই এই নিদানকালের পুরুষ বলিয়া গণ্য করিয়া তোমার কাছে আইলাম। মনে তো কয় একদিন তুমি আমারে চাইছিলা। এই লও এখন আমি তোমার। দেশের মানুষ, তামাম দুনিয়ার মানুষ কয় আমার অভাবে, আমার জন্যই তোমার জীবন এমন শূন্য, এমন বিরান হইয়া গেছে। আইজ আমিই আসছি ! আমারে আর পায়ে ঠেলিয়া দিওনা। তুমি আবার আমারে সব নোতুন করিয়া সাজাইতে দেও। তুমি সেই কোন ছোটকাল হইতে আমারে কতো কন্যার কাহিনী শুনাইছো, আর আমিও স্বপ্ন দেখছি এমন পুরুষের, যদি কোথাও কেউ না-ই থাকে তবে সেই পুরুষ তুমি হও। আমারে উদ্ধার করো।' পৃ. ১৯৪-৯৫

এরকমভাবে জোবেদা তার আবেগের বহি:প্রকাশ ঘটালেও নিম্নবর্গীয় পুরুষ কানু শিকদারের মধ্যে কোনো ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয় না। শিকদার বরং লোকলজ্জা, সমাজ, নিজের অক্ষমতার দোহাই দিয়ে দায়িত্ব এরিয়ে যেতে চাইলে জোবেদা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'কপিলা'র মতোই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বলে উঠে-'হায়রে পুরুষ!'

কবিয়ালের নীতিবাক্যে ক্ষোভে ও অভিমানে জোবেদা শোনায় জীবনমুখী এই কথা –'আমি যা ভালো মনে করেছি, তা-ই করছি। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যে-পথে আমারে চালাইয়া নিছে সেই পথে আসছি। দোহাই তোমার, তুমিও আমারে আবার গুরুবাক্য শোনাইও না।' দূর্বল পুরুষ কানু শিকদারের সিদ্ধান্তহীনতা জোবেদাকে ব্যথিত করে। এ সময় আকস্মিকভাবে জোবেদার মানসঘটে ভেসে ওঠে ভিন্ন ছবি যা তার কর্তব্য স্থির করে দেয়। 'জোবেদা কোনও মন্তব্য করিল না। ঘাটালের

Dhaka University Institutional Repository

উপরে এক হাতে ভর দিয়া সে কাত হইয়া বসিয়াছে, নতমুখ কী ভাবনায় আচ্ছন্ন, দৃষ্টিতেও আর কোনও ঔজ্জ্বল্য নাই। শিকদারের পক্ষে কোনও ক্রমেই বুঝিবার সাধ্য ছিল না যে সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ অমন সেই স্বামী আসগরউল্লার আহার-তৃপ্ত মুখ যেন ধক করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল বুকের মধ্যে। যতই সে অত্যাচারী হউক, এই অতি সামান্য মাছের আহার তাহার মুখ কোনও শিশুর খুশিতে ভরিয়া তুলিত।'

কানু শিকদার তথা বাল্যকালের প্রেমিক পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে জোবেদা মুক্তি-অন্বেষণ করলেও অত্যাচারী স্বামী আসগরউল্লার জন্য এই আবেগই তাকে অসামান্য নারীতে পরিণত করেছে। যার কারণে জোবেদাকে আমাদের কাছে ভিন্ন গ্রহের বা অপরিচিত মানবী বলে মনে হয় নি, মনে হয়েছে আমাদেরই গ্রামীণ সমাজের পরিচিত রক্ত-মাংসের গড়া কোন চিরায়ত নারী। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও জোবেদা নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মহিমায় উজ্জ্বল। সে সনাতন বাঙালি নারীর ভাবমূর্তি নয়। স্বামী কিংবা শাশুড়ির কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসকে জোবেদা কখনোই সমর্থন করতে পারে নি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সেই কুসংস্কারগুলোকেই তাকে জোর করে মানতে বাধ্য করা হয়েছে। জোবেদার এই পুতুল জীবনের কথা তার জবানীতেই শোনা যাক -'শাশুড়ি-স্বামীর ইচ্ছা মত ফকির-দরবেশ-ওঝাদের ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া অজস্র রকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অপমান সহ্য করিয়া সে কেবলই একটা চরম মীমাংসার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিশেষ করিয়া যখন খেয়াল করিল যাহাদের নানা রকম তুকতাকের উপর শাশুড়ি ও স্বামীর আগাধ বিশ্বাস, তাহাদের কাছেও সে যেন একটা মজার পুতুলে পরিণত হইয়াছে।'

নারীদের অকর্মণ্য পুতুল জীবনই এ সমাজ সমর্থন করে, এখানে নারীদের মহিমা বা নারীদের আলাদা সত্তার কোনো স্বীকৃতি নেই, জোবেদা তা ক্রমেই বুঝতে পারে। আর তাই অত্যাচারী স্বামীর ঘর ছেড়ে আসলে জোবেদা লক্ষ করে তার জন্য কোথাও কোনো সহানুভূতি নেই, আছে কেবলই নিরাশার বাণী-'পিতৃকুলের মধ্যেও তখন আর এমন কেউ ছিল না, যাহার কাছে আশ্রয় লইতে পারে। যাহারা ছিল, তাহাদের কাছে কিছু বলিলেও কেবলই শুনিতে হইয়াছে, পরের বাড়িতে মেয়েদের অমন একটু-আধটু অসুবিধা হয়ই। আরও বলে 'পর'-এর বাড়িকে আপন করিয়া লওয়ার মধ্যেই ত কৃতিত্ব, নারীজন্মের সাফল্য। বেশি খামখেয়ালী কি তেজ দেখাইয়া কোনও কন্যাই কখনও কোনও সংসার সুখের করিতে পারে নাই।' আর তাই কবিয়ালের কাছে আশ্রয় না পেয়ে সে পুনরায় স্বামী আসগরউল্লার ঘরেই প্রত্যাবর্তন করেছে। 'কিন্তু তার এই প্রত্যাবর্তনে অমর্যাদা বা অসম্মান নেই; বরং কবিয়ালের কাছে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসা থেকে স্বামীর ঘরে প্রত্যাবর্তন – এই পথ-পরিক্রমায় সে নিবিড়ভাবে চিনে নিতে পেরেছে এই সমাজের ক্ষত আর গলদ আর পুরুষতান্ত্রিকতার স্বরূপ।'

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নবর্গীয় নারীর বহুবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসে মেহেরজান চরিত্রটি উপস্থিত হয়েছে। দরিদ্র ছবদার মাঝির কন্যা মেহেরজান পোড় খাওয়া নিম্নবর্গের নারী, অনেকটা জোবেদার মতোই অকালে যার উপর বার্ধক্য ভর করেছে। হাজার বছরের বাঙালি নারীর চিরায়ত ভাবমূর্তির প্রতীক মেহেরজানের জীবন থেকে ভরা যৌবনেই মুছে সমাজ গেছে স্বপ্ন, আশা. আবেগ ও ভালোবাসার সবটুকু রং। জোবেদা সমাজ-সৃষ্ট বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে যেতে চেয়েছে কিন্তু মেহেরজান একান্তই সনাতন বাঙালি নারী – যার সমস্ত ব্যথা, কথা বুকের ভেতর গুমরে কেঁদে মরেছে। নিম্নবর্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি। মেহেরজানের ক্ষেত্রেও এ সমস্যাই তাকে স্বভাবিক ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। মেহেরজান মনের কথাকে মুখে আনতে পেরেছে খুব কম সময়ই। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি আমাদেরকে মেহেরজানের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ধারণা দিতে পারবে –

'[ছবদার মাঝি] মেয়ে মেহেরজানকে বিবাহ দিয়াছিল অনেক আশা করিয়া, কিন্তু পণের কড়ি জোগাইতে পারে নাই বলিয়া সেই মেয়ের সংসারও সুখের হয় নাই।'

কাশবনের কন্যা উপন্যাসের মধ্যশ্রেণীকে ঔপন্যাসিক 'লোভী মানুষ' আখ্যায় উপস্থাপণ করেছেন। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমভূমি ও নদীবাহিত গ্রাম-জীবন এ উপন্যাসে চিত্রিত। নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের কঠিন জীবন-সংগ্রামও তাদের দু'মুঠো অন্ন-বস্ত্রের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। আবার একদল সুবিধাবাদী ও সুবিধাভোগী মধ্যশ্রেণীর মানুষ নিম্নবর্গের সাদাসিদে মানুষগুলোকে বোকা বানিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। এদের কারণেই নিম্নবর্গের মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাড়ে শতগুণ। 'লক্ষ লক্ষ সহজ-সরল সাদাসিদে মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে লুটে পুটে খাচ্ছে ঐ চালাক মানুষেরা, আর ঐ পীর-সাহেবের দল।'এই পীর-সাহেবের দল ও চালাক মানুষগুলোই সমাজে শোষকশ্রেণী এবং এরা নিম্নবর্গের মানুষের জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলে। আর ধর্মভীরু, অশিক্ষিত নিম্নবর্গের সহজ সরল মানুগুলো এদের চালাকি বুঝতে না পেরে মুখ বুঁজে সব অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন নীরবে সহ্য করে। আলোচ্য উপন্যাসে কৃষিজীবী নিম্নবর্গ হোসেন এবং শিকদার। তাদের জীবনের একমাত্র ভাবনা 'দুই মুঠ ভাত জোগানের চিন্তা।' কৃষিকাজে অভ্যস্ত হোসেন ও শিকদার চাষযোগ্য ভূমির অভাবে বিকল্প পেশায় নিয়োজিত। তারা নৌকায় করে 'কেরায়া' বা যত্রৈী পারাপারের কাজে করে। তবু তাদের উপার্জন প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। জীবন যুদ্ধে নিয়োজিত হোসেন-শিকদার স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের আশা বিসর্জন দিয়েছে। এমনকি রমণীর ভালোবাসা পেয়েও হারিয়েছে তারা। যাদের 'চাল নাই, চুলা নাই .... হেগো কেউ মাইয়া দেয় না', 'অভাবের জ্বালা'পূর্ণ তাদের জীবনে সুখ অতি দুর্লভ; কষ্টটাই একমাত্র সত্য, 'আর বেবাক-ই মিথ্যা'। কিন্তু এ সব বর্থ্যতা, হতাশার মূলে যে শ্রেণীর

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা সর্বাধিক তাদেরকে নিম্নবর্গের মানুষেরা দায়ী করতে ব্যর্থ, দোষ চাপায় সর্বশক্তিমানের উপর। শিক্ষিত ঘাট-মাস্টার তাই শিকদারের ভ্রান্ত ধারণাকে চিহ্নিত করেছে এভাবে –

'আল্লাহর দেয়া দুঃখ এ নয় শিকদার। এ দুঃখ দেয় মানুষ।–একদল চালাক মানুষ! তারাই পঞ্চাশে খাদ্য কেড়েছে, বস্ত্র কেড়েছে পরনের।'

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিচিত্র পেশা ও নানা সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। কেবল নদী ও নদীতে মাছ ধরে এদেশের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। আবার নদী ও নৌকাতেই একটা শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের জীবন আবর্তিত হয় অথচ মাছ না ধরে তারা সাপ ধরে ও সাপ খেলা দেখিয়ে অধিক স্বাছন্দ্য বোধ করে। এরা যাযাবর বেদে সম্প্রদায়। শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে নদীপথে ভাসমান বেদে-জীবনের কাহিনী তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ নিম্নবর্গের প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর হারিয়ে যেতে বসা জীবন ও জীবন-কাহিনী উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। শামসুদ্দীন আবুল কালাম আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করে *কাঞ্চনমালা* উপন্যাস' রচনা করেছেন। ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব বিচিত্র জীবনসমস্যার মধ্য দিয়ে সমগ্রতার সন্ধান করা । বিচিত্র জীবনসমস্যার সমগ্রতার সন্ধানের মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসের ক্রমবিকাশ। উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে গ্রামীণ নিম্নবর্গের যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন ও তাদের সুখ-দুঃখের বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণার মাধ্যমে, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রামীণ নিম্নবর্গেরই এক গৃহস্থ যুবক কাঞ্চনের জীবন-কাহিনী।

উপন্যসের কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে কাঞ্চন-মালা ও মদন-চাঁপার চতুর্মুখী প্রেমের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে। গ্রাম্য যুবক কাঞ্চনের পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই। গ্রামেরই এক গৃহস্থ, যা 'শেখের বাড়ি' নামে পরিচিত সে বাড়ির বিধবা বুড়ির আশ্রয়ে কাঞ্চনের বসবাস এবং বুড়িকে সে নানী বলে ডাকে। ' বুড়ীই তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহার স্বল্প ক্ষেত-বাগান সে দেখাশুনা করে, বিনিময়ে বুড়ী তাহাকে বাড়িতে রাখিয়াছে, সময়ে-অসময়ে ভালো-মন্দ রাঁধিয়া খাওয়ায় আর নিজের অভিশপ্ত জীবনের দুঃখের কাহিনী তাহার কাছে বলিয়া মন হালকা করার চেষ্টা করে।'

পদ্মানদীর তীর ঘেঁষে সাত আটখানা নৌকার বহর নিয়ে যে বেদের দল কাঞ্চনদের গ্রামে এসে একদিন উপস্থিত হয় তার সর্দারের নাম মঙ্গল মাঝি। সর্দারের স্ত্রী টিয়া বিবি এবং একমাত্র কন্যা মালা (মালা তাদের কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান)। তাদের পিছনের নৌকায় বাইশ-তেইশ বছরের মদন মাঝি আর তার মা টিয়া বিবি। এই বেদে-নৌকার বহর বিভিন্ন সময়ে জীবিকার সন্ধানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ঘুরে সাপের খেলা দেখায়, সাপ ধরে, সাপে-কাটা

Dhaka University Institutional Repository

রোগীর চিকিৎসা করে। বেদে সমাজের উন্মুল জীবনের সূত্রে এ উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের গ্রাম-সমাজ ও নিম্নবর্গীয় মানুষের অনেক চিত্র উঠে এসেছে।

গ্রাম্য যুবক কাঞ্চন গ্রামে আসা বেদের দলের যুবতী মালার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে এবং গ্রামের একমাত্র পাতানো নানীকে ত্যাগ করে বেদেদের দলে ভিড়ে যায়। গৃহী কাঞ্চন নিজ চেষ্টায় অল্পদিনেই বেদে জীবনের সঙ্গে মিশে যায় এবং নিজের দক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হয়। তার কাজের দক্ষতা দেখে সর্দার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় এবং কাঞ্চনকে ভাবী-সর্দাররূপে মনে মনে ঠিক করে। ধীরে ধীরে মালাও কাঞ্চনের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কাঞ্চনকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতে শুরু করে। এদিকে মালার প্রতি দুর্বল মদন বেদের দলে নবাগত কাঞ্চনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে নানাভাবে বিপদে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যায়। একদিন নাটকীয়ভাবে কাঞ্চন লক্ষ করে, মালার বাহুতে তাদের-ই গ্রামের কর্মকারের তৈরি 'বাজু' যা তাকে নিশ্চিত করে যে মালা নিশ্চয়ই মঙ্গলের মেয়ে নয় কিংবা বেদে-ই নয়, হয়তো বা সে গৃহস্থ-কন্যা। এদিকে মদন চাঁপাকে হাত করে কাঞ্চনের চরিত্রের উপর দুর্নাম চাপিয়ে দেয়। ফলে কাঞ্চনকে মালা ও সর্দার ভুল বোঝে। একসময় বেদের দল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় কাঞ্চনকে। নিঃসঙ্গ কাঞ্চন পুনরায় ফিরে আসে 'বুড়ী' নানীর কাছে। কাঞ্চনকে ফিরে পেয়ে বুড়ী খুশী হয়। একদিন বুড়ি বাক্স হতে কাপড় বের করার সময় একটা বাজু কাঞ্চনের সৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে 'বাজু' একদিন কাঞ্চন মালার বাহুতে দেখেছিল, তার-ই অন্যটি সে পায় বৃদ্ধর কাছে। ক্রমে আবিষ্কৃত হয়, কাঞ্চনের আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধাই মালার পিতামহী । কাঞ্চন ছুটে যায় বেদে-দলের সন্ধানে বেদে মঙ্গল ও বেদেনী ময়নার সঙ্গে কথা বলে কাঞ্চন নিশ্চিত হয় মালা তাদের কন্যা নয়। কাঞ্চনের কাছে সব শুনে মালা কাঞ্চনের হাত ধরে বেদে দল ত্যাগ করে গ্রামে ফিরে আসে। মদন ও চাঁপা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত করে কালনাগিনীর দংশনে নিজেদের আত্মহননের মধ্য দিয়ে।

একাধিক উপ-কাহিনী যুক্ত হয়ে *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসের মূল কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেছে,ফলে ধারাবাহিকতাও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। চরিত্রপ্রধান এ উপন্যাসের অধিকাংশই গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উপন্যাসে সমকালীন সমাজ-জীবনের চেয়ে বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ লোক-জীবনের কথা অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। 'মহুয়া' গীতিকার মহুয়া ও 'নদের চাঁদে'র কাহিনীর সঙ্গে উপস্যাসে বর্ণিত মালা ও কাঞ্চনের রোমান্টিক প্রেম-কাহিনীর যথেষ্ট মিল লক্ষণীয়। এ-প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মূল্যায়ন স্মর্তব্য–'সমগ্র উপন্যাসের পটভূমি ও বক্তব্য পূর্বাপর পূর্ববাংলার বিখ্যাত লোকগীতিকা 'মহুয়া'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'

Dhaka University Institutional Repository

কাঞ্চনমালা উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র কাঞ্চন যাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। গ্রামীণ নিম্নবর্গের এ যুবকের পৃথিবীতে 'আপনার জন বলতে কেউ নেই। গ্রামে এক বুড়ির আশ্রয়ে সে থাকে। মালার সঙ্গে পরিচিত হবার পর সে বেদে-বহরে যোগ দেয়। মালার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথোপকথনে কাঞ্চন চরিত্রের সরলতা ও অধিকার আদায়ের প্রবণতা দুই-ই স্পষ্ট হয়। মালার 'চোর' বলে ধিক্কারের জবাব দেয় সে এভাবে –

': বিশ্বাস করো, আমি চোর না। আমার বাড়ি নাই, ঘর নাই, চাল নাই, চুলা নাই - গ্রামদেশে যা খাটনীর কাজ' তাতে পেট ভরাইতে পারি না। আইজ পেটে বড় খিদা ছিল, গাছের ঐ পাকা আম দেখিয়া লোভও হইছিল বড়। যার আম বাগান সে আমারে অনেক খাটাইছে, কিন্তু সে তুলনায় মজুরী দেয় নাই তেমন। তাই

গ্রাম্য যুবক কাঞ্চন বেদে বহরে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নিজ কর্মকুশলতার গুণে।সুন্দর আচার-আচরণ ও দক্ষতা দেখিয়ে সর্দারেরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে কাঞ্চান। মালার প্রেমাসক্ত কাঞ্চন সাপ ধরবার নানা কসরৎ শিখে পুরোদস্তর বেদে হয়ে ওঠে। কাঞ্চন চরিত্রের এ রূপ-রূপান্তরের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' ছোটগল্পের মৃত্যুঞ্জয় চরিত্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কাঞ্চনের পেশা পরিবর্তনে কেবল যে মালার প্রেম ক্রিয়াশীল তা নয়, বরং নিজ পেশাতে দু'মুঠো অন্নের নিশ্চয়তা না থাকাটাও একটা অন্যতম কারণ যার উল্লেখ আমরা কাঞ্চনের উক্তিতেই পেয়েছি, 'খাটি। যা জোটে তাতে পেট ভরে না।' আর তাই সে যোগ দেয় বেদে বহরে।

বেদে সর্দার মঙ্গল মাঝি তার বহর নিয়ে 'প্রায় সারা বছরই' ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়ায়। 'যাযাবরের মত যাতায়াত করে দেশের এই প্রান্ত হইতে ওই প্রান্তে, এইখান হইতে সেইখানে। কেবল শীতের সময়টাতে এই গতিবিধিতে একটু মন্দা পড়ে।' তবে শীতকালে ওরা অন্য পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করে। কেউ মাছ ধরে, কেউ জাল বোনার কাজ করে আর মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে উঠে চুড়ি বেচার কাজে। তাদের মূল কাজ সাপ ধরা। ঔপন্যাসিক এদের কর্মপরিধির বর্ণনা করেছেন এভবে – 'সাপ ধরে, নানারকম ওষুধ-মাদুলী, শিকড়, গাছ-গাছড়া বেচে, টোটকা চিকিৎসা করে, ওঝালি করে, চুড়ি বেচে, আর বেচে রঙ-বেরঙের তাগা, ছোট ছোট আরশী আর কাঠের 'কাঁকই'। বিষ বেচা, কাহাকেও বশ করা বা পাগল করিয়া দেওয়া মন্ত্র দিয়া, কিংবা বাঁদরের হাড় ভিতে পুঁতিয়া কাহাকেও নির্বংশ করাও সাধ্যের মধ্যে।'

উপন্যাসে কাঞ্চন-মালার প্রেম-বিরহ-মিলনের কাহিনী প্রাধান্য পেলেও অন্যান্য চরিত্রসূত্রে গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবনের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। বেদে সর্দার মঙ্গল মাঝি। প্রাচীন এই বুড়ো দৃঢ় হাতে

Dhaka University Institutional Repository

বেদের দলটিকে পরিচালনা করে আসছে। নৈতিকতার বাইরের কোন জিনিসই তার কাছে প্রশ্রয় পায় না। মদন অসৎ উদ্দেশ্যে সাপের বিষ বিক্রি করতে চাইলে সর্দার তাতে বাধা দেয়-'লোভে পড়িয়া অসৎকর্ম করো যদি, তা-ই চৌখ রাখতে হয়।' নিম্নবর্গের শত কষ্টের মাঝেও উচ্চ নৈতিকতাবোধ আমাদের আকৃষ্ট করে। নিঃসন্তান বেদে সর্দার মালাকে নিজ সন্তানের মতো করে মানুষ করেছে। কখনো বুঝতে দেয়নি যে সে তার আসল পিতা নয়। নেতৃত্ব, স্নেহ, ভালোবাসা ও সততা প্রভৃতির মিশেলে সর্দার মঙ্গল মাঝি অতুলনীয়।

মদন খল চরিত্র। সেও নিম্নবর্গেরই লোক। মালাকে একতরফা করে ভালোবেসে জোর করে পেতে চায়। চাঁপার সহযোগিতায় সাময়িক সাফল্য লাভ করলেও নিজের জীবন দিয়ে তার পাপের প্রায়াশ্চিও করতে হয়।

নিম্নবর্গের মানুষের সুখ-দুঃখ, কষ্ট-কান্না নিম্নবর্গের মানুষ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে এবং তারা কখনও কখনও একে অন্যের বিপদে প্রবলভাবে অগ্রসর হয়। উপন্যাসে তেমনি একটি পরিপ্রেক্ষিতের চরিত্রের সন্ধান আমরা পাই যার নাম কানাই এবং সমগ্র কাহিনীতেও তার অবস্থান অতি সল্প সময়ের জন্য, কিন্তু স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। কাঞ্চনের বিপদ কানাই নিজেই অনুমান করতে সমর্থ হয় যা তার গভীর জীবনবোধের পরিচায়ক। আর দোতারা হাতে তার গাওয়া গান যেন জীবনের প্রতিচ্ছবি –

'ওরে মন মিছে তুই ভাবিস কেন অকারণ
সব ভাবনার ভবুক সে জন, নে রে তুই তারই শরণ।
এ দুনিয়ায় যা হবার তা হবেই
যদি তার উপরে ভরসা রাখিস তবেই
ভাগ্য যে রে আপনি এসে করবে তোকে বরণ।'

বেদে দলের অন্যতম সদস্য চাঁপার বাবা পবনমাঝি। সর্দারের দেয়া এ নামেই সে পরিচিত। অন্ধ পবনমাঝি সঙ্গীতে খুবই দক্ষ। তার এক কন্যা চাঁপা ও ১০/১১ বছরের এক পুত্র মধু। পবনমাঝি তার সঙ্গীতজ্ঞান অন্তরের দরদ দিয়ে সর্দার কন্যা মালার মাঝে প্রবাহিত করেছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র মালা। নাচ, গান, রূপ ও গুণে অনন্য মালা। মঙ্গল মাঝির পালিত কন্যা, প্রকৃতপক্ষে সে গেরস্থ ঘরের মেয়ে তথা বুড়ির নাতনী। প্রেম, ভালোবাসা ও সেবা শুশ্রুষায় সুদক্ষ নারী এই মালা। পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করা এই নারী অপরূপ সুন্দরী। ঔপন্যাসিকের রূপ-বর্ণন অংশটুকু নিম্নরূপ –

Dhaka University Institutional Repository

'সুঠাম দেহটিতে তিনটি কাজ করা, লাল-পাড় বসানো একখানা উজ্জ্বল সবুজ শাড়ী পরিয়েছে পেঁচাইয়া, গায়েও একটি আঁটো-সাঁটো লাল রঙের জামা। সেই রঙের মধ্যে গৌরবর্ণের দেহশ্রী যেন আরো উজ্জ্বল হইয়া কাচা সোনার মত ঝলকাইতেছে। খোঁপা বাধিয়াছে একটি তেরছা করিয়া, তাহাতে লাল জবা গোঁজা। গলায় রূপার তারী হাঁসুলী, হাতে কঙ্কন।'

কাঞ্চনকে প্রথম দেখায় মন দেয় মালা। মালা-কাঞ্চনের প্রেমের ক্ষেত্রে মালা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। চাপা-মদনের ষড়যন্ত্রে প্রাণাধিক কাঞ্চনকে সে লম্পট, দুশ্চরিত্র জেনে ঘৃণা করছে। এই ঘৃণা করার শক্তি মালা চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করেছে। আবার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে গেলে মালা কাঞ্চনের সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে হাত ধরে পালিয়েছে। প্রেম ও ঘৃণা দুটোই মালা চরিত্রে বিদ্যামান।

সমাজের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জীবনবাস্তবতার উপর আলো ফেলেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে। বেদে সম্প্রদায়ের জীবনের খুঁটিনাটি সব বিষয়ই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এ উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। কালা ধলার সূত্রে আমরা জানতে পারি কিভাবে গ্রামের সহজ সরল মানুষকে বেদে সম্প্রদায়ের কিছু দুষ্ট প্রকৃতির সদস্য ঠকিয়ে বেড়ায়। আবার সর্দারের দৃঢ় নৈতিকচেতনা আমাদের শ্রদ্ধা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় বেদে সম্প্রদায়ের প্রতি। সময় ও সমাজের প্রবহমানতায় নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কাঠামো-লালিত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয় সংগ্রাম ও আয়োজনের ভেতর দিয়েই উপন্যাসটির ক্রমবিকাশ। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের প্রত্যাশা ও অপ্রাপ্তি, স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গ, আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-দুর্দশার চিত্র শামসুদ্দীন আবুল কালাম তুলে ধরেছেন এ উপন্যাসে।

কাঞ্চনমালা উপন্যাসে বেদে-সম্প্রায়ের জীবন-চিত্র অংকনে কুশলী শিল্পীর মতোই অনুবীক্ষণীয় দৃষ্টি ফেলেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। ফলে তাদের জীবনের বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের বিশ্বাস, সংস্কার, পেশা, সব কিছুই চমৎকারে উপন্যাসে উপস্থিত। গ্রামীণ নিম্নবর্গের এই বেদে সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম বিশ্বাস মনসা দেবী'তে। তাই তারা খুব ধুমধামের সঙ্গে মনসা পূজা করে থাকে। বাংলার আর দশটি গ্রামের মানুষের সংস্কারের সাথে তাদের সংস্কারের সাযুজ্য রয়েছে। যেমন-পেঁচার বিশ্রী সুরে ডাকাডাকি বা কাক ডাকার সঙ্গে অজানা অমঙ্গলের শঙ্কায় তারাও শঙ্কিত হয়। সাপের বিষ বিক্রি হতে তাদের সর্বাধিক আয় হয়। তবে দুষ্ট বেদেরা বাড়তি উপার্জনের আশায় তালাক নেওয়া বা সম্পত্তি গ্রাস করার কাজে সহযোগিতা করে থাকে। কখনো কখনো আবার

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসার মানুষ বসে আনার মন্তরও তারা দিয়ে থাকে - 'ভালোবাসার মানুষ বশে আনার মন্তর চাও যদি ধলারে ধরো।'

শামসুদ্দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাসে, ছোটগল্পের মতোই মধ্যশ্রেণীর জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে। গ্রামীণ মধ্যশ্রেণী অপেক্ষা গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবন-রূপায়ণই ছিল লেখকের অন্বিষ্ট। ফলে মধ্যশ্রেণীর বিভিন্ন প্রবণতা বিভিন্ন উপন্যাসে নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসও এর বাইরে নয়। এ উপন্যাসে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর জীবন তেমন একটা নেই। গ্রামের সচ্ছল গৃহস্থ রমজান খাঁ এ উপন্যাসে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি। জমি-জমা দান করে সৎ পাত্রে কন্যা দান করে পাত্রটিকে ঘরজামাই করে রাখার যে দীর্ঘদিনের এদেশীয় মধ্যশ্রেণীর প্রবণতা রমজান খাঁ-র মাঝে তা পরিলক্ষিত হয় যা ঔপন্যাসিক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র কাঞ্চন যার অন্য নাম কালাচাঁদ, রমজান খাঁ-র স্বপ্ন কালাচাঁদকে ঘিরে এমনি ধারার 'জমি-জমা-মাইয়া দিয়া সংসারী করতে চাইছেলে কালাচাঁদকে।' মধ্যশ্রেণী মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক বলা যায়, ক্করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এভাবেই নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিম্নবর্গের উপর চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত।

সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষ ও মধ্যশ্রেণীর জোতদারের মুখোমুখি অবস্থানের কাহিনী নিয়ে শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর *যার সাথে যার* (১৯৮৬) উপন্যাস রচনা করেছেন। শামসুদ্দীন আবুল কালাম সমাজতান্ত্রিক ধারায় মানুষের মুক্তির উপায় খুঁজেছেন। উপন্যাসের কাহিনীকে জানা যায় গ্রামের মানুষের প্রায় সব জমি-ই কোনও না কোনও ভাবে হাতিয়ে নিয়েছে অত্যাচারী মহাজন জলিল মিয়া। এমনকি গ্রামের পাশের খাস বিলের মিথ্যে কাগজ তৈরি ক্করে জলিল মিয়া এটি তার দখলে নিয়ে আসে। সাধারণ মানুষ এই বিলে মাছ ধরে ও ধান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারত সহজেই। জলিল মিয়া নিমু হাওলাদারকে বিলের লিজ দিবে বলেও না দিয়ে শেষ পর্যন্ত হিঙ্গুল আলীকে দিয়ে দেয়। সাধারণ নিম্নবর্গের সম্মিলিত শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত জলিল মিয়া ও হিঙ্গুলদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। বিলের অধিকার ফিরে পায় সাধারণ মানুষ, যেখানে যার যার হিস্যা নিয়ে চাষাবাদ ও মাছ চাষের সমবায়ী স্বপ্নের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি।

উপন্যাসে শামসুদ্দীন আবুল কালাম, নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বলেছেন, তাদের নির্যাতিত হবার কথা বলেছেন। নিমু হাওলাদার *যার সাথে যার* উপন্যাসের অন্যতম পুরুষ চরিত্র ও গ্রামীণ নিম্নবর্গের প্রতিনিধি। এক পুত্র মনুয়া, কন্যা আয়েশা, স্ত্রী জরিনা ও বৃদ্ধা মা'কে নিয়ে নিমু

Dhaka University Institutional Repository

হাওলাদারের সংসার। কৃষক হাওলাদার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায় কিন্তু সে ফসল বিক্রি করতে গেলে ন্যায্য দাম পায় না। 'এখন আর হাল-হালটিতে তেমন যেন বরকত নেই। সব খানে সব জিনিসের দাম বাড়ছে। কেবল এতো কষ্ট করে নিমু যা ফলায় তার ন্যায্য দাম দিতেই বোধ করি সকলের কলজে ছিঁড়ে যায়।'পৃ. ২৩ অবস্থা দিন দিন খারাপই হচ্ছে। আজকাল 'অনেকেরই তো মুখে দেবার মতো দুটো দানা জুটছে না।' পৃ.৩২ নিমু হাওলাদার উদ্যমী লোক এবং পরিশ্রমীও। অভাব বলে বসে থাকার লোক সে নয়। প্রতিবেশী হাশেম মৃধার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তাই সে বলে. 'কিন্তু অভাব মেটাবার উপায় তো একটা খুঁজতে হবে। এ রকমভাবে আর বেঁচে থাকা চলে না ভাই। এক এক জনের অঢেল থাকবে .....ফোঁটার আশায় এ ও তো খোদার বিধান হতে পারে না।' পৃ. ৩৮ তাই একসময় নিমু হাওলাদার নিজেই উদ্যোগী হয় কিছু একটা করার জন্য। বিলের লিজের আশায় নিজ কন্যা আয়েশাকে বিয়ে দেয় জলিল মিঞার আশ্রিত মধু মিয়ার পুত্র গোফরা'র সঙ্গে। কিন্তু হাওলাদারকে বিল দেয়নি জলিল মিঞা। বরং সর্বনাশ করেছে নিমু'র কন্যা আয়েশার। এই জোতদার জলিল মিয়া গ্রামের সবাইকে কেনা গোলাম বানিয়ে রেখেছে।' গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষের সংখ্যা দিন দিন কেবলই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর অধিক জনসংখ্যা এদেশের আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুল-ফল-ফসলে ভরা গ্রাম আজ খাঁ খাঁ বিরানভূমি। মানুষ বাড়ছে, মানুষের 'খাইও বাড়ছে'। আর তারই ইঙ্গিত সৈজদ্দি'র উক্তিতে 'থাকবে কেমন করে? খাই বেড়েছে না ? মানুষ কী আর কোথাও কিছু খুঁড়তে-ধরতে-কাটতে বাকি রাখছে। মুল্লুক জুরে বাচ্চা-কাচ্চারাও ঘুরে বেড়াচ্ছে দিক্‌বিদিক। তাদের কাঁচা চোখ এড়িয়ে এক গাছাও কী আর কোথাও পড়ে আছে।' পৃ.৭৫

উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র হাশেম মৃধা নিমু হাওলাদারের প্রতিবেশী। গরীব কৃষক মৃধার সংসারে দুঃখ দুর্দশা আর অভাব অনটন লেগেই থাকে সারা বছর। আর হাশেম মৃধাও তাই সারাক্ষণ স্ত্রী পুত্রের সাথে খিটমিট করে। জলিল মিঞার অপকর্মের বিরুদ্ধে সবাইকে সাথে নিয়ে জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয় হাশেম মৃধা। নিমু হাওলাদার তাকে পাগলামী করতে বারণ করলে সে ফুসে ওঠে, ': পাগলামী ? নিজেদের মুখের দুটো অন্ন জোগাবার চেষ্টাকে তুমি বলো পাগলামী। এই সব দেশের জমি-জমা-পুকুর কী করে কে দখল করেছে সে সব বৃত্তান্ত তোমার জানা নেই ? ঐ জলিল মিয়া জোঁকের মতো চুষে চুষে মোটা হবে, আর আমরা এ ভাবেই নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকবো ? আল্লার দেওয়া এ দুনিয়ায় আমাদেরও হক আছে। আমরা কেবল সময় থাকতে তা আদায় করে নিতে চাই।'পৃ. ১২২ হাশেম মৃধার পুত্র জামাল আয়েশাকে ভালোবাসে। কিন্তু দরিদ্র পিতার সন্তান জামালের ভালোবাসা পূর্ণতা পায় না। আয়েশার পিতা আয়েশাকে বিয়ে দেয় অন্যত্র নিজেদের ভাগ্য ফেরানোর আশায়। নিজ কন্যাকে দিয়ে সওদা করে নিমু হাওলাদার। আয়েশা চলে

Dhaka University Institutional Repository

যায় শ্বশুর বাড়ি। সেখানে নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুর পূর্বে কোনওরকমে মৃত্যুপুরী থেকে ফিরে আসে। আবার দেখা হয় পূর্বপ্রমিক জামালের সঙ্গে। সে সময়ের মনোভাবনা প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তী সাক্ষাতে এভাবে 'তুমি চলে যাবার পর একটা প্রতিজ্ঞা আরো জোর করে নিয়েছি, কেবল বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ নয়, সব গরিবি দূর করার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিতেও রাজি আছি। তা না হলে এভাবে ধুঁকে ধুঁকে খুঁটে খুঁটে বেঁচে থাকার চেষ্টার কোনো অর্থ হয় না।'পৃ. ৮১

দরিদ্র চুড়িওয়ালী কদভানু নিম্নবর্গের সামাজিক অবস্থানটিকে স্পষ্ট করেছেন নিমু হাওলাদারের সঙ্গে কথোপকথনে। কথাপ্রসঙ্গে সে বলে, 'গল্প কথা হয় বড় মানুষদের ব্যাপার নিয়ে। আমার মতো ছোট মানুষের কথায় কোনোদিনই কোনো বিশেষ বস্তু ছিলোনা, আর এখনো নেই। তবে বড় জালের ক্ষেপ ছুঁড়লে রুই কাতলের সঙ্গে সঙ্গে পুঁটি তিতপুঁটিগুলিও উঠে আসে বই কী, তা কেউ খেয়ালে আনুক কী হেলা-ফেলা করুক।'পৃ. ৯২

শামসুদ্দীন আবুল কালামের *যার সাথে যার* উপন্যাসে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর একমাত্র ও সার্থক প্রতিনিধি জলিল মিয়া। সে একজন অত্যাচারী মহাজন। সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার ছাড়াও নারীদের ইজ্জত নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলে। গ্রামের প্রায় সকলের জমি হস্তগত করে জলিল মিয়া নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। তার বাড়ির চাকচিক্য সবার চেয়ে আলাদা। 'জলিল মিয়ার ঘর-বাড়ি এক আলাদা জগৎ। আসলে খোদতালার রহমত না পেলে কি আর এমন শান-শওকতির অবস্থা হয়। মস্ত বড় উঠানের চারদিকে চারটি টিনের ঘর। ঘিরে রেখেছে সীমা-শুমারহীন গাছ-গাছালির বাগান। দক্ষিনে তার আসল ঘর, উত্তরে কাছারী, পাশে মধু মিয়ার ঘর, আর অন্যদিকে কাজকর্মের সময় ঠাই নেয় জন-মানুষ-কামলা। চাল দেওয়া দাওয়ার আরাম কেদারায় শুয়ে জলিল মিয়া রেডিও শোনে, কখনো এর তার সঙ্গে গল্পগুজব করে। হাঁক না দিতেই দু'তিনটা চাকর-বাকর হুকুম তামিলের জন্য এসে খাড়া হয়। মধু মিয়াও জ্ঞাতি বটে, কিন্তু ভাব-সাব দেখে মনে হয় সে আর তার সংসার জলিল মিয়ার অনুগ্রহের উপর টিকে আছে।' পৃ.৪৭ গ্রামের একরকম অঘোষিত জমিদার এই জলিল মিয়ার শহরেও বাড়ি আছে। ধান কাটার মৌসুমে গ্রামে আসে জলিল মিয়া নিজ হিস্যা বুঝে নিতে। বাকী সময় শহরেই থাকে সে। মধ্যশ্রেণীর এই জলিল মিয়া গ্রামে একের পর এক অন্যায় অত্যাচার চালিয়ে যায় ক্রমাগত। বাড়ির চাকর মধুমিয়ার বৌ'কেও রেহাই দেয়নি। বিল বন্দোবস্ত করে দেবে এই লোভ দেখিয়ে নিম্নবর্গের নিমু হাওলাদারকে বোকা বানিয়ে তার মেয়ে আয়েশাকে জলিল মিয়া তার বাড়ির চাকর মধু মিয়ার ছেলে গফরা'কে দিয়ে বিয়ে করিয়ে আনে।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়েটা আসলে লোক দেখানো। বাসর রাতেই আয়েশাকে ধর্ষণ করে জলিল মিয়া।'এই-ই বাড়ির নিয়ম। প্রথম দাবি গুরুজনের।' পৃ. ৮৫ আয়েশা পরে তার সাবেক প্রেমিক জামালের কাছে বর্ণনা করে জলিল মিয়ার অত্যাচারের করুণ কাহিনী–'তার কান্নায় ভাঙা স্বর শুনে, তার চোখের আগুন দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় জামাল। আরো পাথর হয়ে যায় যখন পিঠের কাপড় ফেলে, বুকের আচ্ছাদন সব লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে একটানে সরিয়ে আয়েশা দেখায় অজস্র ক্ষতচিহ্ন। তার পিঠের কালো কালো জমাট বাঁধা রক্তের দাগ, ছোট দুটি স্তনের উপরে আর আশে পাশে আঁচড়-কামড়ের চিহ্ন দেখে মনে হয় কেউ বা কারা তাকে বুঝি শুধু প্রাণে মারতেই বাকি রেখেছে।' এই হচ্ছে জলিল মিয়া, অথচ বাস্তবে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। ধর্মগুরুর ব্যবসা নিয়ে আসা জলিল মিয়ার পূর্বপুরুষেরা এদেশে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে একদিন। জলিল মিয়ার বাইরের রূপ দেখে তার ভিতরের রূপের কথা কারো কল্পনাতেও আসবে না। 'রোজা রাখে, নামাজ পড়ে পড়ে কপাল ঠুকে দাগ তুলে ফেলেছে' জলিল মিয়া। তার মধ্যে এমন শয়তানী একেবারে অচিন্ত্যনীয়। তবে নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষকে চিরদিন তো আর বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। এক সময় তারা জলিল মিয়ার স্বরূপ উদঘাটন করে এবং সবাই মিলে তাকে রুখে দাঁড়ায়। হাশেম মৃধাকে গুলি করে পালিয়ে যায় জলিল মিয়া কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। মাগন ফকির তাকে হত্যা করে। নিম্নবর্গের জনতার বিজয় সূচিত হয় শেষ পর্যন্ত। অত্যাচারী মধ্যশ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন হতে দেখি উপন্যাস-অন্তে।

বাংলাদেশের কথাসহিত্যে বিশেষত উপন্যাস শাখার বিষয়বৈচিত্র্য বহুমুখী। নানা বিষয়ের মাঝে বাংলাদেশের উপন্যাসে নদী ও নদীকেন্দ্রিক জীবন একটা বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছে। 'জায়জঙ্গল' (১৯৭৮) শামসুদ্দীন আবুল কালামের একটি তেমনই উপন্যাস যার বিষয় আবর্তিত হয়েছে নদীমাতৃক এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা ও সুখ-দুঃখের নানা উপাখ্যান ঘিরে। বাংলাদেশের উপন্যাসে নদীভাঙ্গন ও নিম্নবর্গীয় ছিন্নমূল মানুষের জীবনচিত্র নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। প্রকৃতি হয়ে উঠেছে এসব উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এ ধরণ উপন্যাসগুলোতে ঔপন্যাসিকগণ নদী মানুষ বা সাগর জীবনের করুণ কাহিনী বাস্তবতাসহযোগে অঙ্কন করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় হুমায়ুন কবিরের *নদী ও নারী,* সমরেশ বসুর *গঙ্গা,* কাজী আফসার উদ্দীনের *চর ভাঙাচর,* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি,* আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলি,* অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম,* এবং শহীদুল্লা কায়সারের *সারেং বউ* প্রভৃতি কালজয়ী উপন্যাসের নাম। উপর্যুক্ত উপন্যাসে আবহমান গ্রামবাংলার দুঃখী মানুষের করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শামসুদ্দীন আবুল

Dhaka University Institutional Repository

কালামের *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে নদী, মানুষ ও বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন অস্তিত্ব সংগ্রামে রত মানুষের কথা বর্ণিত হয়েছে।

উপন্যাসটি সম্পর্কে, বাংলাদেশের সাবেক জনপ্রিয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন একটি পরিচয়পত্র প্রদান করেছেন। উপন্যাসের আলোচনার সুবিধার্থে উদ্ধৃত করছি সে অংশবিশেষ –

'শ্রীহট্টের জঙ্গল এলাকায় একবার একটি বৃহৎ সাপ এবং হাতির যুদ্ধের সময় তাদের উভয়ের ক্রন্দন আমাকে খুবই বিচলিত করেছিল। আমি তখন হাতিটির প্রতি অধিক মমত্ববোধ করেছিলাম। মানুষের নানা ক্রন্দন ও আর্তনাদও আমাকে সারাজীবন কষ্ট দিচ্ছে ; কিন্তু ঐ ঘটনাটি আমাকে পরবর্তী জীবনে সর্বদা কর্তব্যের প্রতি সজাগ ও সতর্ক রেখে এসেছে।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে শামসুদ্দীন আবুল কালামের লেখা *কাশবনের কন্যা* বইখানা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই আমি এই প্রবীন ঔপন্যাসিককে অজস্র প্রশংসা ও আশীর্বাদ করেছিলাম। এটা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। এরপর দীর্ঘকাল যাবৎ ইউরোপ প্রবাসী থেকেত্ত বিদেশে বসেই বিশেষ যত্ন করে বাংলাদেশের পরিবেশের স্মৃতিচারণ করে তাঁর স্বদেশ-প্রীতির প্রমাণ করেছেন। তাঁর সমস্ত রচনার ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে সুন্দরবনে হোক অথবা অন্য বনেই হোক, তিনি 'বাঘ'-এর সঙ্গেও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বিষয়েও সজাগ; কিন্ত প্রকৃতিলালিত সেই জন্ত ও অসঙ্গত আক্রমণে উদ্যোগী হলে তিনি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তার মুখামুখি হতে পশ্চাৎপদ নন। তাঁর এই বর্তমান উপন্যাস *জায়জঙ্গল* তারই প্রমাণ বহণ করছে। জীবজন্ত এবং উদ্ভিদজগৎও আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁরই সৃষ্ট দেশ-প্রকৃতি ও মানুষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সৌন্দর্য ও মূল্যবোধের প্রধান কারিগর। একে বিনষ্ট করে মানুষের সাময়িক নানা চাহিদা মিটলেও পরিণামে তা মানুষেরই সুন্দর বৃত্তিকে ধ্বংস করবে–এই মূল বক্তব্যের সঙ্গে এই গ্রন্থে দেশের এক অনন্য পটভূমিতে যে রসময় চিত্র উপস্থিত তিনি করেছেন তা ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করে কেউ প্রকাশ করেন নি।' পৃ.৭

প্রবাসে থেকে এদেশের মাটি ও মানুষকে নিয়ে সাহিত্যসাধনার বিষয়টি বাংলা ভাষায় দুর্লক্ষ্য নয়। মাইকেলের পথে আরও একধাপ অগ্রসর হয়েছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। ইউরোপে বসেই তিনি এদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতিকে চিত্রিত করেছেন তাঁর *জায়জঙ্গল* (১৯৭৮) উপন্যাসে। উপন্যাসের মধ্যে লেখক নিজ জীবনের ফেলে আসা স্মৃতি রোমন্থনের পাশাপাশি নদী সংলগ্ন জীবন ও জনপদের কথা বলেছেন। নদী তীরবর্তী মানুষের জীবনে প্রায়ই নানা বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে যা তাদেরকে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করে দেয়, ছিন্নমূল হয়ে পড়ে অসহায় মানুষগুলো। অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকতে দূরে, আরো দূরের অবস্থানে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বন কেটে আবাদযোগ্য জমি বের করে গোলপাতা সংগ্রহ করে, দিনমজুরি করে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই-সংগ্রাম করে এই অবহেলিত নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী টিকে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

জায়জঙ্গল উপন্যাসে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম সমুদ্র উপকূলবর্তী অভিবাসিত মানুষের বিপর্যস্ত জীবনগাথা পাঠকের কাছে বিবৃত করেছেন।

সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে এদেশের। নরম পলিমাটির এ ভূখণ্ড চিরযৌবনা। বন-জঙ্গল, গাছ-পালা, পশু-পাখী প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও আল্লাহর সৃষ্টি যা মানুষ তার প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে চলেছে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষদের জীবনসংগ্রাম অবাধ ও তীব্র। জীবিকার অনিবার্য তাগিদে অনেকেই পারিবারিক জীবনের সৌহার্দ্য মাধুর্যে নজর দেবারও সময় পায় না ঠিকমতো। ফলে এই প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। এই সূত্র ধরিয়াই তাদের প্রেম-রঙ্গ-সঞ্জাত সম্পর্ক সহজ দাম্পত্যের রূপ পরিহার করিয়া অনেকটা আদিম সংঘর্ষ-সংগ্রামের পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে।' পৃ.৯ আর এ বিষয়টিকে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম মোটেই মানতে পারেন নি কেননা আজীবন তাঁর আর্কষণ সুন্দরের প্রতি। সমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্কুলতার মধ্যে আলোচিত আন্দোলিত মানুষগুলো সর্বদা লিপ্ত থাকে দ্বন্দ্ব-কলহে। ফিরে যায় এক ধরনের আদিমসত্তার দিকে। ফলে তাদের জীবনে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। নিতান্ত উপয়ান্তর না থাকলেই এই অঞ্চলে মানুষ বসতি স্থাপন করে। আর এই কারণে এখানে বসতি অল্প। ভূমি জলজ ও জলঙ্গাকীর্ণ। 'প্রায় অয়নান্তবৃত্ত অন্তর্গত আর্দ্র ও উঞ্চ জলবায়ুর অনুকূল প্রভাবে এইখানে সংখ্যাহীন বিচিত্র জীবকোষ রূপাশ্রয়ের মহোৎসবে নানা প্রাণী ও উদ্ভিদ সমাকীর্ণ এক বিশিষ্ট ভুবন গড়িয়া তুলিয়াছে।' পৃ.১০ নানারকম বিরাটাকার বৃক্ষ, অজস্র লতা ও গুল্ম, লম্বা হোগলা, গোলপাতা, নলখাগড়া, দুর্গম অরণ্য। আছে অজস্র হিংস্রপ্রাণী। আদি-ব্যাধি,ঝড়-বন্যা, অপঘাত-অপমৃত্যু ছাড়াও সহযোগী মানুষের সঙ্গেও লড়াই করেই এখানকার জনগোষ্ঠীকে টিকে থাকতে হয়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র জয়নাল শেখ তাহাদেরই একজন। সাত বছর আগে একদল কাঠুরিয়া বহরের সঙ্গে অনণ্যোপায় হয়ে এখানে ভেসে এসেছিল জয়নাল শেখ। ত্রিশ পার করা শেখের কালো শরীর ইস্পাতের ন্যায় মজবুত, স্বভাব চাপা স্বল্পভাষী। স্ত্রী হালিমন এবং একমাত্র ছোটবোন সাজুকে নিয়ে তার সংসার। পিতৃপুরুষের পেশা যুদ্ধবৃত্তি হলেও গাঙের গ্রাসে এক রাত্রির মধ্যে যাহা কিছু ছিল সবই নিশ্চিহ্ন হইয়া' গেলে শেখ পিতৃপুরুষের পেশায় আর মন দিতে পারেনি'। এখানে বসতি গড়লে প্রতিবেশী হিসেবে পায় তালেব, মিকু, লালু খা-কে। নাটকীয়ভাবে একদিন মৃতপ্রায় অবস্থায় উদ্ধার করে মিন্নত আলীকে। জয়নাল শেখ, তার স্ত্রী ও ছোট বোনের সেবা শুশ্রুষায় মিন্নত আলী বেঁচে ওঠে এবং জয়নাল শেখের সঙ্গেই যোগ দেয় নতুন পেশায়।

উপন্যাসে খেটে খাওয়া এসব সাধারণ নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ইংরেজের দালাল ও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী অত্যাচারী মহাজন ও আড়ৎদার জলিল মিঞা ও তার দোসর

Dhaka University Institutional Repository

মোকাম্মেল। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের কাজে জলিল মিঞার প্রতিপক্ষ ও মন্দের ভালো আজমল সর্দার বোরছান তালুকদারগণও রয়েছে এতদঞ্চলে। এছাড়া গৃহকর্তা মজ্জিদ, রমজান, কাদের, গিয়াসুদ্দীন মোল্লা এবং নারীলোভী হিঙ্গল ফকির চরিত্রও উপন্যাসে উপস্থিত।

উপন্যাসের একদিকে নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আর অন্যদিকে ইংরেজের আশীর্বাদপুষ্ট দালালদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার চিত্রও উদ্ভাসিত। লালু খাঁ-র মুখে ঔপন্যাসিক তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন প্রতীকী ঢংয়ে-'হায় হায় রে, খোদার সৃষ্টি জীব, তারে আবার তারই সৃষ্টি জন্তু জানোয়ার আর মানুষে মিলিয়া কী দশা করছে।' পৃ.১৭

নিম্নবর্গের অসাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন সংগ্রাম খুবই কঠিন, প্রতি মুহূর্তে জীবনাবসানের হাতছানি। এরকম অবস্থাতেই তারা পেশার প্রতি সৎ থেকে রুটি ও রজির জন্য জান বাজি রেখে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করে চলে। সমতল ভূমি হতে বিতাড়িত হয়ে তারা এ রকম শ্বাপদসংকুল পরিবেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, শখ করে আসেনি। তাদের কর্মস্থলের বর্ণনা লক্ষনীয়-' কুমিরের উৎপাত কিছুটা কমিয়া আসিলেও অন্যান্য জন্তু জানোয়ার এখনও প্রচুর; নানা রকম বিষাক্ত সাপ এবং মাছ-খেকো বাঘ জোয়ার-ভাটা চলতি খালের পাড়ে প্রায়ই ওত পাতিয়া থাকে। তাহার ওপর রক্ত-চোষা জোঁকের দৌরাত্ম্য।' পৃ.১৪ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এদেশে বনভূমির পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে জনসংখ্যা। বাড়তি মানুষের চাপ পড়েছে পাহাড়-বন-জঙ্গল-সমুদ্র সর্বত্র। ফলে আমাদের প্রকৃতির নানা সম্পদ ও সৌন্দর্য আজ খালি চোখে দেখা যায় না। 'কই যে ডাঙ্গায় মানুষ বাড়িয়াই চলছে। কতো বৎসর ধরিয়া এই জঙ্গলে গোলপাতা কাটর কাম চলতে আছে। মানুষের ঘরের চাল ছাওয়াও শেষ হয় না।' পৃ.৩৩ নিম্নবর্গের মানুষের পূর্ণ জীবন-ভাবনা ঔপন্যাসিক মিকু'র ভাবনায় তুলে এনেছেন এভাবে –

'মনে কয় এইসব বাঁচিয়া থাকন-টাকন কোনো আসল কথা না। আদতে এই দুনিয়ার মধ্যে দুইজন মহাশক্তিধর আছে, যাদের চৌখে দেখি না। তাগো একজন কেবল বানায়, মনে সাধ-আল্লাদ ইচ্ছা-আকাঙ্খা ভরিয়া ছাড়িয়া দেয়, আর অন্যজন যেন তার সামনেই আবডালে ওত পাতিয়া রইছে।তার আবার এমনই শক্তি যে কখনো জোঁক কখনো ব্যাধি আর কখনো-বা ঝড়-তুফান হইয়া সব গিলিয়া গিলিয়া খায়। আর ক্ষুধার আর নিবৃত্তি নাই। নানান লোভ দেখাইয়া সে আমাগো মন ভুলায়। আমরাও তার প্রবল টানে হাড়গোড় পর্যন্ত লইয়া তার পেটে গিয়া একদিন সমস্ত ভুলিয়া যাই। এই কয়েক বৎসর এই জঙ্গলে থাকিয়া আমার মনে হয়, সেই মহা শক্তিমান দানবটা যেন পাশের সমুদ্রের মধ্যেই অধিবাস করিয়া আছে।' পৃ.৩৮

Dhaka University Institutional Repository

জায়জঙ্গল উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা যে অরণ্য-সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে বসবাস করে তা কখনোই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতীক নয়। এখানে জলে-স্থলে সর্বত্রই বিপদ। জলা ও জঙ্গলের দ্বিবিধ পরিসরে মানবজীবনের কঠিন ও দুরূহ সমস্যাকীর্ণ জীবনসংগ্রাম উপন্যাসে প্রদর্শিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র জয়নাল শেখ নিম্নবর্গের সার্থক প্রতিনিধি। যথেষ্ট উজ্জ্বল চরিত্র এ উপন্যাসে জয়নাল শেখ যদিও জীবনযুদ্ধে এক পরাজিত সৈনিক। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে, নিজ অঞ্চল থেকে চ্যুত হয়ে সে ভাটির দেশে এসে বনজঙ্গলে বসবাস শুরু করে। দরিদ্রতার সাথে যুদ্ধ করে গাছ কেটে, গোলপাতা তুলে এবং জলিল মিঞার অধীনে কামলা খেটে জীবিকানির্বাহ করে জয়নাল শেখ। অত্যন্ত ধৈর্যশীল শেখ, যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে অধৈর্য না হয়ে।

হিঙ্গল ফকির এ উপন্যাসে ভণ্ড ও প্রতারক কবিয়াজ। সেও বাঁচার লড়াইয়ে নিয়োজিত কিন্তু অসৎ ভণ্ড ও প্রতারক। নিজেকে উঁচু মাপের কবিরাজ বলে প্রচার করে। কবিরাজির আড়ালে নিজের কুপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার প্রয়াস পায় সে। জয়নাল শেখের দুর্বলতাবশতই হিঙ্গল ফকিরকে সে কাঠ বেচাকেনার হাট হতে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কবিরাজের কেরামতির কথা শোনে বিশেষ করে সন্তান-ধারণ হবে তার স্ত্রীর সে আশায়। বাড়িতে এনে সেবা যত্নের কোন ত্রুটি রাখেনি সে। ফকির একরাতে কৌশলে জয়নাল শেখ ও ছোট বোন সাজুকে পানি পড়া খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে হালিমনকে ধর্ষণ করতে চাইলে হালিমন মাথার খোপাঁর কাঁটা দিয়ে হারামজাদা বদমাইশ হিঙ্গল ফকিরের চোখে আঘাত করে চিরকালের মতো বদমাইশী শেষ করে দেয়।

মোকাম্মেল জলিল মিঞার পেয়াদা। জলিল মিঞার উপযুক্ত পেয়াদা সে। ভয়ংকর, অত্যাচারী মোকাম্মেল। আজমল বোরহান তালুকদারের কামলা সর্দার। কাদের ও রমজান বোরহান তালুকদারের বাড়িতে কামলা খাটে। তালেব, মিকু এবং লালু খাঁ তারা তিনজন জয়নাল শেখের প্রতিবেশী এবং নিম্নবর্গীয় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। তারা সবাই জলিল মিঞার অধীনে কামলাা দেয়। আরেক সর্বহারা মিন্নত আলীকে মৃতপ্রায় অবস্থায় উদ্ধার করে বাড়িতে আশ্রয় দেয় জয়নাল শেখ। পরে মিন্নত ও সাজু পরস্পরকে ভালোবেসে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এর মধ্যে তাদের প্রেমে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় জলিল মিঞা। মেয়ের বয়সী সাজু'কে সে নিকাহ করার প্রস্তাব করে। এক সময় সাজুকে লোক দিয়ে তুলে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সকলের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে সাজু'র কোন ক্ষতি সে করতে পারে নি। মিলন হয় সাজু ও মিন্নত আলীর।

পুরুষচরিত্রের পাশাপাশি নারীচরিত্র চিত্রণেও শামসুদ্দীন আবুল কালাম এ উপন্যাসে তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। জয়নাল শেখের স্ত্রী হালিমন উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র। নিঃসন্তান হালিমন

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী সেবার পাশাপাশি সংসারকে আগলে রাখে এবং মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে একমাত্র ননদ সাজুকে। সারাদিন ননদের সঙ্গে খুনসুটি করে ননদকে ফূর্তিতে রাখে। নারীসুলভ কোমলতার পাশাপাশি প্রয়োজনে কঠোর হতেও জানে হালিমন। কবিরাজের ধোঁকায় পড়ে স্বামী ও ননদ যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন হালিমন নিজেই নিজেকে রক্ষা করেছে বদমাইশ হিঙ্গল ফকিরের হাত হতে। শুধু তাই নয়, ভণ্ড ফকিরকেও চিরজীবনের মতো ভণ্ডামির শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে। উপন্যাসের আরেকটি নারী চরিত্র হচ্ছে সাজু। জয়নাল শেখের ছোট বোন সাজু কিশোরী। পরে যৌবন প্রাপ্তা হবার পরে বাড়িতে আগন্তুক অতিথি মিন্নত আলীকে ভালোবাসে সে।

গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর একটি মাত্র চরিত্র এ উপন্যাসে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত, আর সে হচ্ছে জলিল মিঞা। সে ঠক, প্রতারক ও খল চরিত্র। অত্যাচারী জলিল মিঞার প্রধান কাজ মানুষকে কষ্ট দেয়া। লোক ঠকিয়ে টাকা কামিয়ে মহাজন হয়েছে জলিল মিঞা। অন্যের ক্ষতি করার চিন্তায় তার অধিকাংশ সময়ের ভাবনাজুড়ে থাকতো। ইংরেজের দালাল এই জলিল মিঞা প্রকৃতির সম্পদ লুণ্ঠনে নিয়োজিত। নারীলিপ্সাও জলিল মিঞার কম ছিল না কোনও অংশে। হাঁটুর সমান বয়সী সাজুকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে সে তাকে জোর করে উঠিয়ে আনে, যদিও শেষ রক্ষা হয় নি।

গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর মাঝেও কখনও কখনও ভালো মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এ উপন্যাসের তেমনি একজন ভালো মানুষ বোরহান তালুকদার। জলিল মিঞার পাশের গ্রামের লোক বোরহান তালুকদার। সেও জলিল মিঞার মতো একজন মহাজন। তবে প্রকৃতিতে ভিন্ন এই তালুকদারের পেশা ব্যবসা বাণিজ্য। এই মুল্লুক পূর্বে বোরহান তালুকদারের পূর্ব পুরুষের দখলে ছিল যা ইংরেজ ও তার দালালদের সহযোগে হাতছাড়া হয়ে গেছে। মহৎ ব্যক্তি বোরহান তালুকদার প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের সমব্যথী ছিলেন তাই সাজুকে উদ্ধারের যুদ্ধে সে জলিল মিঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

নদী ভাঙনের শিকার ছিন্নমূল মানুষের সংগ্রামী জীবনালেখ্য *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। সব কিছু হারিয়ে এ সব মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সমুদ্র তীরবর্তী অরণ্যঘেরা অঞ্চলে। নিম্নবর্গের মানুষগুলো 'জীয়ন-সাধনা' করে 'জান দিয়া।' জঙ্গলে শিয়াল রাতে হানা দেয় তাদের ঘরে আবার মানুষরূপী 'বড়ো শিয়াল জলিল মিঞা'রাও যখন তখন হানা দেয় তাদের জীবনে। প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে টিকে থাকে ওরা। সমাজের খণ্ড খণ্ড নানা চিত্রের পাশাপাশি নদীভাঙন কবলিত মানুষের জীবন ও জীবিকার নানা লড়াই-সংগ্রামের কথাকে শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে পরিপূর্ণতা দান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমুদ্র বাসর (১৯৮৬) শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। উপন্যাসে ব্যবহৃত গদ্যরীতির প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক উপন্যাসটির আঞ্চলিক সাদৃশ্য রক্ষার কথা বলেছেন। 'আঞ্চলিক সাদৃশ্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রাচীন গদ্যরীতি ব্যবহৃত।' লেখকের *জায়জঙ্গল* উপন্যাসের সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে। *জায়জঙ্গলের* মতোই এ উপন্যাসে নদীভাঙন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত, রিক্ত ও নিঃস্ব নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা বলা হয়েছে। *সমুদ্র বাসর* উপন্যাসে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম গ্রামীণ নিম্নবর্গের যাযাবর জীবন-কথা ও সাগর জীবনের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। নদী ভাঙনের শিকার হয়েছে নিম্নবর্গের নিঃস্ব মানুষগুলো কেবল ভাটার দিকে বসতি স্থাপন করে, সেখানে মধ্যশ্রেণীর মহাজন-জোতদারদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে কেউ কেউ আরো 'নামা'র দিকে চলে যায়, একেবারে সমুদ্রের কাছাকাছি। উপন্যাসে সে-সব নির্যাতিত মানুষের কথাই বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলের জেগে ওঠা চর ও চর দখল নিয়ে লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। উপন্যাসে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম সে-বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। এছাড়া প্রকৃতির রুদ্ররোষ, ঘূর্ণিঝড়, প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাস সব মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গের আপন বৈশিষ্ট্যের চিত্র দিয়ে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর এ উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসে হত-দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়ের কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে যা আমাদেরকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি* ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। উপন্যাসে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম যে নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা বলেছেন, সে নিম্নবর্গের পরিচয় দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে –

এ কাহিনী এক হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসের মতই পুরাণ-কথা। দেশ কাল এবং মানুষ গোষ্ঠীভেদে তাহার ভাষ্যও একই রকম নয়। লিপিবদ্ধ ইতিহাসে রাজ্যরাষ্ট্র ভাঙাগড়া, তাঁহার রাজ-রাজন্যের বিবরণ আছে। শিলালিপি, তাম্র, এমন কি স্বর্ণপাত্রেও বহু কীর্তি-কাহিনী এবং জয় পরাজয়ের খণ্ড খণ্ড অধ্যায় মিলাইয়া যে ইতিহাস সাধারণত লিখিত হয়, তাহারও বাহিরে জীবন কথা পড়িয়া রয় সেইদিকে কাহারও দৃষ্টিপাত বড় সহজ হইয়া ওঠেনা।'

আসলে ইতিহাস তো চিরকালই বড় মানুষের জন্য, সচ্ছলদের জন্য এবং জয়ীদের জন্য রচিত হয়েছে। সেখানে নিম্নবর্গের স্থান কোথায় ? এ সমস্ত মানুষের পাশেই যে সকল মানুষ মুখ বুজে সহ্য করে প্রবলের অত্যাচার, বহিরাগত লোভীর অশ্বখুরতলে পিষ্ট হয় বারংবার, কখনও অজ্ঞাত শত্রুর হাতে জীবন দেয়, তাদের গৌরব-গাথা কখনও কোথাও স্থান পায় না। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে সেই অবহেলিত নিম্নবর্গীয় মানুষকে এনেছেন, তাদের জীবনকাব্য বর্ণনা করেছেন নিজস্ব ভঙ্গীতে।

Dhaka University Institutional Repository

'এই বিরাট বিচিত্র বিশ্ব সমুদ্র হইতে উত্থিত, না স্বর্গ হইতে বিচ্যুত সে গবেষণা পণ্ডিতজনের তর্কশাস্ত্র। বসুন্ধরা প্রশ্ন থাউক, সমুদ্র উপকূলের এই সমতট অঙ্গন একরকম পলিরেনু বহাগঙ্গা বা গঙ্গারই সৃষ্টি। কোন সুদূর হিমল পর্বতমালা কবে অকস্মাৎ গভীর জীবন গ্রহে উত্থিত হইয়াছে, কবে তাহার গাত্র নিসৃত নানা স্রোতধারা এখনও কখনও প্রায় জন্ম লাভ করা চপল শিশুর মত, কখনও কৌতুহলী কিশোরীর গোপন অভিসারের মত প্রস্তর এবং উপল খন্ডের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিতেছে তাহারও কোন মীমাংসা নাই। বহু চড়াই উতরাই, বহু অরণ্য উপত্যকার মধ্য দিয়া সে যখন ধ্যান-মৌন পিতৃভূমির পাদদেশে আসিয়া পৌছিয়াছে তখন পূর্ণ যৌবনা তরুনী।'

সমুদ্রতীরবর্তী দুই তীরে, মানুষ বিস্মিত হয় সমুদ্রের রূপ দর্শন করে। আবার সমুদ্রকে তাদের লোকালয়ের নিকটে অগ্রসর হতে দেখে এরা ভীত হয়। এই গাঙ্গ বা গঙ্গাই এতদঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। আর এই গঙ্গাকে ঘিরে তাদের মধ্যে নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে। 'ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জগৎজীবন স্রষ্টার রূপ যেমন বিভিন্ন, কেউ সন্তুষ্ট আকারে কেউ মগ্ন নিরাকারে, সেই একইভাবে জীবনজগৎকে লইয়া নিজ নিজ প্রয়োজন এবং ধ্যানানুসারে নানা রকম সংস্কার ও পার্বণ জন্মলাভ করিয়াছে কখনও গোপন উপসনার মত কখনও বা আনন্দ মুখর উৎসবে।' সমতটভূমির আশে-পাশে ভূমি ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। এই ভূমির ইতিহাস বহু পুরাতন। 'মহাকবি কালিদাসের বর্ণনায় আছে বটে দূরাদয়শ্চক্র নিত্যস্যতম্বী তমালতালি কনরাজ্জিনীলা, ধারানিবদ্ধেব লবনাম্বু রাশি কলঙ্ক রেখা।' সমুদ্র নিকটবর্তী লোকালয়গুলির নামকরণের ইতিহাস হতে আমরা এ আঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষের উপরে প্রভুত্ব বিস্তারকারী লোকজনের কথা জানতে পারি।

'কাহারা সমুদ্র নিকটবর্তী লোকালয় গুলির নামকরণ করিয়াছিলেন অভয়নীল, দেউল দুয়ার, রূপারঝোর, বৈশাখী বা নাচন-মহল তাহাদের কোন চিহ্নও আর কোথাও বজায় নাই, নামও গবেষণার বিষয়। পরবর্তীকালে সম্ভবত পাঠান-মোগল আমলে কোথাও কোথাও সৃষ্টি হইয়াছে বাহাদুরপুর, সুবিদপুর, বাকেরগঞ্জ। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে পাদ্রী শিবপুর, চর ভদ্রাশন শুজাবাদ, সেই সঙ্গে প্রায় অর্থহীন নলছিটি, ঝালকাঠি, ছেঁলা বুনিয়া বেতাগী অথবা কুয়াকাটা মাটিভাঙ্গা নামগুলি আরও প্রমাণ দেয় এই এলাকায় প্রভুত্ব বিস্তারের লোকের অভাব নাই।'

এ অঞ্চলের মানুষ. আজ তাদের যে পরিচয়-ই থাকুক না কেন, প্রবল প্রভাবশালী আর্য গোষ্ঠী ও বিদেশী সাম্রাজ্যলোভীদের তাড়া খেড়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে খণ্ড খণ্ড জনপদের

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নবর্গের মানুষগুলোর পেশা এবং জীবনযাত্রার গোপনীয়তা বাহিরের মানুষের কাছে অপরিচিত রয়ে গেছে আর তাদের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীরও কোনও আত্মীয়তাবোধ গড়ে ওঠে নি।

উপন্যাসের শুরুতে নিম্নবর্গের ধীবরশ্রেণীর জনগোষ্ঠীর বিচিত্র জীবনের রূপায়ণ করেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। এই শ্রেণীর নানা সংস্কার বিশ্বাস, কুমির ব্রত পালার রেওয়াজের নানা বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। সখানাথ, গিরিশ, গৌতম, শ্রীহরি, দেবনাথ প্রমুখ জেলে সমুদ্রে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। ক্রমে কাহিনীতে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়। মধ্যশ্রেণীর অত্যাচারী মুজফফর *সমুদ্রবাসর* উন্যাসের অন্যতম চরিত্র। গরিবের উপর অত্যাচার করা যার প্রধান কাজ। খাতক সময়মতো পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে কোন দয়ামায়া নেই মুজফফের কাছে। 'এই বার ফসল ভালো হয় নাই, আরেকবার খরার 'দোহাই' আমি দানছত্র খুলিয়া কাঙাল খাওয়াইতে বসি নাই।' পৃ. ২৩– এই হলো মুজফফর মিঞা, এই বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠীর দলপতি মুজফফর মিঞার দয়া ভিক্ষা ছাড়া এ অঞ্চলে কারোরই দিন চলে না। আর সে দুর্বলতার সুযোগে মুজফফর চরম স্বৈরাচারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তার অত্যাচারের পূর্ণতা দিতে লাঠিয়াল ইউসুফ সুজা ও গনি মিঞাকে সাগরেদ হিসেবে জুটিয়ে নিয়েছে। আসলে জন্ত জানোয়ারের এ অঞ্চলে মানুষগুলো জন্ত জানোয়ারেরর সঙ্গে সহবাস করে নিজেরাও পশু হয়ে গেছে। মনু মল্লিক নিম্নবর্গের শোষিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। মুজফফর মিঞার চোখ পড়ে মনু মল্লিকের সুন্দরী স্ত্রী জরিনার উপর। লোক দিয়ে তুলে আনে জরিনাকে এবং ধর্ষণ করে মুজফাফর মিয়া। মনু মল্লিককেও চর দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, মুজফফর তার লোক জন দিয়ে হত্যা করে লাশ লাঠি দিয়ে পানির নিচে পুঁতে রাখে।

জীবিত অবস্থায় মনু মল্লিক মুজফফর মিঞার অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চাইলে বয়োবৃদ্ধ একজন মাথা শান্ত রাখতে বলে। এই বৃদ্ধ তার জীবনাভিজ্ঞতায় যা বুঝেছে তা প্রকাশ করেছে এভাবে 'আমাগো মতো মানুষের পক্ষে কোনদিন কাজিয়ায় যোগ দিয়া কিছু লাভ হয় নাই। গরু গেছে, জরু গেছে, আমরা কেবল সব হারাইয়া ভাসতে ভাসতে এইখানে আসিয়া ঠেকছি। আমার তো এই ভবিতব্যটাই এই কপালের লিখন বলিয়া মনে কয়। জলে কুমীর আছে, ডাঙ্গায় আছে বাঘ, ঘরের খাটালের গর্তে আছে সাপ, জানোতো আছে সকলই, এই লইয়াই তো জীবন চলছে।' মনু মল্লিক এ কথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারে নি। ভাঁটির দেশের নিয়ম ভাঙতে চেয়েছিল সে। 'এইখানে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকলে আর কেউরই বাঁচতে হইবে না। প্রত্যেক দিনই তো যুদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

করিতে হইতে আছে। জঙ্গলের পশুও শাসন করা যায়। কিন্তু অত্যাচার সহ্য করিয়া যাওয়ার কেনো অর্থ নাই।' আর এ মনোভঙ্গিই তার আকাল মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে।

সমুদ্রবাসর উপন্যাসের নানা কাহিনীর মধ্যে ইউসুফ সুজার পুত্র সুজাত আলী ও করিমনের প্রেমের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে। দু'জনের ভালোবাসা ব্যর্থ হয় ভাগ্যের পরিহাসে। করিমনের বিয়ে হয় অসমর্থ পঙ্গু মিকুর সাথে। হঠাৎ একদিন সুজাত আলী সমুদ্রের ধারে অর্ধমৃত অজ্ঞান এক মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় করিমনের বাড়িতে। সুস্থ হয় সোনা নামক মেয়েটি। মেয়েটির পরামর্শে শহরে না গিয়ে সুজাত আলী মুজফফর মিঞার কাছ থেকে চর ইজারা নিয়ে চাষাবাদের উপযোগী করে প্রাণপণ পরিশ্রম করে। এই কাজে তার সঙ্গী হয় সোনা। শ্বাপদসংকুল চরকে একটু একটু করে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তোলে সোনা, সুজাত আলী করিমন ও অন্যান্য করেকজনে মিলে। কিন্তু আকস্মিক সামুদ্রিক ঝড়-তুফানে সমস্ত এলোমেলো হয়ে যায়। সবাইকে হারিয়ে সুজাত আলী করিমনকে উদ্ধার করে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায়। দু'জনের ভালোবাসা পূর্ণতা পায় আকস্মিক ঝড়ের পর তীব্র আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ততক্ষণে আরেকটি ঝড়ের পূর্বাভাস, চর থেকে ফিরে আসার শেষ নৌকাটিও চলে যায় তাদের নাগালেয় বাইরে। 'সুজাত আলী করিমনের বাহুর ঘেবের মধ্যে টানিয়া সেই অবস্থা হইতে ব্যাকুলভাবে মুক্তির উপায় খুঁজিতে লাগিল।'

শামসুদ্দীন আবুল কালামের রাজনৈতিক সচেতনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর নাতিদীর্ঘ *নবান্ন* (১৯৮৭) উপন্যাসে। এ ছাড়াও উপন্যাসে নিম্নবর্গের সংখ্যালঘু ও সম্পদায়ের নানা অজানা বিষয়ের প্রতি লেখক আলোকপাত করেছেন। পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও জীবনবাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে। বিভাগোত্তর কাল, নতুন দুটি রাষ্ট্রের জন্মবৃত্তান্ত, একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর দেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার কথা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের নানা মাত্রা শামসুদ্দীন আবুল কালাম *নবান্ন* তে নিপুণ দক্ষতার সাথে উপস্থাপিত করেছেন। লেখক তাঁর *নবান্ন* উপন্যাসের প্রারম্ভিকায় হাসান হাফিজুর রহমানের একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন –

'যখন হৃদয়ের আগুন নিভে আসে
সমস্ত কিছুই নুয়ে পড়ে যেন অধোমুখি লতা,
সূর্যের ডাকে জাগে না সাড়া
চন্দ্রতাপে না শিহরণ,

Dhaka University Institutional Repository

এমন কি বৈশাখের মাতাল ঝড়েও
দোলে না শরীর, না প্রতিবাদে, না উল্লাসে
যেমন হয়ে থাকে উদ্ধত পল্লব।

একদা যে-লোক
জোছনার নিবিড়ে
হরিণের একসাথে করতে চেয়েছে স্বপ্নাকুল জলপান
বাঘের ডোরাকাটা ছায়ায় ব'সে
মেতেছে অসম বিশ্রম্ভালাপে
সে কেন,
ঘর ঘর নারী নারী বন্ধু বন্ধু
বলে অবিরাম চিৎকার অকস্মাৎ রুদ্ধ করে
একেবারে চলে যেতে চায় স্মৃতির পরপারে,
যদিও শিকড় তার ছেঁড়েনি মোটেও !

হাসান হাফিজুর রহমান

প্রবাসে থেকেও শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মৃতির পরপারে চলে যান নি কখনোই বরং এদেশের মাটির সঙ্গে তাঁর শিকড় প্রোথিত ছিল। আর মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর গাঢ় সম্পর্কের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে *নবান্ন* উপন্যাসে।

দয়াল চৌকিদারের দুই ছেলে মজিদ ও মালেক। মজিদ শহরে বউ-ছেলে মেয়ে নিয়ে জীবন-যুদ্ধে পর্যুদস্ত। মালেক দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজ জীবনকে উৎসর্গ করেছে। আকস্মিকভাবে গ্রামে মালেক বাবার কাছে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে আসে স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ করে। দেশ স্বাধীন হয়। মালেক জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয় নতুন উদ্যমে। জমিতে ফসল ফলানোর কাজে নিয়োজিত হয়। পিতা, পুত্রের কাজে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। এর মধ্যে হঠাৎ বড় ছেলে মজিদ সাদা দলিলে পিতার সই নেয়ার জন্য গ্রামে উপস্থিত হয়। পিতা রাজি না হওয়ায় পুত্র পিতার চেয়ারে লাথি মারে। চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে আর দয়াল উঠতে পারে না, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি। *নবান্ন* উপন্যাসের এই ঘটমাক্রমের মাধ্যমে শামসুদ্দীন আবুল কালাম নগরসভ্যতা ও গ্রামীণ জীবনের বিপ্রতীপ অবস্থানকে স্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন। উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্রই দয়াল

Dhaka University Institutional Repository

চৌকিদার, মজিদ, মালেক – গ্রামীণ নিম্নবর্গের লড়াইরত মানুষের প্রতিনিধি এবং নৈঃসঙ্গ্যতাড়িত ও 'আইডেনটিটি' সন্ধানে লিপ্ত।

ইংরেজ ও জার্মান যুদ্ধের ঢেউ আছড়ে পড়েছিলো ভারতবর্ষেও। এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনেও যুদ্ধের কুপ্রভাব নানাভাবে বিস্তৃত হয়েছিল – 'এমন সময় গাঙে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো কেবল বৈদেশের ব্যাপারীদের নৌকা। কেবল গাঙে? এইসব খাল ধরে তারা উপস্থিত হতে শুরু করলো অন্দরের হাট বাজারেও। যুদ্ধের জন্য রসদ চাই, চাল চাই, ডাল চাই, – সবকিছুর উপরেই হাত দিতে শুরু করলো তারা।' পৃ.১২

অথচ এই গ্রাম, এই রূপার ঝোরের মানুষের অভাব-অনটন ছিল না একসময়, মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য-প্রীতিরও অন্ত ছিল না। কিছু লেখাপড়া শিখে মালেক বর্তমান গ্রামের শ্রীহীন অবস্থা দেখে বারংবার প্রশ্ন তুলেছে কেন গ্রামের নাম এত সুন্দর অথচ বাস্তবে কোনো মিলই নেই। 'কোথায় শ্রী, যার জন্য এর নাম হয়েছিলো রূপের কিংবা রূপার ঝোর? এই দেশ যদি বাস্তবিকই একদিন মানুষের মন ভুলিয়ে না থাকবে তাহলে কেনই বা পরিচিত হয়েছে এত সুন্দর নামে?' পৃ.৩৭

নিম্নবর্গের সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে দয়াল চৌকিদারের বিয়ের কাহিনীর মধ্য দিয়ে। দয়ালের স্ত্রী মোসলেমা অন্য জাতের মেয়ে। এই মোসলেমা যার আসল নাম পূণ্যশশী বা পূর্ণশশী, দয়াল চৌকিদারের বাবা ও তার নায়েব এক রকম জোর করে অন্য গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছিলো। পূণ্যশশীর বাপ বিজয়রত্ন, পেশায় কাঠমিস্ত্রী এ বিয়ে কোনওদিনই মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। একদিন বিজয়রত্ন ও তার পুত্র নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ক্ষোভ, অপমান ও মনের চাপা কষ্ট নিয়ে। চতুর্থ কন্যা সন্তানটি জন্ম দিয়ে মারা যায় পূণ্যশশী। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ না করে দয়াল বহু কষ্টে-সৃষ্টে সন্তানদের বড়ো করেছে। এক্ষেত্রে তার শৈশবের সাথী জমিলার সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছে সর্বাধিক।

রূপার ঝোর গ্রামে 'জমিলার স্বামী কামলার কাজ করতে এসেছিলো'। এ অঞ্চলের মানুষের পেশা হচ্ছে কামলা, বর্গাদার, নৌকার মাঝি কিংবা লাঠিয়াল হওয়া। ভূমিহীন বা ভূমিচ্যুত মানুষগুলো সমাজের নিম্নস্থ অবস্থানে থেকে এ সব কাজ করেই কোনওরকমে দিনাতিপাত করে। নিজের জমি নেই, তাই অন্যের জমি চাষ করে বাধ্য হয়ে। কিন্তু নিজ হাতে জমি আবাদের স্বপ্ন বুকের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

লালন করতে বাধা কোথায়, – 'আপন হাতে আবাদ করা জমি বিয়ে করে আনা নিজের বৌ-এর মতো। অন্যের জমি চাষ করতে গিয়ে মনে হবে কোনও বিধবাকে নিয়ে ঘর করছি।' পৃ. ২৪

গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ধাবমান মানুষের স্রোত লেখকের ভালো লাগে নি। এভাবে মাটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়ায় দয়াল চৌকিদারের দুই ছেলেও যুক্ত হয়েছে। তাই দয়ালের বলার ভঙ্গির মধ্যে আমরা শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের মনের দুঃখের কথাই শুনতে পাই; 'আসলে ওদের এলেম-তালেম দেবার ইচ্ছাটাই আমার বড় ভুল হয়েছে। তা না হলে নিজের ভিটে-মাটি ছেড়ে এভাবে কেউ দূরে চলে যেতে পারে? .....মেয়েরা ? তারাও শুনছি শহরে গিয়ে উঠছি উঠবো করছে।' পৃ.২৫

এদেশের জনসংখ্যা যত বাড়ছে নিম্নবর্গের মানুষের অভাব-অনটন তত প্রকট হচ্ছে। কেননা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বড় অংশই নিম্নবর্গের। ফলে সামাজিক অপরাধের মাত্রাও বাড়ছে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এরা ক্রমশ অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ছে। 'জমিজমাহীন মানুষ যেভাবে বাড়ছে তাতে মাঝে মাঝে ভয় হয়। সাধে কি আর চুরি-ডাকাতির আপদ-বিপদ লেগেই আছে ? আমার তো মধ্যে মধ্যে মনে হয় ওরাই এক সময় ক্ষুধার পাগল হয়ে যার যা কিছু আছে তাই কেড়ে কুড়ে না নেয়।' পৃ. ২৫ আবার কখনও কখনও নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিচ্ছিন্নতার কারণে জমিগুলোকে টুকরো করে এর উর্বরতা হ্রাস করে। ফলে ফলন অনেক কমে যায়। দয়ালের তাই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা- 'দেখাও দেখি আমাকে কোন বাড়িতে বারো ভাই তেরো আইল তুলে নিজেরাই নিজেদের দুর্দশা ডেকে আনেনি?' পৃ. ৩৩

গ্রামীণ নিম্নবর্গের মানুষের জীবনকে তছনছ করে দেয় মহাজনশ্রেণীর অন্যায়-অত্যাচার ও অবিচার। এদের অমানুষিক কষ্টে উপার্জিত অর্থ নিয়ে মহাজনরা আমোদ-প্রমোদে মত্ত হন শহরে বসে। 'আমাদের গায়ের রক্ত পানি করে মহাজনদের হাতে তুলে দেই, আর তিনিরা সর বালাখানার মৌজে থাকেন।' পৃ. ৩১

গ্রামীণ নিম্নবর্গের কষ্টের কারণটি মুজাফফরের মন্তব্যে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে – 'পেটে, দেবার মতো দানা নেই , তবু বিয়ে-শাদী আর বাচ্চা বিয়োবার তো কমতি হচ্ছে না।' পৃ. ২৬ আবার

Dhaka University Institutional Repository

শহরের মানুষ ও মধ্যশ্রেণীর সচ্ছল মানুষদের অনুকরণে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনেও কিছু বাজে প্রথা প্রবেশ করেছে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যৌতুক প্রথা। 'মেয়ের যখন বিয়ে দিলাম জামাই তরফের প্রথম ফর্দই ছিলো টানজিস্টার আর কোট-প্যান্টের। যখন বলা হলো কোট-প্যান্ট দিয়ে কী হবে, পাঞ্জাবি পাজামা দিলেই হয় না, তাতে বিয়ে তক্ষুণি প্রায় ভেঙ্গে যায় যায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখে আসি, সেই কোট-প্যান্ট তার চৌদ্দ পুরুষের হাল-হালুটির কোন কাজে লাগছে।' পৃ. ২৬

নিম্নবর্গের মানুষেরা অন্যের অধীন থাকতে চায় স্বভাব-দোষে। অসচেতন এই জনগোষ্ঠী নিজের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনে। স্বাধীনতা ও স্বদেশ-প্রেম বিষয়ে ধারণাহীন এই জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে ডেকে জানে উপনিবেশরূপী মহাজনদের যারা কেবল নিতে জানে। 'আমাদের নিজেদের শত্রু আমরা নিজেরাই।' -আপন মনেই গজ গজ করে দয়াল চৌকিদার : 'কিছু দিতে নয়, কেবল দিতে আসার গরজেই ঐ মহাজনরা এইসব ঘাটে এসে ডিঙ্গি বাঁধেন। ' পৃ. ৩৪

দয়াল চৌকিদারের বড় ছেলে মজিদ শহরে চলে গেছে বৃদ্ধ বাবাকে গ্রামে ফেলে। গ্রাম-বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরে গিয়ে জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে 'আইডেনটিটি' সমস্যা তো আছেই। আর তাই 'শহরে যাবার পর এফিডেভিট করে নাম বদলেছে মজিদ। নতুন নাম নিয়েছে আবদুল মজিদ কোরাইশী। নিজের ছেলের নামও রেখেছে সৈয়দ আলী কোরাইশী। ' পৃ. ৫২ পরে গ্রামে এসে বাবার কাছ থেকে দলিলে সই নিতে ব্যর্থ হয়ে রাগে-ক্রোধে বাবাকে চেয়ারশুদ্ধ লাথি মেরে ফেলে দিয়ে পিতৃ-হন্তারক হয় সে।

মজিদের ছোট ভাই লেখাপড়ায় তার চেয়ে অনেক ভালো, 'দেশ ও দশের ভালাইর জন্য' উতলা হয়ে উঠেছিলো। রাজনীতিতে যুক্ত হয় মালেক, পরে জেলও খেটেছে। মুক্তি পেয়ে যোগ দেয় স্বাধীনতার যুদ্ধে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র এই মালেক যার মধ্য দিয়ে লেখক নিজ স্বপ্নপূরণের কথা ব্যক্ত করেছেন। ছেলেবেলায় মালেক 'প্রতিটি ভাতের কণা মুখে দেবার সময় মা-এর কাছ থেকে শিখেছে জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ।' শামসুদদীন আবুল কালাম মালেক চরিত্র নির্মাণ করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। 'এই দেশের মাটি, তার ধূলিকণা, তার রোগ-ব্যাধি, সৌন্দর্য কিংবা দুঃখ দারিদ্র্য- সব কিছুই পুষ্ট করেছে তার দেহ মন বোধ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা । কিন্তু এক সময় মনে হয়েছে কেবল নিজে ধাপের পর ধাপ পরীক্ষায় পাশ করে যে অবস্থা-ব্যবস্থার মধ্যেও তাকেও নিমজ্জিত হতে হবে তাতে তার একারও শান্তি হবে না, আর দশেরও

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গল নেই। যে ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ অসহায়ভাবে ক্রমাগত লড়াই করে চলেছে তার ভিতে পাপ আছে, ত্রুটি আছে, আছে হাজার বছর ধরে টিকিয়ে রাখা ঔদাসীন্যও। ধাপে ধাপে তা থেকে নিজেকে এবং সবাইকে মুক্ত করার সংকল্প একদিন তাকে গভীরভাবে পেয়ে বসেছে।' পৃ. ৪১

ইতোমধ্যে দেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধ সংগ্রাম। সর্বস্তরের মানুষ যোগ দেয় সে সংগ্রামে। মালেকও যোগ দেয় তাতে। কিন্তু দেশের অভাবী, অনাহারী, রোগে-শোকে জর্জরিত অসহায় মানুষের কথা কেবলই তার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যুদ্ধের সময় এই সকল মানুষের গৃহে গৃহে বিনিদ্র রজনী যাপনের সময় মালেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে – 'সত্যি সত্যি কার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ? বিদেশী অত্যাচারীদের তাড়িয়ে দিতে পারলেই কি সব দুঃখের অবসান হবে? ' পৃ. ৪২

যুদ্ধের পর কোনও রকমে শহরে পৌঁছে আরেক জগতের সন্ধান পেল মালেক। 'সেখানে গিয়ে দেখে হরে দরে সব এক। চতুর্দিকে বাড়ি দখল, চাকরি দখল, কারখানা কি ব্যবসা দখলের হিড়িক। সেই লুটপাটের ভিড়ের মধ্যে নিজের এক কালের সঙ্গী সাথীদেরও চিনতে কষ্ট হয়েছে: কে কার কথা শোনে! এক ধরনের উন্মাদনার মধ্যে দল, বল, নেতৃত্ব নিয়েও অজস্র দাবিদারের কোন্দল শুরু হয়ে গেছে।' সেই কোন্দলে যোগ দেয়নি মালেক। লজ্জায় নিজের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ও জাহির করেনি মালেক। 'ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল ছিড়ে নতুন নতুন রাষ্ট্র জন্মের পর তাকে আতুড় ঘরের নুন খাইয়ে মারার ষড়যন্ত্রজালে অসহায় মানুষের' পাশে দাঁড়াবার চোয়ালবদ্ধ সংকল্প নিয়েছে মালেক। আর তাই নিজের মাটির কাছে ফিরে এসেছে। কেননা যদি কিছু গড়তে হয় তাহলে ইমারতের মতো তলা থেকেই গড়ে তুলতে হবে।' দীর্ঘদিন পর পিতা-পুত্রের মিলন। নতুন করে চাষাবাদ পদ্ধতি অবিষ্কার করে তারা দু'জনে মিলে। মালেকের বড় ভাই মজিদ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছে শহরে গিয়ে, কিন্তু মালেকের বিশ্বাস ছিল নবান্নের উৎসব আনন্দে সে গ্রামে আসবেই। তাই সে পিতাকে বলেছে; 'আমাদের নোতুন নবান্নের উৎসব আনন্দ থেকে সেও দূরে থাকতে পারবে না।' কিন্তু মালেকের সে উৎসব আর করা হয় নি। মজিদ এসেছে তবে উৎসবে যোগ দিতে নয়, জমির দলিলে পিতার স্বাক্ষরের জন্য। আর পিতা রাজি না হওয়ায় তার হাতে অপমৃত্যু হয়। মুক্ত স্বাধীন দেশে নবান্নের স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেল দয়াল চৌকিদার ও পুত্র মালেকের। স্বপ্নভঙ্গের বেদনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্দীন আবুল কালাম দীর্ঘ সময় ধরে বৃহৎ কলেবরে রচনা (৫৮৩ পৃ:) করেছেন *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসখানি যা তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রাধান্য পেয়েছে। লেখকের নিজস্ব দর্শন যুক্ত হয়ে উপন্যাসটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে বৃহৎ কলেবরে রচিত উপন্যাস *কাঞ্চনগ্রাম* ই প্রথম নয়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে আবু জাফর শামসুদ্দীন এর *পদ্মা-মেঘনা-যমুনা* বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এর *খোয়াবনামা* আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এর *প্রথম আলো*-র কথা। নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর মানুষের জীবন রূপায়ণের পাশাপাশি শামসুদ্দীন আবুল কালাম *কাঞ্চনগ্রামে* সমাজ-অর্থনীতি, রাজনীতি ও দর্শনকে যুক্ত করে বাংলাদেশ ও দেশের গোটা মানব জীবন ব্যবস্থাপনার স্বরূপ সন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন। উপন্যাসে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে 'উৎপাদন ও ভোগ-ব্যবস্থার মধ্যে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা'র কথা। আর এ কারণেই এদেশের নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর মানুষের জীবনের করুণ অবস্থা যা শামসুদ্দীন আবুল কালামকে বিচলিত করেছে। উপন্যাসের ভূগোল *কাঞ্চনগ্রামে* সীমাবদ্ধ হলেও সেখানকার ইতিহাস-ঐতিহ্য-সমাজ-নৃতত্ত্ব দীর্ঘ সময়কালকে ধারণ করেছে। *কাঞ্চনগ্রামের* মূল কাহিনীতে যুক্ত হয়েছে মুক্তিসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত, আর এ যুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী নেতৃবৃন্দের কথা। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক থেকে শুরু করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথাও বর্ণিত হয়েছে পর্যায়ক্রমে এ উপন্যাসে। বাদ পড়েনি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্যাতন-নিপীড়নের কথা আর সে সময়কার আতঙ্ক-দ্বিধা-সংকট-বিভীষিকার রাত্রি-দিনের কথা। যুদ্ধের ঢেউ শহর ও গ্রামের মানুষের জীবনকে কিরূপে আন্দোলিত-আলোড়িত করেছিল শামসুদ্দীন আবুল কালাম সে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। শহর ছেড়ে পালিয়ে গ্রামে আশ্রয়গ্রহণ, গ্রামে বসবাসকারী মানুষের প্রতি মুহূর্তের উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। আবার সর্বসাধারণের প্রতিরোধ সংগ্রামে যুক্ত হবার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে শামসুদ্দীন আবুল কালাম *কাঞ্চনগ্রামে* উপস্থাপন করেছেন।

কাঞ্চনগ্রাম আবহমান গ্রামীণ সমাজ অবকাঠামোর একটি প্রতীক মাত্র। কিন্তু এ সমাজ ব্যবস্থাপনা, তার নিয়ন্ত্রণ, বিনির্মাণ, বিবর্তন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপন্যাসটিতে পরিশীলিত ও পরোক্ষ ভাবনা থেকে বিধৃত। নদীমাতৃক ফুলে ফলে ভরা আমাদের এই দেশ শ্যামল ছায়া ঘেরা। এটি একই সূত্রে একই ছন্দে আবদ্ধ হয়ে আছে আবহমান কাল ধরে। এই সব কিছু মিলেই এই *কাঞ্চনগ্রাম*। এই গ্রামের বর্ণনায় লেখক বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

"যেমন বাবুই পাখির বাসা দোলে কোনও কোনও গাছের ডালে অনেকগুলি একই ধারে, যেন সেই মতই গড়িয়া উঠিয়াছিল এক পাশের কাঞ্চনগ্রাম, মূল সড়কের একধারে বিল আর অন্যদিকে নদীকে ঠেকাইয়া। গ্রাম হইতে সড়কটাকে যেমন আন্দাজ করা যায় না, আবার সড়কের দিক হইতেও তার অবস্থান আকৃতি নির্ণয়ও কঠিন। পুঞ্জ পুঞ্জ বাড়ীঘর যেন মুখ থুবড়াইয়া রহিয়াছে জলাভূমির মধ্যে, এক হতে অন্যে বিচ্ছিন্ন। নানারকম গাছ-গাছালির আড়ালে আবডালে কেবল কোথাও কোনও ধোঁয়া অথবা কাকপাখির গতিবিধি দেখিয়া কি কলরব শুনিয়া আন্দাজ করা যায়, কোনখানে বসতি আছে অথবা কি ঘটিতেছে।" পৃ: ৮০

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র জালাল মিঞা *কাঞ্চনগ্রামের* সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাকে ঘিরে অন্যান্য চরিত্র আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসে। আবদুল মাস্টার, হেদায়েতউল্লাহ, জনার্দন কর্মকার উপন্যাসের কাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী চরিত্র। পরিপ্রেক্ষিতের চরিত্রগুলোর মধ্যে জয়নাল শেখ, মকবুল, জনার্দন, আজমত উল্লাহ, আব্দুল আলী, আজাহার, আফজাল মুন্সী, আকবর আলী, ইসহাক, ইকবাল, নসু উল্লেখযোগ্য। মধ্যবর্তী ও পরিপ্রেক্ষিতের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে আয়েশা, আনজু, কদভানু, কুলসুম, চম্পা, রূপা, রোকেয়ার পরিচয় মেলে উপন্যাসে। উপন্যাসে নির্মিত চরিত্রগুলো সকলেই গ্রামীণ ও নাগরিক নিম্নবর্গের অন্তর্গত। 'উপক্রমণিকা' অংশে লেখক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের ইঙ্গিতময় বিবরণ প্রদান করেন। নিম্নবর্গের জীবন-রূপায়ণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে লেখকের বর্ণনায়:

'এমন কি দুঃখ-দারিদ্র্য। দৈন্য-দুর্ভোগও যেন এই অবিচ্ছিন্ন জীবনধারার অঙ্গ, মানুষ ব্যস্ত প্রতিনিয়ত সংগ্রামে, জীবিকার যুদ্ধে, আর কোনও অজ্ঞাত পরম শক্তি যেন তাহার দুর্জ্ঞেয় লীলাখেলা লইয়া মত্ত কোথাও থাকিয়া।'

'উপক্রমণিকা' অংশটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিঃসন্দেহে; এরপর 'অবতরণিকা', 'প্রথম অন্তরা', 'দ্বিতীয় অন্তরা', 'স্বতঃশীলা', 'অববাহিকা', 'ক্রমান্তরা', 'স্বয়ংবরা', 'মাধ্যমিকা', 'ধারা-উপধারা', 'উপলব্যথিতা', 'নিশীথ গম্ভীরা', 'গোপনাভিসার', 'পরম্পরা', 'দিক পরিক্রমা', 'অন্তঃশীলা',

'জীবন বন্যা', 'কূল-উপকূল', 'তরঙ্গভঙ্গ', 'বায়বাতাস', 'উদারা', 'বেপথু ব্যাকুলা', 'উপসংহার' অংশে বিভক্ত উপন্যাসে কাহিনীর ক্রমবিকাশ, পরিবর্তন ও প্রসার ঘটেছে। অংশ-বিভাজনে শিরোনামগুলো যেন কাহিনীর ইঙ্গিতময়তাকে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে তুলেছে। আর এ ইঙ্গিতময়তায় সময়ের আবহ নির্মিত হয়। ঘটনার আবর্তন চলে মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে। যুদ্ধের প্রভাব, উন্মাদনা, আতঙ্ক ও উত্তেজনা কাহিনীর অন্যতম প্রতিপাদ্য। প্রতিনিয়ত ইতিহাস রচনার এ কালকে ঘিরে সমাজের নানা শ্রেণী, পেশার মানুষের রূপায়ণ চলতে থাকে *কাঞ্চনগ্রামে* স্মৃতি ও শ্রুতির

Dhaka University Institutional Repository

দর্শনে। ইতিহাসে এবং রাজনীতির নিরিখে। *কাঞ্চনগ্রামের* বর্ণনা আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি। পরে লেখক এ গ্রামের এরো স্পষ্ট রূপায়ণ করেছেন এরকমভাবে:

'গাঙের দিক হইতে কাঞ্চনগ্রামের দিকটা অন্যরকম। ভাঙা-ভাঙা খাড়া পাড়-এর উপর তালতাল নীল নীল গাছপালা যেন মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া আছে এইদিকে-সেইদিকে। একধারে সেই খড়ের ঘরগুলি যেইদিকে, তাহার পরে পরেই জলাভূমি যেন চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। তাহারও অন্যপাড়ে কয়েক ঘর বসতি।'

অতঃপর *কাঞ্চনগ্রামে* বসবাসরত নিম্নবর্গের জীবন ও জীবিকার প্রসঙ্গ চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে – 'ইছু নসু দুই ভাইর ঘর- গৃহস্থালি। সামান্য জমিজমা, তবে এখন তাহাদের প্রধান পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে মাটি কাটিয়া দূর দূর এমন কি রাজধানী শহরের বিভিন্ন ঘাটেও লইয়া যাওয়া। সেইখানে সব জলাভূমি এবং খানা-খন্দ-ভরিয়া-ভরাইয়া নূতন নূতন ও বিরাট বিরাট দালান-কোঠা উঠিতেছিল। ইছু-নসুর নৌকা এমনই বোঝাই থাকে যে মনে হয় সামান্য একটু তুফান দেখা দিলেও হয়ত ভূশৎ করিয়া তলাইয়া যাইবে।'পৃ. ১৩৭ ইছু-নসুর মতো *কাঞ্চনগ্রামে* নিম্নবর্গের আরো যারা বেঁচে আছে তাদের জীবন ব্যবস্থাপনা জটিল। প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেই তারা বেঁচে থাকে। ক্ষুদ্র একটি গ্রাম, গ্রামের মাত্র গুটিকতক ভূমিসংলগ্ন মানুষ অন্নজলে বেঁচে আছে। একমাত্র গ্রামকে ভালোবেসে এ গ্রামে যুদ্ধ চলুক, তাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হোক- কিংবা অনাহুত অপরিচিত কেউ এসে এর পরিবেশ নষ্ট করুক তা কেউ চায় না। গ্রামীণ নিম্নবর্গের সংগ্রামশীল মানুষগুলো নিরূপদ্রব জীবন-যাপন করতে চায় সর্বান্তকরণে।

জালাল মিঞা এ গ্রামের প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তির মানুষ নন। কিন্তু প্রবল এক ব্যক্তিত্বে উজ্জীবিত মানুষ। *কাঞ্চনগ্রামের* প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন তিনি। লেখক এ চরিত্র উত্থাপনে বলেছেন:

'কোনও কিছুকে শাশ্বত মনে না করিবার চিত্ত-চারিত্র্য হয়ত জালাল মিঞাও পাইত যদি না অকস্মাৎ নিজেকে অন্য একরূপে আবিস্কৃত না দেখিত। জীবন তাহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করাইয়া উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল তাহাকেও, আবার সেই জীবনই তাহার হতশ্রী গৃহ-সংসারকে রূপে-সৌষ্ঠবে ভরিয়া তুলিতেছিল। কোনও বড় আকাঙ্ক্ষা সে করে নাই, প্রত্যাশাও করে নাই, নিজেকে প্রার্থী করিয়া কেনা ও সুখ সমৃদ্ধি যাত্রা করে নাই কাহারও কাছে, অথচ উদাসীনও হইতে চাহিতেছিল না। গাঙ্গই হউক, প্রকৃতি হউক অথবা কাল-ই হউক, কাহারও সম্মুখে নিজ যোদ্ধৃবেশ ত্যাগ করিয়া কোনও সন্ন্যাসের আগ্রহ তাহার ছিল না।'

কাঞ্চনগ্রামের ইতিহাস নিয়ে জালাল মিঞা ও আব্দুল মাস্টারের আলোচনায় উঠে আসে নানা অজানা তথ্য। জালাল মিঞা হাতের লাঠিখানা কাঞ্চনগ্রামের দিকে নির্দেশ করে বলে; 'এই রকম ছন্নছাড়া, সৃষ্টিছাড়া দশা হয়। আমার তো মনে কয় আপন ভুঁইমাটি, আপন কাদামাটি পানির সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

কোনও কিছুই ঠিকমতো গড়িয়া তোলন যায় না।' তৎকালীন উপনিবেশের মধ্যে শৃঙ্খলিত *কাঞ্চনগ্রাম* ও এর অধিবাসীদের জীবনের করুণ রূপ প্রকাশিত হয়েছে জালাল মিঞার প্রতীকী ভাবনায়:

'মনে কয় আমি যেন কোন এক মুল্লুকে একটা মৌমাছির বাসার লাহান কোনও একটা রাজ্যে ঢুকিয়া পড়ছি। রাণী মৌমাছির আসল-আদত চেহারাটা দেখছো কখনও? হ, সেই রকমই একটা আজব আর বিশাল দানবের লাহান জীব গড়াইয়া-ছড়াইয়া আছে। রাজ্য জুড়িয়া, আর দেশ-বিদেশের সকল জাতের সকল মানুষ, হ, সকল জাতের সকল ধরনের মানুষ, জানোই তো এক ধরনের মৌমাছির কোনও জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাও নাই, তারাও সেই সকলে সেই রাণীর সেবায় ব্যস্ত। রাণী তার খেলায় খায়েশে বিরাট শরীর লইয়া একটু সুখ-অসুখের মোড়ামুড়ি দিলেও রাজ্য-জোড়া সকল মৌমাছি আরও দশ-বিশগুণ ব্যস্ত হইয়া পড়ে। দেশের সমস্ত মানুষ যেন ঐরকম কোনও মৌমাছির রাণীর চতুর্দিকে বেহুঁশের লাহান ছুটোছুটি করতে আছে। যেন কোনও মন্দিরের বিকট মূর্তির সামনে নানান রকম উচ্ছবে আচ্ছন্ন। খাদ্য, পানীয়, ফূর্তি-ফার্তি-কোন কিছুরই অভাব নাই। কার সাধ্য আছে তারগো ভনভনানিতে বাধা দেয়।'

উপনিবেশের জালে আটকে পড়া *কাঞ্চনগ্রামের* নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর মানুষগুলোর কোন মুক্তি নেই। কোন দিক থেকে তাদের জন্য কোন আশার বাণী নেই। কেবলই হতাশা ও অন্ধকার। প্রৌঢ় ত্রিদিবের উক্তিতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্য বানানোর নেশায় পিষ্ট হয়ে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর করুণ আর্তি প্রকাশ পেয়েছে;

'আর তার উপর ভিত বানাইয়া কেউর কেউর রাজ্য-সাম্রাজ্য বানানেরও সুযোগ হইছে। আমরাও যতক্ষণ পারছি টিকিয়া থাকনের চেষ্টা করছি: যখন পারি নাই আর, আরও গভীরে, পাহাড়ে-পর্বতে কি ঘন বনে জঙ্গলে গিয়া ঠাঁই লইছি। আমরা আক্ষেপ-বিক্ষোভ কিংবা সাধারণ কান্দা-কাটাতেও যেন ভয় পাইছি। তাড়নায়-তাড়নায় অত্যাচারের পর অত্যাচারে আমাগো রুখিয়া দাঁড়ানোর কোন সুযোগ-শক্তি হয় নাই। যে রক্ষক হইতে চাইছে, সে-ই আবার ভক্ষক হইয়া সম্মুখে খাড়াইছে।'

ফলে কাঞ্চনগ্রামের মতো এদেশের গ্রামগুলোর হাল দিন দিন আরো শোচনীয় হয়েছে। জালাল মিঞার ভাবনায় 'গ্রাম উপেক্ষিত কেন' প্রসঙ্গটি বারবার উঠে এসেছে। গ্রামের সাধারণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর মানুষগুলো শত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তবুও তাদের কোন উন্নতি নাই, উন্নতি নাই গ্রামের। মধ্যস্বত্বভোগীরা গ্রাম ও গ্রামের মানুষদের সৌভাগ্য অনেকটাই কেড়ে নেয়। জালাল মিঞার কৈশোর ও যৌবনের স্বপ্নস্মৃতিতে ধরা দেয়- পেশাজীবীর পেশার পরিবর্তন, ধর্ম-বর্ন-জাতভেদে সমাজ-মর্যাদা মূল্যায়ন এবং প্রভাবশালীদের প্রক্রিয়ার প্রকৃতিতে। সমাজে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। সংগ্রামই নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনচরিত। এককালের 'বাদিয়ার বাজার' পরিণত হয় বৈদ্যের বাজারে, মহামারি ও বিপর্যয়ে গ্রাম বদলে যায়; কৃষক-চাষী, চণ্ডাল-নমঃশূদ্র, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিদের জীবন-যাপন এক

Dhaka University Institutional Repository

রকম থাকে না। ত্রিদিবের তাঁতির ব্যবসা, জাল-জেলে-নৌকার মানুষেরা নীরবে আত্মসমর্পন করে। প্রভাব প্রতিক্রিয়া ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দাপটের সঙ্গে ভয়ার্তরূপে আসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তাই নিম্নবর্গের মনোভাবনা উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে এভাবে: 'এখন অধিক শোকে পাথরের লাহান হইয়া আছি।' উপন্যাসে বর্ণিত নানা উপ-কাহিনীর সঙ্গে "বেপথু ব্যাকুলা" সংঙ্গে এসে মুক্তিযুদ্ধের একটা চূড়ান্ত পরিণতির পর্ব যোগ হয়ে উপন্যাসটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। তবে এ উপন্যাসে শামসুদ্দীন আবুল কালাম মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিরোধ যুদ্ধ ও জনযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন, যেখানে এদেশের সকলেই কোনও না কোনোভাবে যোগ দিয়েছে।

কাঞ্চনগ্রামের কাহিনীর দু'টি প্রধান ধারা। প্রথমটিতে কাঞ্চনগ্রামের নানা ইতিহাস বর্ণন, গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবনের টুকরো টুকরো ছবির সুস্পষ্ট রূপায়ণ। নিম্নবর্গের ভূমিহীন পুঁজিহীন মানুষকেই চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক উপন্যাসের দীর্ঘ অংশ জুড়ে–'সেও একই রকমের ভূমিহীন পুঁজিহীন মানুষ, জীবিকার জন্য যে কাজটারে হাতের কাছে পাইছে, তা-ই লইয়া নামিয়া পড়ছে জীবন-যুদ্ধে'। এই নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক সনাতন কৃষি-ব্যবস্থা ও সমকালীন শাসন-ব্যবস্থার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন–

'সনাতন কৃষি-ব্যবস্থা, পণ্য-উৎপাদন, তার ভোগ-বণ্টন-ব্যবস্থা-দাস'- ব্যবসায়ের আওতামুক্ত হইতে পারে নাই। এক এক দল মানুষের নিছক আত্মস্বার্থের অভিযানে টলমল হইয়া উঠত দেশ মহাদেশ। আবিষ্কারের নামে ঔপনিবেশিকতা, অন্ত্যজ ব্যবস্থা, হইতে উদ্ধারের নামে নতুন রকমের শাসন-ব্যবস্থার কথা।'

দ্বিতীয় ধারায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ। এখানে মুক্তিযুদ্ধ নিছক একটি যুদ্ধ নয়; জালাল মিঞা ও আবদুল মাস্টারের স্মৃতি-কল্পনা ও শ্রুতিতে সাতচল্লিশ পূর্ব ও পরবর্তী বাস্তবতার মধ্য দিয়ে ছয়দফা, এগারো দফা, নির্বাচন ও শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে বিশদভাবে। চরিত্রগুলোর মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং শত্রুর কাছে পরাজিত না হবার প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে। ঐপন্যাসিকের বর্ণনা–

'কোনও আসন্ন ঝড়-তুফানের কালে গাঁ-গ্রাম যেইভাবে চঞ্চল হইয়া ওঠে, সেইরকমই একটা তৎপরতা এবং আশংকা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। যে মানুষ দুর্ধর্ষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামেও হার মানিতে চায় না, সে-ও কোনো অজ্ঞাত শত্রু কী হানাদারদের নিকট হার মানিতে প্রস্তুত ছিল না'।

কাঞ্চনগ্রামের শামসুদ্দীন আবুল কালাম মুক্তিসংগ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করেছেন বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন, শ্রুতি কল্পনা ও স্মৃতিচারণ এর মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করছি কিছু উদ্ধৃতি যা ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক পটভূমি তৈরির বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করবে আমাদের সামনে:

Dhaka University Institutional Repository

ক. এই মাস্টার সাইবও একদিন একটা বই খুলিয়া দেখাইছে ক্যাপ্টেন ক্লাইভ বছরে পঞ্চাশ টাকার চাকরি নিয়া এই দেশে আসে। আবার যাবার সময় নগদ পঁচিশ লক্ষ টাকা নিয়া যায়। এই মহাকারবার পরবর্তীকালেও কেউ সহজে ছাড়িয়া দিতে চায় নাই। যারাই বাধা দিতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেরও শেষ আছিলো না।'পৃ.২৮৩

খ. :হ,গোড়াতেই ঐ রকম পাকিস্তান বানানটাই একটা ভুল হইছিলো।পৃ. ৩৬০

গ. :শোনলাম যে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ডাক দিছে ঘরে ঘরে দুর্গ তৈয়ার করিয়া তুলতে। যার হাতে যা কিছু আছে তা লইয়া তৈয়ার হইতে। এই সব কথার পিছনে নিশ্চয় একটা অর্থ আছে।'পৃ.২৬৪

ঘ. গত কয়েক মাস ধরিয়াই রাজ্যে নানারকম হুলস্থুল লাগিয়াই আছে। তারপর, সেই বন্যার কাল হইতে, শেখ মুজিবুর রহমানের দল নির্বাচনে জেতার পর হইতেই রাজধানীতে সভা সমিতি মিটিং মিছিলের আর অন্ত নাই। শেখ মুজিবুরের দল ভারি, সে-ই যে দেশের প্রাইম মিনিস্টার হইবে সেইকথাও আর কোনও অন্য প্রমাণের অপেক্ষায় ছিল না। কিন্তু নানারকম টাল-বাহানা লাগাইয়া দিল পশ্চিমারা, ফলে ধীরে ধীরে সকল রকম ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল সকলেরই। এখন ছয়-দফার স্বায়ত্তশাসনের বিষয় না, একেবারের বজ্রকণ্ঠে দাবি উঠিয়াছে স্বাধীনতার, আর তার জন্য তৈয়ারও হইতে আছে মানুষ। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া পশ্চিমা নেতারা ঘোর সন্ত্রাসীদের মত ঝাঁপাইয়া পড়ছে দেশের উপর। পশ্চিমা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করিয়া আলাপ-আলোচনায় ইস্তফা দিয়া মিলিটারী আর তাহাদের কোলাবোরেটরদের উপরে ছাড়িয়া দিয়া গেলেন দেশটারে। সেই রাত্রিতে যেন বাঙ্গালি হত্যার যজ্ঞ শুরু হইল সারা শহরে, সমস্ত দেশে।পৃ.২৯৯-৩০০

ঙ. পাকিস্তানিরা এমন ঝাঁপাইয়া পড়ছে দেখিয়া দেশের সকল মানুষই কোনও না কোনওভাবে ফুঁসিয়া-কষিয়া উঠছে।'

চ. এবারের সংগ্রাম বাস্তবিকপক্ষে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম।'পৃ.২৬৪

এই দুই ধারায় বিশ্লেষাত্মক বর্ণনরীতিতে শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসখানি রচনা করেছেন। বৃহদায়তনের এ উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর কোনও একটি বিশেষ পরিবারের কথা বর্ণনা না করে তিনি সমগ্র মানুসের সুখ-দুঃখের কারণ ও তা হতে পরিত্রাণের উপায় খুঁজেছেন।এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক গ্রন্থের ভূমিকাতে নিজেই বলেছেন: বরং কোনও দূর বীর্ক্ষণে একটি কল্পিত জনপদ এবং তাহার মধ্যেও বাহিরে বিভিন্ন প্রকার জীবনান্দোলনকে অনুধাবনের অনুশীলনের প্রয়াস করিয়াছি মাত্র। এমন খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং সুর-স্বরকে যথোপযুক্তভাবে সাজাইয়া কোনও জীবন-সঙ্গীতে রূপদান হয়ত সমমর্মীদের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। 'আসল মূলে হাত'দেবার কথা উপন্যাসে বলা হয়েছে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর পক্ষ হতে-

আমরা মজুর মানুষ, গায়ে-গতরে যদ্দিন কুলায় খাটিয়া খাই। এইটাই কেবল বুঝি যে সবই যদি একই রকম খাওয়া-খাওয়ির পালাবদল হইবে, আসল মূলে কেউ হাত দিবে না, তা হইলে আমাদের উত্তেজিত হওনের কী আছে? পৃ.২৮০

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাই বার বার বলেছেন অর্থনৈতিক মুক্তির কথা যা ঘোচাতে পারে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর দুঃখ-যন্ত্রণা:

'এইবার এই কেবলমাত্র প্রথমবার সমস্ত দেশের মানুষ সবেমাত্র অনুভব করতে শুরু করছে অর্থনৈতিক মুক্তি রাজ-রাজ্যের গোড়ার কথা, কোনও আত্মনিয়ন্ত্রণ ও তা না হইলে আর সম্ভব হয় না।'

বিপ্রতীপ পরিবেশের কারণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরমুখী হয়েছে, কেউবা দেশান্তরী হয়েছে। কিন্তু এটা কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। ঔপন্যাসিক দৃঢ় চিত্তে বিশ্বাস করেন, আবার গ্রামেই আসতে হবে সবাইকে, কেননা এখানেই জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়। 'বুঝি গ্রামদেশে অনেক অসুবিধা আছে। কিন্তু আমার মনে কয় একদিন এইদিকেই আসতে হইবে সক্কলকে। এইটা উল্টাযাত্রা না। এইটাই সঠিক যাত্রা। নিজ মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ না ঘটলে জীবনের কোনও স্বাদই যেন পাওন যায় না।'

গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর মানুষের সংগ্রামের দলিল *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাস। বাংলাদেশের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল মহান মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণের দলিলও *কাঞ্চনগ্রাম* যেখানে ঐ সাধারণ মানুষের ভাবনা ও অংশগ্রহণের কথা বিধৃত হয়েছে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস কালোত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

২.

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন সাধু ও চলিত উভয় রীতির আশ্রয়ে। তাঁর *কাশবনের কন্যা, আলমনগরের উপকথা, জীবনকাব্য, জায়জঙ্গল, সমুদ্রবাসর, কাঞ্চনগ্রাম* প্রভৃতি উপন্যাসে সাধু ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়েছে। চলিতরীতিতে রচিত উপন্যাসগুলো হচ্ছে *সবাই যাকে করলো হেলা, যার সাথে যার, নবান্ন* প্রভৃতি। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে বিশেষত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন রূপায়িত হয়েছে। তাই বরিশাল অঞ্চলের উপভাষাও তিনি প্রাসঙ্গিকভাবেই ব্যবহার করেছেন। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে ঔপন্যাসিক *সমুদ্রবাসর* ও *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের ভূমিকায় স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন: 'আঞ্চলিক সাদৃশ্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রাচীন গদ্যরীতি ব্যবহৃত।' [ভূমিকা- *সমুদ্রবাসর*]

'প্রসঙ্গত আমার এই জাতীয় রচনায় ধ্রুপদী বাংলাভাষার সঙ্গে দেশের আঞ্চলিক ভাষার সমাহার ইঙ্গিতও ইচ্ছাকৃত; আপন জীবন-সত্তাকে খুঁজিয়া লইবার জন্য এই মাধ্যম অতি প্রয়েঅজনীয় মনে করিয়াছি; নিছক

Dhaka University Institutional Repository

'অনাধুনিক' বলিয়া শ্রেণীভুক্ত করা সময় সময় অত্যন্ত স্থূল অধিকার বলিয়া মনে হয়।' [ভূমিকা- *কাশবনের কন্যা*]

আলমনগরের উপকথা উপন্যাসে দূরগামী ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র রক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন ঔপন্যাসিক। এ উপন্যাসের গদ্যে কাব্যিকতা বর্জিত হয়েছে। কল্যাণ মিরবরের মতে, এ উপন্যাসে লেখকের ভাষা ওজস্বী ও সাবলীল। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী ব্যঞ্জনা ছাড়াই নিরেট বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন–

'আলমগীরের হিসাব ঠিক মিলিয়া যাইতেছিল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব আলমনগরের সর্বত্র স্বাভাবিক নিয়মেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সামন্ততন্ত্র পুঁজিবাদ-এর লোভের অভিযানে দুনিয়ার সাধারণ মানুষদের ঘর-পরিবার বুঝি ইহাদেরই মতো দুঃখের অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে।'পৃ.৭৫

উপভাষা ছাড়াই এ উপন্যাসে শামসুদ্দীন আবুল কালাম বেছে নিয়েছেন এক ধরনের কথ্যভঙ্গি, যা পুরোপুরি চলিত ভাষা নয়, আবার একেবারে কথ্যও নয়; এ দু'য়ের মাঝামাঝি। যেমন–

'বেশ। যা হয়েছে, হয়েছে। লাশটা রাতারাতি সরিয়ে ফেলো। রক্তের দাগটাগ কোথাও যেন না থাকে। আর সকাল হলে রটিয়ে দিও, দেশান্তরী হয়েছে।'পৃ.১০৯

কাশবনের কন্যা উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রনে এক ধ্রুপদী ভাষারীতি অনুসৃত হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদী-প্রধান গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। জীবিকান্বেষী সাধারণ মানুষের কর্মতৎপরতার নানা চিত্র এ উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারীর উপর নির্যাতনের দৃশ্য কয়েকটি বাক্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসে এভাবে –

আসগরের লাথি আসিয়া পড়াতে বাক্য আর শেষ হইল না; কাঁধের উপর সেই লাথি আসিয়া লাগিতেই মনে হইল, তাহার শরীরের আধখানা বুঝি ভাঙিয়া গেল- দম বন্ধ হইয়া গেল। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসায়, অবস্থাটা সামলাইয়া দৃষ্টি মেলিতে সবকিছু চক্ষুর পানিতে ঝাপসা হইয়া গেল। আর কোনো কথা কইল না জোবেদা- সমস্ত অভিমান আবেগ, দুঃখ এইবার আকুল কান্নায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।পৃ.১০৮-১০৯

এ উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে একটা করে কবিতা আছে, যার মধ্যে ফুটে উঠেছে নিম্নবর্গীয় নারীর মুখাচ্ছবি। নারীর বিরহযন্ত্রণার কথা প্রকাশিত হয়েছে নিম্নোক্ত কবিতায়–

'বনের কোকিল আর ডাকসি না রে
ও সে কদম্ব ডালে
প্রাণ বঁধু নাই যে মোর ঘরে রে
এ বসন্ত কালে।'

Dhaka University Institutional Repository

কাঞ্চনমালা উপন্যাসে গান, কবিতা ও বর্ণনার পাশাপাশি উপভাষার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। বিশেষ করে অনেক স্থানে উক্তি প্রত্যুক্তি লেখকের বর্ণনার স্থান দখল করে নাট্যধর্মী উপভাষার সংলাপের আশ্রয় পেয়ে সৃষ্টি করেছে ভিন্ন ব্যঞ্জনা। যেমন–

'সত্য কও বাদ্যানী? যাবা ঘরে?

: কোথায় তোমার ঘর?
: ঐ তো পাশের গ্রামেই।
চাপা আরও দুষ্টামি করিয়া কহিল: কি দিবা আমারে?
: যা চাও!-
: বেড়াইতে না চিরদিনের জন্য নিতে চাও মিঞা?
লোকটি উৎসাহিত হইয়া কহিতে লাগিল: যদি রাজী থাকো, চিরদিনের জন্যই, যাবা?
: বাড়িতে বউ নাই?
: আছে।
: কয়জন?
: দুইজন।
: তারা হাঙ্গামা করবে না?
: তা একটু করবে।
: তাইলে?
: সে আমি ব্যবস্থা করিয়া লমু হানে।'

জায়জঙ্গলের ভাষা প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক তাঁর পরীক্ষাধর্মিতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন –

'আঞ্চলিক জীবনোপযোগী ভাষা- ব্যবহারের প্রচেষ্টা পরীক্ষামূলক; এর মধ্যে লেখকের প্রাচীন রীতির দোষারোপ অন্যায় হইবে, গ্রন্থ যাহাতে অধিকসংখ্যক পাঠকের কাছে পৌছাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই বক্ষ্যমান আঙ্গিক ব্যবহার করিয়াছি।'

লেখকের ভাষ্যমতে, পরীক্ষামূলক আঞ্চলিক জীবনোপযোগী ভাষা ব্যবহারের প্রচেষ্টা উপন্যাসে করা হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সে পরীক্ষায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাফল্য ঈর্ষণীয়। গ্রামীণ প্রকৃতির নানা রূপ বর্ণনার ভাষা আমরা প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করছি-

অথচ এই অন্ধকারের একটা আশ্চর্য সুন্দর রূপ আছে। দিনের বেলায় সবুজের নানা ছোপভরা জঙ্গলে বুনো ফল, ডালে ডালে অর্কিডের ঝাড়, যাকে সবাই বলে পরগাছার ঝাড়, নানা বর্ণের ফল যে রঙিন পুরী গড়িয়া রাখিয়াছে, তাহা সবসময় ভয়ের উদ্রেক করে না, বরং আগন্তুক-চক্ষুকে যেন ক্রমাগত অভ্যন্তরে টানিয়া লইয়া যাইবার প্রয়াস পায়। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে সেই আমন্ত্রণ নাই; বরং জোনাকি পোকার গতিবিধি, এই দিকে-

Dhaka University Institutional Repository

সেইদিকে অকস্মাৎ জ্বলিয়া ওঠা অগ্নিশিখা সঞ্চরণ, আর সেই সঙ্গে নানা সুর-স্বর ডাকাডাকি, এমনকি স্থির নৈঃশব্দ্য ও অজানা-অচেনা শরীরী ও অশরীরী নানা প্রাণীর পাখিরও উত্তমরূপে হেফাজতে বন্ধ রাখিয়া মানুষ কেবলমাত্র এই অন্ধকার দূর হইবার প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু তবু জীবন বাঁচাইবার কঠোর সংগ্রামে মানুষ এখন এই রাত্রি, এই অন্ধকার এই ভীতিকেও উপেক্ষা করিতে শুরু করিয়াছে।পৃ.২৩

যার সাথে যার উপন্যাসে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম চলিত রীতিকেই বেছে নিয়েছেন। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই ঔপন্যাসিকের প্রাতিস্বিক চেতনার ইঙ্গিত মেলে। গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, তাতে ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতা বাস্তব রূপ লাভ করে। যেমন–

শীতের সকালে সূয্য হয়তো ঘুম ভেঙে জগতে গড়িমসি করে। কিছুটা ঘুমে কিছুটা শীতে হয়তো সেও কুঁকড়ে গুটিয়ে আপন গায়ের লেপ কম্বল এলোমেলো করে ফেলে সবখানে। এক সময় ধান ক্ষেতের ওপর তার খসখসে পাতায় এমন করে আটকে যায় যে তার আর ছাড়িয়ে নেবারও উদ্যম থাকে না। হাতের ডানে সেই কুয়াশা-কম্বল দূর করে দিতে দিতে চোখ পড়ে ইতিমধ্যে হয়তো কিছুটা উম পেলেই ধানগুলো বেশ পোক্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রতিটি গাছের চেহারা গর্ভিনী যুবতীর মতো, ধানে চাপ দিলে স্তনের বোটায় বেরিয়ে আসে দুধ-এর মতো রস। তার স্বাদ মিষ্টি, রঙে প্রতিশ্রুতি।

প্রাচীন গদ্যরীতিতে রচিত *সমুদ্র বাসর* উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর মানুষের জীবন-রূপায়ণে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম লোকজ সংস্কার, বিশ্বাস, উৎসব-পার্বণ প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তেমনি একটি প্রাচীন রীতি 'কুমির ব্রত'র বর্ণনা–

বাঁশ এবং খড়-মাটি দিয়া একটা কুমির মূর্তি এমন করিয়া বানান হয় যে মনে হইবে ভাভের গর্ত হইতে হামাগুড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়াছে শরবন ভাঙিয়া।..... কিশোরীরা তড়িৎ গতিতে আরও সাফসুফা করে আলপনা দেওয়া প্রাঙ্গণ, সব ঘর হইতে গৃহবধুরা শাঁখ বাজাইয়া যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রে কুমীরের মুখের পাশে সম্মুখে লইয়া আসে ভোগ-ব্যঞ্জন। যাহার যত সাধের জিনিস, এমন কি কয়েক জোড়া মোরগ-মুরগি একটি ছাগলও সেই উপলক্ষ্যে উৎসর্গ করা নিয়ম।

অতঃপর শুরু হয় প্রার্থনা। প্রার্থনার ভাষা–

যে যাহা পারিয়াছি সর্বস্ব আনিয়া দিলাম তোমাকে তোমাকেও জীবনের নিয়ামক বলিয়া প্রণাম করি। তুমি এই ভোগ গ্রহণ করিয়া খুশি হও। আশা করি তুমি আমাদের স্বামীপুত্রের কল্যাণ দেখিবে। যেন তোমার লাঙ্গুল নাড়াইয়া বড় বড় মাছগুলিকেও তাহাদের জালের মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার।

কাঞ্চনগ্রাম উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গের শহরবাসী হবার ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের নিজস্ব ভাষারীতি তথা ধ্রুপদী বাংলা ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার সমাহারে–

Dhaka University Institutional Repository

সক্কলেরই বাড়িয়া চলছে লোভ। আমরা দেশে না থাকিলেই যেন তাদের লাভ হয়। এক সময় পরিবার ছিল, গোষ্ঠী ছিল, মাথার উপর ছিল পঞ্চায়েত কি সালিশের ব্যবস্থা। এখন সকল কিছুই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতে আছে, কোনও কিছু তেমন দানা বাঁধিয়া উঠতে আছে না। এই শহরবাসী না হইলে নিজ পরিবারের মুখে খাওনও দিতে পারতাম না।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাস : নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন রূপায়ন

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাস : নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন রূপায়ন

১.

কেবল গ্রাম ও গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ নয় নগরের মানুষের জীবন ও শামসুদ্দীন আবুল কালাম তার কথা সাহিত্যে চিত্রিত করেছেন। তার কিশোর উপন্যাস *সবাই যাকে করলো হেলায়* (১৯৫৯) তিনি নাগরীক মধ্যশ্রেণীর একটি পরিবারের অর্থনৈতিক সংকট ও সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। নাগরিক জীবন ও জীনবজিজ্ঞাসার বাস্তবকাহিনী আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণ করেছে। নাগরিক সভ্যতায় মানুষ সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন যাপন করে বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কিন্তু তার আড়ালে এক শ্রেণীর মানুষ যে কী রকম মানবেতর জীবন যাপন করে তার খোজ আমাদের অজানা। সেই অজানা জীবনের কথাই ব্যক্ত করেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম তার এ উপন্যাসে। উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে জানা যায় যে, পিতা-মাতা, ভাই- বোনসহ ছাত্র ষোল বছরের সাবের লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির কাজে সাধ্যমত সহায়তা করে। ছাত্র হিসাবে খুব ভালো সে নয় কিন্তু ভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়ে সে দিল সিদ্ধান্ত। তাছাড়া বানান করা, সারাবাড়ির যত্ন নিয়ে সুন্দর রাখা তার অন্যতম গুন। বাড়ির শোভোবর্ধনে সাবেরের জুড়ি মেলা ভার। বড়ো ভাই মালেক কলেজ ছাত্র পড়াশুনায় ভালো বলে পিতার প্রিয়পাত্র সে। সাবেরের একমাত্র বন্ধু রফিক। বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে দুএকটি তাক লষ্ঠন লাগিয়ে দেবার মতো কাজ করেছে সাবের। স্কুলের ম্যাজিক লষ্ঠন ঠিক করা, রফিকের মামা আহমেদ সাহেবের প্রোজেক্টর চালানোতে সাহায্য করা, ম্যাক সাহেবের অচল গাড়ি সচল করা প্রস্তুতি। আরেকটি বিষয়ে অসাধারন দক্ষতা দিল সাবেরের। তা হচ্ছে দেশীয় ডিজাইনে চমৎকার সব পুতুল তৈরি সাবেরের পিতা নিম্ন আয়ের মানুষ। বহু কষ্টে শান্তিনগরে ১২০০০/= টাকা চুক্তি করে ৫০০০/= টাকা অগ্রিম দিযে একটি বাড়ি ক্রয় করে, বাকী টাকা সপ্তাহে খানেকের মধ্যে পরিশোধের অঙ্গীকার করে। অভাব-অনটনের কারনে টাকার জোগাড় না হওয়ায় আড়িটি ছেড়ে দিতে হয়। সাবের বাড়ির তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে তিন মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধের অনুরোধ করলে তত্ত্বাবধায়ক পেশকার তাতে রাজী হয়। সাবেরের তৈরিকৃত পুতুল বিক্রিয় টাকায় সে বাড়ি ছাড়ানো হয় শেষ পর্যন্ত। সংসারে হারিয়ে যাওয়া হাসিটুকু ফিরে আসে সাবেরের কল্যাণে।

উপরি-উক্ত কাহিনী 'সবাই যাকে করলো হেলা' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। সবার অবহেলার পাত্র নিজ কর্মদক্ষতায় সবার প্রিয়পাত্রে পরিনত হয়েছে। সাবের ও তার পরিনত হয়েছে সাবের ও তার

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের দুঃখ- কষ্টের কথা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। সাবেরের মা অপরিণত সাবেরকে বারবার বলেছে "তুমি ভালো করে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, ভালো চাকরী-বাকরী করে আমাদের দুঃখ ঘোচাবে।" সাবের মা'র সব কথা বুঝত না। বাবার মন খারাপ করে থাকার কারণ মা'র কাছে জানতে চায়। মা বলে,'আমরা বড়ো গরীব সাবের। তোমার বাবা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এই সংসার চালান। তার অল্প আয় দিয়ে দু'জনে মিলে কেবলই চেষ্টা করছি তোমাদের ভালো খেতে পরতে দিতে, মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে।' যদিও পরে সাবেরই পরিবারের অর্থনৈতিক মুক্তির পথে বড় ভূমিকা পালন করেছে। সাবেরের সাফল্যের আড়ালে শামসুদ্দীন আবুল কালাম নাগরিক মধ্যশ্রেণীর (আসলে নিম্নবর্গই বলা যায়) করুণ জীবন-বাস্তবতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন--- 'বাবা গেলেন বেরিয়ে-বেলা প্রায় দুটোর সময় বাজার নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। কী বাজার, মাত্র কুচোচিংড়িং আর ডাল।' এভাবে উপন্যাসে তৎকালীন ঢাকা শহরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। শহরে ধনী-গরিবের বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। গ্রামে দারিদ্র আছে, আবার মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম তথা সামাজিক বন্ধনও আছে, শহরে যা অনুপস্থিত। এখানে ধনিকশ্রেণী মানুষকে কেবল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবহেলা করে। সাবের নিজ যোগ্যতা বলে সবার অবহেলাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হলেও শহরের অন্য সাবেররা অবহেলার মধ্যেই রয়ে যায়। ঔপন্যাসিক নাগরিক নিম্নবর্গের প্রতিক সকলের অবহেলার কথাই এই উপন্যাসে মাধ্যমে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন অসাধারণ শিল্পকুশলতায়। উপন্যাসটি নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবনচিত্রের একটি নিখুঁত দর্পণ।

কাঞ্চনমালা উপন্যাসের কাহিনী বেদে-সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা ও তাদের প্রেম-ভালোবাসার নানা ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে। এখানে শহর ও শহরের নাগরিকদের জীবনচিত্র বর্ণিত না হওয়ায় নাগরিক নিম্নবর্গ বা মধ্যশ্রেণীর জীবন অনুপস্থিত। কেবল ধলা বিষ বিক্রি করতে শহরে গিয়ে ফিরে আসার পর তার জবানীতে শহরের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে লেখক ধলার ব্যাঙ্গাত্মক গানের মধ্য দিয়ে নাগারিক মধ্যশ্রেণীর জীবনের ফাঁক ও ফাঁকিকে চমৎকার ঢং এ উপস্থাপন করেছেন–

দেখিয়া আইলাম ঢাকার শহর
সে বড় আজব জাগা ভাই
হেথায় লাখে লাখে দালান-কোঠা,
মানুষ গাড়ির সংখ্যা শুমার নাই।
হেথায় কল টিপলে পানি পড়ে, বোতাম ছুঁইলে বাতি।
সন্ধ্যাকালে বাইসকোপ দেখে খাঞ্জা খানের নাতি।

Dhaka University Institutional Repository

লাখে লাখে দালান-কোঠা
মালিক যারা তারা তিনশো টাকা মায়না পায়,
তবু দালন হাঁকায় আহা, কেমন চমৎকার।'

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক দ্রোহও প্রকাশিত হয়েছে এ গানের পরর্বতী অংশে–

এক জমিদার গিয়া আইছে আরেক জমিদার
কেহ বলে 'সাহেব' তাগো কেউ বা বলে সার।
তারা চড়ে মটর গাড়ী, পথের মালিক যেন তারাই
হাটতে পথ লাগে ডর, জানটারে না হারাই।।

জীবনকাব্য (১৯৫৬) শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের অন্যতম সামাজিক উপন্যাস। সমগ্র মানবজীবনের কাব্য তাঁর এই 'জীবনকাব্য' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। দশ অংশে বিভক্ত এ উপন্যাসে জীবননাট্যের নানা বিষয় উপস্থিত করেছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। বাঙালিজীবন বিশেষ করে নাগরিক নিম্নবর্গের দুঃখ-দারিদ্র্য, বেদনা, কর্মচঞ্চল কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে এ উপন্যাসখানি। দশ কিস্তির কাহিনীর এ উপন্যাসটি অভিনব আঙ্গিকে রচিত। এর প্রত্যেকটি কাহিনী আলাদা, একটির সঙ্গে অন্যটির কোন যোগসূত্র নেই। দশ কিস্তিতে দশটি স্বতন্ত্র কাহিনী রয়েছে। উপক্রমণিকাতে লেখক বলেছেন:

425589

আমি যাদুকর নহি, মায়ামন্ত্রে তোমাদের মন ভুলাইয়া বর্তমান হইতে বিচ্যুত করিয়া লওয়া আমার ধর্ম নহে। আমি তোমার আমার চারিধারের জীবনলীলা হইতে সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সুখ দুঃখের কয়েকটি কাহিনী তোমাদের শুনাইতে পারি; যদি কেহ মনে করো, সে কাহিনী ঘটা করিয়া শুনাইবার প্রয়োজন কী, সবই তো জানা! তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার নাই; বরঞ্চ এই ভাবিয়া খুশি হইব যে অনুরূপ জীবনলীলা তুমিও প্রত্যক্ষ করিয়াছ, ভাবিয়াছ। যাহারা আমার কথা পছন্দ করো না এ গ্রন্থ পড়িয়া মনটাকে আরো খিঁনড়াইয়া লইও না। যাহারা তবু পড়িবে, তাহাদের উদ্দেশ্যে সালাম জানাইয়া আমার কাহিনী শুরু করিতেছি।.... এ কাহিনী কোনও একক চরিত্র নহে। অনেকের কথা লইয়া, অনেকের জীবনের রক্ত-সুধা লইয়া এ কাহিনী শুনাইব। যাহাদের কথা বলিব তাহারা কেহ কাহারও নহেঃ এ উহাকে হয়তো জানে না। প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের সম্বন্ধ খুঁজিয়া তোমরা বিব্রত হইও না। একবার উহার, অন্যবার তাহার কথা শুনিয়া কাহিনীর সম্বন্ধতা-বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হইয়া উঠিও না। সমগ্রভাবে একটি কাহিনীই তোমাদের শুনাইব। জীবনের কাহিনী।

Dhaka University Institutional Repository

'পহেলা কিস্‌তী'তে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম নাগরিক নিম্নবর্গের ফতেমা ও তার বান্ধবী কুলসুমের জীবন নাট্য রূপায়ন করেছেন। ফতেমা এক বাসায় ঝি এর কাজ করে। তার বান্ধবী কুলসুমও আজিমপুরের এক বাসায় ঝি এর কাজ করে। ফতেমার বিয়ে হয় রাজমিস্ত্রী কাদেরের সাথে। মদ্যপ স্বামীর সঙ্গে বেশিদিন তার ঘর করা হয় নি। পেটের দায়ে সে এখন বাসায় ঝি এর কাজ করে। বাজার করা থেকে শুরু করে ঘরের যাবতীয় কাজ করে সে। তার বান্ধবী কুসলুমের সংসার আছে, স্বামীও বর্তমান। বিড়ির দোকানে কাজ করে, তবুও সংসারের প্রয়োজনে সেও 'মামা'র কাজ করে কলোনীর এক বাড়িতে। দুই বান্ধবীর আকস্মিক সাক্ষাৎ হয় বাজার করতে এসে। সুখ-দুঃখের নানা আলাপের মধ্যে সমাজের উচুঁস্তরের লম্পট 'সাহেব'দের সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় কুলসুম তার বান্ধবী ফতেমাকে নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে, ;'দেখিস বাপু , বাইরে দেখে চেনা যায় না ওদের। আমি এর আগে যে, বাসায় ছিলাম বলিয়া কুলসুম বর্ণনা করিল নিজের অভিজ্ঞতার কথা। ঐ আজিমপুরারই এক ফ্ল্যাটে। পাক ঘরের পাশে আধখানা ঘরে সে রাত্রিতে শুইয়া ছিল। স্বামীর দোকানে কাজ পড়িয়াছিল, সুতরাং আর বাড়ি ফেরে নাই। মধ্যরাত্রে হঠাৎ জাগিয়া দেখে, পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সাহেব কী ফিস ফিস করিতেছে।' পৃ.৮

'দ্বিতীয় কিস্‌তীতে 'সাব-এডিটর প্লাস স্পোর্টস সেকশনের ভারপ্রাপ্ত' সাব-এডিটর মামুনের গ্লানিময় নিম্নবর্গের জীবন কাহিনী তুলে ধরেছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। দারিদ্র্যের কষাঘাতে মামুনের উচুঁ মাপের লেখক হবার স্বপ্ন অধরাই রয়ে যায়। সামান্য স্কুলে টিচারের চাকুরি নিতে বাধ্য হয় সে। পরে পেশা পরিবর্তন করে আসে সাংবাদিকতায়। এখানেও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না মামুন। দুর্নীতিবাজ সম্পাদকের অধীনে কর্মরত মানুষ কখনোই সত্য কথা লিখতে পারে না। টেলিপ্রিন্টারের নষ্ট হবার ফাঁকে মামুন নিজের জীবনের হিসাব মিলাতে বসে। নিজে একটি পত্রিকা বের করার স্বপ্নে বিভোর হয় সে। 'কাগজ সে বাহির করিবেই। এ চাকুরী সে করিবে না। কাল ভোরেই সে কাগজের খোজে বাহির হইয়া পড়িবে। ম্যানেজারকে সে আজ রাত্রেই জানাইয়া যাইবে, সে কাল ভোরে আসিতে পারিবে না। অতৃপ্তির বোঝা বহিয়া ঘৃণ্য কৃমিকীটের কিংবা রোঁয়া ওঠা কুকুরের মত এইভাবে বাঁচিয়া থাকিবার বোঝা সে আর বহন করিবে না।' পৃ.২৬ কিন্তু স্বপ্ন দেখা পর্যন্তই মামুনের দৌড়। টেলিপ্রিন্টার কালুর সংবাদে বাস্তবে ফিরে আসে মানুন। দৌড় দেয় আবার অফিসের দিকে।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম 'তৃতীয় কিস্‌তী'তে জামাল ও রাবেয়ার দারিদ্রদগ্ধ জীবনের কাব্য উপস্থাপন করেছেন। নাগরিক নিম্নবর্গের জামাল সামান্য একজন কেরানি। একশত পঁচাত্তর টাকার কেরানির এ সামান্য আয়ে সংসার চলে না। স্ত্রীর একটার পর একটার অভিযোগ যেন তাকে পাগল করে তোলে। আসলে সবই দুর্ভাগ্য। 'বিয়ের পর দুইজনের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িল, ডাক্তার দেখাইল। ডাক্তার কহিলেন: ভালো খান দান, আর এই ইঞ্জেকশনগুলো নিন। কিন্তু অর্থাভাবে কোনোটাই এখন পর্যন্ত সম্ভব হইয়া উঠিল না। হইবেও না নিতান্ত দুর্ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ না করিলে আজ তাদের এ অবস্থা হইবে কেন!' পৃ.২৩ সামান্য ডালভাত আর ছোট মাছের চচ্চড়ি ছাড়া আর তাদের ভাগ্যে কিছু ছোটে না। স্ত্রী রাবেয়ার পরনে ভালো শাড়ি নেই, জামালেরও দু'টো মাত্র শার্ট প্যান্ট। এরমধ্যে অতিথি আসুক তা দু'জনের কেউই মনে-প্রাণে চাইত না, 'কয়েকবার ইচ্ছানুযায়ী আদর আপ্যায়ন করিতে অপারগ হইয়া শেষ পর্যন্ত সে খোদার কাছে কাতর আবেদন জানাইয়াছে, যেন কেউ আর তাহার বাড়ীতে না আসে।' পৃ.৩৭ সাংসারিক অবস্থা পরিবর্তনের আশায় রাবেয়া সারারাত শবেবরাতের নামাজ পড়ে। তাতেও কোনরূপ ভাগ্য পরিবর্তন না হওয়ায় সে আফসোসও করে। আকস্মিকভাবে জামাল একদিন লটারির টাকা পেয়ে জামা, কাপড়, শাড়ি ও মেয়ের জন্য ফ্রক নিয়ে আসে। নতুন শাড়ি পরে স্ত্রী রান্না ঘরে যায়। দুর্ঘটনাক্রমে শাড়িতে আগুন লেগে স্ত্রী গুরুতর আহত হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও রাবেয়ার জীবনকাব্য তেলবিহীন প্রদীপের মতোই নিভে যায়।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম *জীবনকাব্যের* চতুর্থ 'কিস্‌তী'তে নাগরিক নিম্নবর্গের আরেক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী লতিফের জীবন যন্ত্রনার ছবি অঙ্কন করেছেন। চাকুরি পাবার পূর্বে লতিফের কষ্টের জীবন-অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে এভাবে– 'ছাব্বিশ বছরের জীবনের অভিজ্ঞতায় এটা বেশ বুঝতে পারিয়াছে যে, টাকা ছাড়া এই দুনিয়াতে কিছু করিবার নাই। খাতির ভালোবাসা বলো কিংবা মান-সম্মানই বলো, এমন কী দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘরে শুইয়া থাকাও পয়সার উপর নির্ভর করে; পয়সার ওজনেই মানুষের ওজন।' পৃ.৪৯ পয়সাময় এই জগতে লতিফ পয়সা ছাড়া যে একেবারেই অচল। তবুও সরকারি অফিসের চাপরাশির চাকুরি পেয়ে সে ভাবল 'এবার ইহজীবনের বেহশ্‌তবাস না হউক, দুঃখটা অন্তত: ঘুচিবে।' পৃ.৪৯ কিন্তু বাস্তবে ঘটে ভিন্ন ঘটনা। গ্রাম থেকে শহরে আসে পিতা ওয়ালীউল্লা। পুত্রের চাকুরির সংবাদে বেশ উৎফুল্ল হয়ে শহরে আগমন ওয়ালীউল্লার। পুত্র যথাসাধ্য পিতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করলো বহু ধার দেনা করে। অকস্মাৎ পিতা অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তি করে দামি ইনজেকশন দিয়ে একেবারে রিক্ত হস্ত হয়ে যায় লতিফ। কাবুলিওয়ালার কাছ হতে চড়া সুদে ধার করে সে। তাতে শেষ রক্ষা হয় না। গ্রামে বৃদ্ধা মা ও ভাইবোনদের অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

আরও চরমে ওঠে। এদিকে পিতার পিছনে খরচ দিন দিন বাড়তে থাকে। অন্য উপায় না পেয়ে অফিস থেকে টাকা চুরি করে হাসপাতালে যায় লতিফ। ততক্ষণে সব শেষ । ওয়ালীউল্লা তখন অন্য জগতে চলে গেছে।

'পঞ্চম কিস্‌তী'তে বর্ণিত হয়েছে একজন কালেক্টরের মেয়ে মিলির সঙ্গে বি.এ পরীক্ষার্থী রাজুর প্রণয়ের ইতিকথা। বিয়ের চার বছরের মধ্যেই তাদের জীবনের রূপ-রস-গন্ধ মুছে দেখা দেয় বাস্তবতার কঠিন রূপ। তিন সন্তানের জননী হয়ে মিলি পাকা গৃহিনী। দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য তাদের জীবনে নিত্যসঙ্গী। প্রণয়ের সময়কার স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। জীবনের সত্যিকারের রূপ তাদের সামনে উপস্থিত। 'জীবন-ভোগের যে স্বপ্ন তাহারা দেখিয়াছিল, তাহা বাস্তবের রূঢ় আঘাতে চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেছে। ভাঙ্গিয়া গিয়াছে মনও, তাই তাহাদের মধ্যে সাংসারিক খিটিমিটির অন্ত নাই।' পৃ.৭১ তবুও তারা জীবনের মহত্তর অর্থ খোঁজে বেঁচে থাকার মধ্যে।

'ষষ্ঠ কিস্‌তী'তে একজন শিল্পী ও একজন সাহিত্যেকের জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নাসির একজন শিল্পী ও তার বন্ধু সাহিত্যিক। তারা দু'জনেই যার যার কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান। কিন্তু তাদের কাজের কোন মূল্যায়ন বা স্বীকৃতি কোনো দিক থেকে আসে না। জীবিকা ও জীবনের তাগিদে দুই বন্ধু শহরে আসে। এখানে খাপ খাওয়াতে কষ্ট হয় তাদের। জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের মতো অবস্থা হয় তাদের। সমাজের তথাকথিত লেখক ও চিত্রশিল্পীদের কথা এ উপন্যাসে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। শিল্পরসিকদের ধারণাকে ব্যঙ্গ করেছেন ঔপন্যাসিক স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় - 'ঃ পোট্রেট আঁকতে পারেন না ? তাহলে কী আর্টিষ্ট আপনি! আর্টকে তো কাজে লাগানো চাই !' পৃ.৯১

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম *জীবনকাব্যের* 'সপ্তম কিস্‌তী'তে বৈচিত্র্যময় কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। নাগরিক নিম্নবর্গের হতভাগ্য এক তরুণের জীবন-কাব্য। 'আমি গতকাল হইতে কিছু খাই নাই।' কিন্তু এ কথা কে বিশ্বাস করবে। 'অনাহারী, উপবাসী বঞ্চিত মানুষের হাহাকার একালে আমাদের কানে বজিয়াও বাজে না ; মনের সেসব অনুভূতির সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি যেন আঘাতে আঘাতে বিকল হইয়া গেছে।' পৃ.১০৫ তাই তরুণটির কথাও কেউ বিশ্বাস করে নি। আর তাই ক্ষুধায় কাতর অফিস বয় ছেলেটি আত্মহত্যা করে দৈন্দনিতার গ্লানি হতে মুক্তির উপায় খুঁজে নিল।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম 'অষ্টম কিস্‌তী'তে পুত্র উজীর আলী ও পিতা হিঙ্গল হাওলাদারের 'অবিমৃশ্যকারী নিষ্ঠুর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কৃষক হিঙ্গল আলী পুত্র উজীরকে লেখাপড়া শেখানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বাপ-দাদার পেশা ছেড়ে উজীর স্কুলে ভর্তি হয়। কিন্তু পড়াশুনা তার সাধ্যের বাইরের বিষয়। প্রতি ক্লাসে দু'তিন বার ফেল করে শেষ পর্যন্ত তিন বারে সরকারের বিশেষ সুযোগ দানের

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে উজীর আলী ম্যাট্রিক পাশ করে। শহরে চাকুরি লাভের দিনের অভিজ্ঞতা, 'সে এক দিন! যে দুনিয়া সম্বন্ধে সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দুনিয়াই যেন আবার অকস্মাৎ রূপে বর্ণে গন্ধে ঝলমল করিয়া উঠিল।' পৃ. ১১৬ চাকুরি পেয়ে প্রথম চিঠিতেই বাবা হিঙ্গুল আলী হাওলাদারকে উজীর 'হাওলাদার' না লিখতে অনুরোধ জানায় –'আপনি যেন আর চিঠিপত্রে আমার নামের শেষে হাওলাদার না লেখেন, কারণ তাহাতে ইহারা আমাকে ছোট বলিয়া ভাবিবে। হাওলাদার লিখিবেন না।' পৃ .১১৭ Put up কথাটির মানে না বুঝা উজীর আলীর অফিসে একদিন বাবা হিঙ্গুল আলী গ্রাম থেকে তাকে দেখতে আসলে নিলর্জ্জের মতো মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নেয় সে। পিতার বেশভূষা ও কথা-বার্তায় গ্রামের মানুষের ছাপ স্পষ্টতই বোঝা যায়, আর তাই গ্রামের সাথে কোনও সম্পর্ক রাখতে না চাওয়া উজীর আলী নিজের পিতাকেই অস্বীকার করে বসলো। সহকর্মীদের বললো - 'দূর! দেখিও নাই কোনো দিন, আমার বাপ-চাচাদের মধ্যে অমন গেঁইয়া নাই কেউ।' পৃ. ১২৪

'নবম কিস্‌তী'তে লেখকের চিত্র পরিচালক বন্ধুর মুখে শোনা কাহিনীর বিবরণীতে জানা যায়, রাধিকা নাম্নী এক যুবতী নায়িক হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে এক দালালের হাতে টাকা পয়সা ও তার সব সোনা-দানা তুলে দেয়। দালাল সব নিয়ে চম্পট দেয়। পরে জানা যায় এ কাজ ভোকারেটর কুলি সামাদের। সামাদের ভাষ্য মতে রাধিকা নিজেই খারাপ মেয়ে-মানুষ। উল্টো সামাদের কাছ হতেই রাধিকা অনেক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

'দশম কিস্‌তী'তে শামসদ্‌দীন আবুল কালাম কবি আবুল হাশেম হাশমীর ব্যর্থ জীবনের কাব্য বর্ণনা করেছেন। হাশমীর কণ্ঠস্বর কিছুটা অস্বাভাবিক, যে-কারণে কেউ তার রচনা শুনতে চায় না, বরং তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা, ঠাট্টা করে। অথচ হাশমী জীবনের মধ্যেকার ভালো লাগাটুকু কবিতার রঙে রাঙিয়ে বলতে চেয়েছে। কেবল কণ্ঠস্বরের দুর্বলতার কারণে হাশমী কী লেখে, ভালো কি মন্দ, তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করে না কেউ। কিন্তু কাব্যচর্চার নেশা তার ছাড়ে না কখনোই। এ জন্য তার জীবনে বঞ্চনার, অপমানের শেষ নেই কিন্তু মন থেকে আসা কবিতা সে থামাবে কি করে।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম *জীবনকাব্য* উপন্যাসে নাগরিক মধ্যশ্রেণীর ফাঁপা জীবন কাহিনীরূপ নির্মাণ করেছেন। লোক দেখানো মেকি জীবন কথা উঠে এসেছে এ উপন্যাসের বিভিন্ন 'কিস্‌তী 'র কাহিনীর মধ্য দিয়ে। 'পহেলা কিস্‌তী'তে আমরা লক্ষ করি বিবি-সাহেবার কৃত্রিম জীবনকে প্রকাশ করেছেন লেখক কাজের মেয়ে ফাতেমার প্রেক্ষণবিন্দুর সাহায্যে। 'ফাতেমা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে বাড়িতে যখন মেহমান আসে বিবি সাহেবা তখন একেবারে অন্য মানুষ। কথায়, হাবে-ভাবে, চলা ফেরায় কী

Dhaka University Institutional Repository

ভদ্র, কী যে লোককে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা। যা তিনি নন, তাই করিয়া নিজেকে তুলিয়া ধরিতে তাহার চেষ্টার প্রাণান্ত প্রয়াস ফতেমাকেও লজ্জিত করিয়া তোলে মাঝে মাঝে।' পৃ. ৩ যে বিবি সাহেবা পান থেকে চুন খসলে ফাতেমাকে বকুনি দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, ফাতেমার রান্না করা খাবার চেটে পুটে নিঃশেষ করে ফাতেমার জন্য এতটুকু না রেখে, শুধু স্বামী-ভাগ্য বলেই আজ তিনি 'মেমসাহেব'। বাস্তবে, স্বভাবে-আচরণে একেবারেই নিম্নরুচির মানুষ। বাড়িতে মেমসাহেব একলা থাকলে তার সত্যিকারের চরিত্র প্রকাশ পায় আবার লোকজনের সামনে একেবারেই ভিন্ন, যা কাজের মেয়ে ফাতেমাকে বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দেয়। সে মেলাতে পারে না বিবি-সাহেবার এই কৃত্রিম জীবন-যাপন ও দ্বৈত-সত্তাকে। 'তৃতীয় কিস্তী'র কাহিনীতে আমরা নাগরিক মধ্যশ্রেণীর যে পরিচয় তাই তাতে দেখা যায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের চুরি করা পয়সায় উন্নত জীবন-যাপন। আর স্ত্রীর জন্য গহনার পর গহনার অর্ডার। 'ষষ্ঠ কিস্তী'তে শামসুদ্দীন আবুল কালাম নাগরিক মধ্যশ্রেণীর বিকৃত শিল্পরুচির পরিচয় তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। এদেশে 'সবে মাত্র গায়ে-পায়ের-কাদা-ধোয়া, নোতুন প্যান্ট পরা বেসামাল মধ্যবিত্তের ম্যাট্রিকের খাতায় Culture-কে Kalcur লিখিয়া এবং 'কালছার' উচ্চারণ করিয়াই গরিমা অনুভব করে ;' ধানের আঁটি মাথায় লইয়া এদেশেরই একটি চাষী খালের পুল পার হইতেছে সে-ছবি 'অত্যন্ত সাধারণ সাবজেক্ট - বিশেষ কোন মূল্য নাই' আবার এই মধ্যশ্রেণীর সমালোচকরাই 'তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীর অঙ্কিত অর্ধোলঙ্গ নর্তকীর দেহ-ছন্দের রেখায় আর্ট-এর পরাকাষ্ঠা খুঁজিয়া পান। এরই নাম নাগরিক মধ্যবিত্তের রুচিজ্ঞান।

যার সাথে যার উপন্যাসে নাগরিক নিম্নবর্গের দু'টি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একজন নাম-পরিচয়হীন রিক্সাওয়ালা অপরজন দোকানী। রিক্সাওয়ালা গ্রাম থেকে শহরে এসে বস্তিতে উঠেছে। গ্রামে কাজ কর্ম না পেয়ে বাধ্য হয়ে শহরে এসেছে। মধুমিয়ার সাথে আলাপচারিতায় রিক্সাওয়ালার দুঃখের কাহিনী জানা যায়। 'ছিলো বই কী আদত বসত ছিলো ঐ ভাটির দেশে-অনেক নামায় যেখানে গাঙের মতি-গতির ঠিক নেই, তার ও উপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়া, দালালের উৎপাতে বর্গাচাষীরও কাম জোটে না।' পৃ. ১০৫ নদী ভাঙনে সব হারিয়ে এবং দু' বেলা দু'মুঠো অন্নের আশায় শহরে চলে এসেছে সে। এভাবে গ্রামীণ নিম্নবর্গ নাগরিক নিম্নবর্গে অভিবাসিত হয়েছে। শহরের একজন দোকানীর কথায় ফুঠে উঠেছে দ্রবমূল্যের উর্ধ্বগতি ও শহরের কঠিন জীবনের ইঙ্গিত–'এখন যে জমানা চলছে তাতে ঘুমিয়ে থাকলেও দাম বেড়ে যায়।' পৃ.১১

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবন-যাপন চিত্রের মধ্যে উপকাহিনী হিসেবে উপর্যুক্ত চরিত্র দু'টির অনুপ্রবেশ ঘটলেও নাগরিক নিম্নবর্গের চরিত্রের সাহায্যে শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর *যার সাথে যার* উপন্যাসে সমকালীন বাস্তবতাকেই নিপুণ হস্তে চিত্রিত করেছেন।

২.

শামসুদ্দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়ে আছে গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষের জীবনাচার। শহর ও শহরাঞ্চলের জীবন গ্রামের মতো না এলেও যতটুকু এসেছে তাতে পূর্ণ ছবিই উদ্ভাসিত হয়েছে। *জীবনকাব্য* উপন্যাসে সাধু রীতির আশ্রয়ে শামসুদ্দীন আবুল কালাম নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ করেছেন সার্থকভাবে। নিম্নবর্গের নারী ফতেমার মনোভাবনায় নাগরিক মধ্যশ্রেণীর অপর নারীর বাতিকগ্রস্ত আচরণের কথা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে চমৎকার পরিমিতি সহযোগে, আধুনিক গদ্যশৈলীতে –

'তাঁহারা সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ। বিত্ত আছে, বৈভব আছে, আছে মান ইজ্জত-বড়ো মানুষের যাহা থাকিবার- সবই। তাঁহাদের ভাষা, খানা, বেশ-বাস, চাল-চলন সব মিলাইয়াই এমন এক স্তরের বাসিন্দা যেখানে এই ময়লা কাপড়-চোপড় পরা হাত-পা ফাটা-বাইশ-বছরেই বুড়ী-হইয়া-যাওয়া ফতেমার পক্ষে আলোড়ন তোলার কি সাধ্য। উহারা মনিব- সাহেব, আর সে নিতান্তই একজন দরিদ্র 'মামা'- ঝি। বুদ্ধিমতী সে। তাই কথাগুলি ভাবিয়া নিজের মনে মনেই বিবি সাহেবার প্রতি করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা লইয়া হাসে।'

এ উপন্যাসে নগরের কঠিন জীবনের কথা বলেছেন ঔপন্যাসিক বর্ণনাত্মক রীতিতে :

'রাজু এখন আড়াই শত টাকা মাহিনায় সরকারী চাকুরী করে। পরিশ্রম করে উদয়াস্ত। তবু ভুখা সংসারের পেট ভরাইতে পারে না। মিলি তিনটি সন্তানের জননী। মশলা বাঁটিয়া, ধোঁয়াভরা রান্নাঘরে আগুন ফুঁয়াইয়া রান্না করিয়া জানালার বাহিরে বাহিরের দুনিয়ার দিকে তাকাইবার অবকাশ পায় না। জীবন ভোগের যে স্বপ্ন তাহারা দেখিয়াছিল, তাহা বাস্তবরে রূঢ় আঘাতে চূরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেছে।'

নাগরিক জীবনের কাহিনী নিয়ে রচিত *সবাই যাকে করলো হেলা* উপনাসে চলিত ভাষায় প্রাত্যহিক ও রোজকার জীবনে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে শামসুদ্দীন আবুল কালাম কিশোর সাবেরের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মৌলবীর বর্ণনায় শব্দের সঙ্গে রংয়ের ব্যবহারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে পুরো দৃশ্যটি –

Dhaka University Institutional Repository

'এই বইটা আর একটা ধ্যাতরা কালোরঙের শেরওয়ানী পরা ইশকুলের মৌলবীটার মুখটা একই রকম লাগে- একই সময় মনে পড়ে। কালোরঙের সেই শেরওয়ানীটা জন্মের দিন থেকে আজো পর্যন্ত বোধ হয় ধোবিখানার মুখ দেখেনি। বুকের কাছে চিমনি কাটলে, ডানদিকের পকেটের কাছে আঁচড় দিলে সের খানেক পানের শুকনো পিক কী হাতের ময়লা উঠে আসবে। যেদিন আবার কাঁধের কাছে দু'পরত কাপড় দেওয়া লম্বা জোব্বা আর তেলচিটচিটে গোল টুপীটা পরে, চোঙের মতো পাজামাটা থাকে পায়ের আধখানা অবধি উঠে- আর ক্লাশে পড়াতে পড়াতে গলায় ঝুলানো তামার শলাটা দিয়ে পান খাওয়া দাঁত খিলাল করে, আর শলাটা শব্দ করে চুষে চুষে খায়, তখন আরো অসহ্য লাগে।'

নবান্ন উপন্যাসে শামসুদ্দীন আবুল কালাম ইতিহাসকেও ধারণ করেছেন তাঁর প্রচলিত গদ্যরীতিতে-

'যুদ্ধ এই দেশ গাঁ-এর মানুষও অনেক অনেক বছর থেকে করে আসছে। ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অত্যাচার নামার সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো একের পর এক এসেছে এই মাটির উপর। যে যেমন পারে রুখে দাঁড়িয়েছে মরেছে, বেঁচেছে। এই নসীব থেকে কেউই কখনো মুক্তি পায়নি, কেউ তাদের সাহায্যের জন্য পাশে এসেও দাঁড়ায়নি। এসেছিস যখন, দেখ, শোন কী ঘটেছে বা ঘটছে। যুদ্ধে নেমে হতাশায় রণে ভঙ্গ দেওয়া কোনও কাজের কথা নয়। নবীজির কাছ থেকে একটা বড় শিক্ষার বিষয় ছিলো 'আপনি আচরি ধর্ম শিখাউ অপরে।' আমার কথা হয়তো তোদের কাছে পুরোনো ঠেকবে। তবু বলি, ঘুরে ফিরে দেখ, এই নাম ছাড়া গোত্র ছাড়া মানুষগুলো কেমন অসহায়। অথচ এদের অপারেজয় মনোবল নিয়ে বংশ বংশ ধরে করা যুদ্ধটাই এখনো এদেশে সবচেয়ে বড় হয়ে রয়েছে।'

শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর সর্ববৃহৎ উপন্যাস *কাঞ্চনগ্রাম*-এ প্রাচীন গদ্যরীতিতে অটল থেকে বর্ণনাত্মক পরিচর্যারীতির আশ্রয় নিয়েছেন। আবার চরিত্রানুযায়ী কথ্যরীতির প্রয়োগ করেছেন। কখনও নির্যাতনের মাত্রা প্রকাশে উপভাষাতেই নিয়েছেন ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আশ্রয়। যেমন –

: 'হেয় জনগণ না, ভোটের লিস্টিতে নাম নাই, আর এই গ্রামেরও না। সভার কথা শুনিয়া বেড়াইতে আইছে'।

: আচ্ছা, আচ্ছা, এই তুমি বলো দেখি, জনগণ বলতে কী বোঝো?'

: 'কী আর, যার ঘরে জননার আর পোলা পানেরও গনণা নাই, ভোটের লিস্টিতে নাম আছে।'

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ
শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্প: গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ
শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্প: গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ

১.

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম জীবনের অধিকাংশ সময় প্রবাসে অবস্থান করেও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার নিম্নবর্গ (Subaltern) ও মধ্যশ্রেণীর মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও পরিবর্তনশীলতা নিয়ে যে কথাশিল্প রচনা করেছেন, তা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ধারায় এনে দিয়েছে একটি স্বতন্ত্র স্থান। তাঁর কথাসাহিত্যে জীবন-অনুধ্যানে এসেছে সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রাম, গ্রাম সমাজে ভূমিকেন্দ্রিক মহাজনশ্রেণীর শাসন-শোষণ এবং সাধারণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্বের লড়াই। মানবতাবাদী জীবনবোধকেই তিনি প্রধানত ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্য আমাদের জাতিসত্তার অন্তর্গত পরিচয় ও সংগ্রামশীলতার একটি শিল্পিত স্বাক্ষর। তাঁর কথাসাহিত্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জনজীবন যেমন উদ্ভাসিত, তেমনি সেখানে পাওয়া যায় আমাদের জাতিসত্তার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-নৃ-তাত্ত্বিক এবং লোকসংস্কৃতিকজাত বহুমাত্রিক পরিচয়। মূলত নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর বহুমুখী জীবনচিত্র প্রকটিত হয়েছে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে। আমরা কয়েকটি অধ্যায়ে একাধিক পরিচ্ছেদে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন চিত্র বিশ্লেষণে প্রয়াসী হবো।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাশিল্পে উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পের ভুবন অধিক বৈচিত্র্যময়। মনে হয় ছোটগল্পেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। সেই চল্লিশের দশকের ঔপনিবেশিক আমলের নানা সমস্যা সংকুলতা বিশেষত সমাজের নিচুতলার মানুষের দুঃখ-দুর্ভোগ ও অস্তিত্ব সংকটের চিত্র অঙ্কন করেছেন তিনি বিভিন্ন ছোটগল্পে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণী আবার কখনো নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবনচিত্র একসাথে বাস্তবরূপ লাভ করেছে। তাই একটি বিশেষ প্রবণতা চিহ্নিতকরণ সহজ নয়। গ্রামীন নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবনচিত্র তাঁর যে সব ছোটগল্পে মুখ্য হয়ে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ –

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্পগ্রন্থ	ছোটগল্প
শাহেরবানু	'শাহেরবানু', 'জাহাজঘাটের কুলি' 'কেরায়া নায়ের মাঝি', 'পৌষ', 'শেষপ্রহর', 'মূলধন, মুক্তি', 'জোর যার', 'ভাঙ্গন'।
অনেক দিনের আশা	'অনেক দিনের আশা', 'কালীদহের তীরে' 'পৌষস্বপ্ন', 'কলাবতী', 'আসা-যাওয়ার কথা', 'হঠাৎ', 'দুর্যোগ', 'বাদর' 'ক্ষুধা'।
পথ জানা নাই	'বন্যা', 'বস্ত্র', 'সরজমিন', 'বাণ', 'পথ জানা নাই'।
মজা গাঙের গান পুঁই ডালিমের কাব্য	'ওয়েভলেংথ', 'মজা গাঙের গান'। 'কায়-কারবার'।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'শাহেরবানু'। গ্রন্থভুক্ত দশটি গল্পের সবগুলোতে গ্রামীণ নিম্নবর্গের বিচিত্র জীবন কথা তুলে ধরেছেন লেখক। গ্রামীণ নিম্নবর্গের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, বিপন্ন প্রেমবোধ, ভালোবাসাহীন দাম্পত্যজীবন, নৈতিক বিচ্যুতি, বিচ্ছেদময় পরিণতি, বিপন্ন অস্তিত্ব ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের চিত্র এ গল্পগুলোর প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে। গ্রন্থের নামগল্পটি সমকালীন সমালোচকগণ কর্তৃক ব্যাপক আলোচিত ও প্রশংসিত হয়। গ্রামের অতিশয় দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন মাজেদের ভালোবেসে ঘরবাধাঁর স্বপ্নভঙ্গের ইতিকথা 'শাহেরবানু' গল্পে বিধৃত হয়েছে। মাজেদ শাহের বানুকে ভালবাসলেও তার আর্থিক অসঙ্গতি সে ভালোবাসার পথে অন্তরায়। শাহেরবানু-মাজেদের ভালোবাসার মাঝে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয় আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল কাশেম খাঁ। ভেবেছিল একটু সময় ও সুযোগ পেলে জীবনটাকে গুছিয়ে নেবে ;

'আর্থিক অবস্থা কাশেমের তুলনায় তাহার একটু খারাপই। এবার এই আকালের বৎসরে সকলের ঘরেই অন্নবিস্তর টানাটানি চলিতেছে। এই রাজায় রাজায় যুদ্ধে উহার বিনাশ হইয়া থামুক, তারপর দেখা যাইবে কাশেম খাঁর চাইতে সুন্দর ঘর-সংসার জায়গা-জমি সে গুছাইতে পারে কিনা। জীবনের এখনো কতো বাকি; তাহার দুঃখের সংসারটাকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবে না সে।' পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এ রোমান্টিক ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পূর্বেই তার জীবনাবসান ঘটে। মাছ বিক্রির টাকা দিয়ে শাহেরবানুর জন্য শাড়ি কিনে দেবার চেষ্টা করেছিল মাজেদ। কিন্তু ঘটনাক্রমে হাশেম মোল্লার দোকানে উপস্থিত হয়ে মোল্লার অনুপস্থিতিতে হাতবাক্স থেকে টাকা চুরির মনস্থ করে সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় অনভ্যস্ত মাজেদ। মোল্লার আট বৎসরের মেয়ের চিৎকারে বুদ্ধি লোপ পায় মাজেদের। সে তাকে থামানোর জন্য ওজন করার 'লৌহগোলক' দিয়ে মেয়েটিকে আঘাত করে এবং তাতে মেয়েটি মারা যায়। পরে মাজেদ পুকুরে ঝাঁপ দেয় কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। মোল্লা লোহার ফলকওয়ালা কোচ দিয়ে মাজেদকে গেঁথে ফেলে। এভাবে গল্পের সমাপ্তি।

আর্থিক দিক দিয়ে নিম্ন এবং সহায় সম্বলহীন মাজেদের মনে কোনও পাপ না থাকলেও ঘটনাক্রমে খুনীতে রূপান্তরিত করে নিজেকে। শাহেরবানুকে একটি শাড়ি কিনে দিতে পারার ভাবনা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে সে অন্য সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। গল্পে এভাবেই নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের ব্যর্থতার এ বাস্তবরূপ দানে শামসুদ্দীন আবুল কালাম সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। গল্পের শেষ অংশটি আরও তাৎপর্যবহ –

'যে চক্ষু এই কিছুক্ষণ আগেও শাহেরবানুর স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহার একটা কোটরাগত এবং অন্যটা কোঁচের ফলার মাথায় বসিয়া যেন মাজেদেরই নিস্পন্দ দেহটার দিকে জিজ্ঞাসার মতো তাকাইয়া ছিল; এবং তাহারই গা বহিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত চুঁয়াইয়া পড়িতেছিল। – কাঁদিতেছিল কি ?' (পৃ-১৬)

'ইতিকথা' গল্পের হোসেন কোনরকমে খেয়ে-পড়ে থাকা নিম্নবর্গের মানুষ। যুদ্ধের বাজারে চালের দর চল্লিশে পৌছায়। স্ত্রী জরিনা তাই হোসেনকে বার বার ইঙ্গিত করে অনৈতিক কাজে যুক্ত হতে। গ্রামেরই আরেকজন করিম খাঁ-র (নিশাচর চোর) সচ্ছল, অবস্থার দৃষ্টান্ত দেয়। কিন্তু হোসেন সম্মত হয় না করিম খাঁর সঙ্গে যোগ দিতে। খোদার প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস হোসেনের মনোবল অটুট রাখে। কিন্তু জরিনা বাস্তবতা তুলে ধরে এভাবে –

'দুনিয়াতে বাঁচার কথা আগে, তারপর তোমার পাপপুণ্যের কথা কইও। মুখপোড়া খোদা থাক বা না থাক, (হোসেন চমকে উঠেছিলো) দেখছ না, না খাইয়া মরইয়া থাকলেও তার এতোটুকু আসবে যাইবে না। তোমার অমন ধর্মপ্রাণ মা চিকিৎসার অভাবে কী যন্ত্রণা পাইয়া মরইয়া গেলেন। গাঁয়ের কতোলোক কতো দুঃখকষ্টে ব্যারামে উজাড় হইয়া যাইতে আছে, তবু খোদাতালা কতোটুকু দয়াবৃষ্টি করলেন ?' (পৃ.১৮)

এই বেঁচে থাকার জন্যই শেষ পর্যন্ত হোসেন আপোষ করে অন্যায়ের সঙ্গে, যুক্ত হয় করিম খাঁর সঙ্গে। পাপপুণ্যের ভাবনা শেষ পর্যন্ত হোসেন বাধ্য হয়েই সরিয়ে রাখে একপাশে। চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয় জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য। অন্ধকার এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি।

'জোয়ারের টানে নৌকো তখন সামনে ভেসে চলেছে। আশেপাশে বেতঝোপ, হোগলাবন। চারিদিকে আলকাতরার মতো অন্ধকার। অন্ধকার যেন হোসেনের মাথার মধ্যেও।' (পৃ. ৩০)

শামসুদ্দীন আবুল কালামের বিখ্যাত ছোটগল্প *জাহাজঘাটের কুলি*। বরিশাল থেকে ঢাকা যাবার প্রাক্কালে স্টিমারে বসেই এ গল্প লিখেছিলেন তিনি, যা পরবর্তীকালে ব্যাপক সমাদৃত হয়। গল্পে কুলিদের কথাই তিনি লিখেছেন। তাদের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-হতাশার ছবি অঙ্কন করেছেন। লেখকের বাড়ি বরিশাল বিধায় প্রায়ই তাঁকে স্টিমারে যাতায়াত করতে হতো, আর সে সুবাদে কুলিদের জীবন-যাপন পদ্ধতি তাঁর নখদর্পদনে ছিল। *জাহাজঘাটের কুলি* শামসুদ্দীন আবুল কালামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল।

নিম্নবর্গের অন্যতম প্রতিনিধি কুলিদের নিয়ে তাঁর এ ছোটগল্প বাস্তব অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছে। ঐ সময় বৃটিশদের আর. এস. এস. এবং আই জি হেড অফিস ছিল বরিশালেই। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন স্টিমার বরিশাল আসত। প্রত্যেহ হাজার হাজার যাত্রী বরিশাল স্টেশনে উঠানামা করত। তখনকার দিনে কুলিরা লাল শার্ট গায়ে দিয়ে মাথায় গামছা বেঁধে হাতে লোহার নম্বর দিয়ে যাত্রীদের মালামাল উঠানামা করত। তাই দেখেই শামসুদ্দীন আবুল কালাম লিখলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প *জাহাজঘাটের কুলি*। রেজিস্টার্ড কুলি ছাড়াও ঘাটে অনেক কুলি থাকত। যদিও তাদের মাল উঠা নামাতে নিষেধাজ্ঞা ছিল তবুও তারা বেঁচে থাকার তাগিদে এ কাজ করত। তেমনি একজন অচিহ্নিত কুলি শফিক। যার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন একটি নম্বর হাতে লাগিয়ে বৈধ হওয়া । শফিকের কল্পনায় তার বহু আরাধ্য বিষয়টি উঠে এসেছে এভাবে –

'ছেলেবেলায় গল্প শুনেছে নদীর গর্ভে ঐশ্বর্যের অন্ত নেই; স্মরণাতীতকাল থেকে কতো নিমজ্জিত ধনসম্পদ ওর মাঝে সঞ্চিত হয়ে আছে, তলায় পৌঁছে আজ পর্যন্ত কেউ তার নাগাল পায়নি। শফিকের মনে হলো, সে অতি নিচে বহুদূর নদীর তলায় চলে গেছে, যেখানে স্রোত নেই, কাদা নেই, চারদিকে ধবধবে নরম বালি। আর তারই ওপরে – ও কি! – ছড়িয়ে আছে অপূর্ব দ্যুতিময় কতো নাম- না- জানা জিনিস, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে ভেবে সে অস্থির হয়ে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ সে দেখে সেই নাম-না- জানা জিনিসগুলো আর কিছুই নয়, অজস্র কোম্পানীর 'পাস'। হ্যাঁ, পাসই বটে, তেমনি লম্বাটে গোল কোম্পানীর লেখা নম্বর দেওয়া লোহার পাস। ব্যাকুল আনন্দে তারই একখানা নিয়ে সে উপরে উঠছে।' (পৃ.. ৪১)

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্নে 'পাস' পেলেও বাস্তবে তা অধরাই রয়ে যায় শফিকের। বরং পাসওয়ালা কুলিদের অবিচার-অত্যাচারে নাভিশ্বাস উঠে। ঘটনাক্রমে শফিক এক যাত্রীর ডুবন্ত শিশুকে জীবনবাজি রেখে উদ্ধার করে। সকলেই এ ঘটনার সুখ্যাতি করে। সুযোগ আসে একটা পাস পাবার। কিন্তু শফিক একা পাস পাবার কথা ভাবতে পারে না। বিশেষ করে তার সহচর নিতাই, ইয়াসিনের কথা তার এ সময়ে মনে পড়ে। ফলে বৃহত্তর মঙ্গলের চিন্তায় এখানেই সে তার স্বার্থচিন্তা বাদ দেয়। ভাবে ক্ষমতাবান মানুষগুলো কি সব ছন্নছাড়াদের ভাগ্য বদলে দিতে পারে না ?

কেরায়া নায়ের মাঝি গল্পে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম গ্রামীণ নিম্নবর্গ কিভাবে অভাবস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র আজাহার কেরায়া নৌকা বেয়ে স্ত্রী জমিলা এবং দুই পুত্রকে নিয়ে বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে দিন কাটায়। আমাশয়ে ভুগে কয়েকদিন সে 'নৌকা বায়তে' পারেনি। উপোস দিতে হয় পরিবারের সদস্যদের। তাই স্ত্রী জমিলা আজাহারকে কিছু গালিগালাজ করে। ছেলেমেয়েদের ক্ষুধার্ত মুখ, স্ত্রীর ভর্ৎসনা আজাহারকে তার কর্তব্য সম্পর্কে অধিক সচেতন করে তোলে। অসুস্থতার কথা ভুলে কেরায়া নাও নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে চাল-ডালের সংস্থানে। চাল-ডালের সংস্থান করেও সে । কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত আসার পূর্বে নৌকাতেই তার করুণ মুত্যু হয়। জীবন দিয়ে পিতৃকর্তব্য পালনের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আজাহার মাঝি–

'রাগ করেনি আজাহার; পিতৃত্বের কর্তব্য করেছে তার – জনকের দায়িত্ব। তার মৃতদেহের আশে পাশেই রয়েছে চাল, ডাল এবং আরো নানা সওদা। আর আশ্চর্য, চালের সাজিটার উপর কচি কচি দুটি শশাও।' (পৃ. ৬১)

পৌষ গল্পে গ্রামীণ নিম্নবর্ণ কিভাবে মহাজনশ্রেণী কর্তৃক শোষিত হয় তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পৌষ মাস বাঙালি কৃষকের জন্য বহুল কাঙ্ক্ষিত মাস। কেননা এ সময় তাদের আরাধ্য ফসল ঘরে উঠে। আবার উল্টোচিত্রও আছে, আর তা হচ্ছে এ সময় মহাজনশ্রেণীও সচল হয় তাদের আসল ও সুদ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেয়ার জন্য। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর *পৌষ* গল্পে এরকম একটি চিত্রই অঙ্কন করেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তাজু মহাজন হলধর চক্রবর্তীর নিকট হতে তিরিশটি টাকা ধার করেছিল কার্তিক মাসে। আর এ কর্জ কিভাবে তার জীবনে করুণ পরিণতি ঢেকে এনেছে তারই বিবরণ আছে এ গল্পে। লেখক এ গল্পে সমাজবাস্তবতার দিকটি উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। গল্পটি শেষ হয়েছে মহাজনশ্রেণীর দয়াহীনতা শেষ হবার আশাবাদের মধ্য দিয়ে। এবার হয়তো ভিটেমাটি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাসেরও সুযোগ দিল হলধর চক্রবর্তীকে। তাদেরই এখন পৌষ মাস। পৌষলক্ষ্মীর প্রসাদে সকলেই আপন আপন সাজি ধরতে ব্যস্ত। এতোটুকু দয়ামায়া, সহানুভূতি নাই তাদের চিত্তে।

'শেষ হউক, হে ঈশ্বর, শেষ হউক এই দয়াহীনতার' (পৃ. ৭২)

শেষপ্রহর গল্পে *ইতিকথা* গল্পের সুর বিদ্যমান। এ গল্পের হোসেন ধুমধাম করে রাবেয়াকে বিবাহ করেছিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই শ্বশুরের মৃত্যু হলে শ্বশুরবাড়ির দায়িত্ব এবং নিজ সংসার দুয়ের মাঝে পড়ে পিষ্ট হয় হোসেন। শুরু হয় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী হাজী সাহেবের মৃত্যু হলে হোসেন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ সময় স্ত্রী রাবেয়া হোসেন ইয়াকুবের (চৌর্যবৃত্তি যার পেশা) স্বাচ্ছন্দ্যকে ইঙ্গিত করলে হোসেন উত্তেজিত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত হোসেন চুরি করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে বিছানা নেয়। স্ত্রী ছেড়ে চলে যায় হোসেনকে। বিছানায় শুয়ে থাকতে হোসেনের উপলব্ধি নিম্নরূপ –

'পৃথিবীতে আর কাহাকেও বিশ্বাস নাই। সকলেই আপন স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। যাহাদের তুমি অতি আপনজন মনে কর, তাহারাও নিজের প্রয়োজনে তোমার জন্য মুহূর্তেকও না ভাবিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে। সারা দুনিয়াটাই হারামীতে ভরা। নির্জন ঘরে পরিত্যক্ত অবস্থায় অসহ্য রোগযন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত না পাইয়া হোসেন এই নিষ্ঠুর সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছে।' (পৃ. ৭৩)

মূলধন গল্পে দরিদ্র কৃষক মেনাজের স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা আবর্তিত হয়েছে তার একমাত্র গৃহপালিত প্রাণী 'মনু'কে ঘিরে। মেনাজ মনুকে আপন সন্তানের ন্যায় ভালবাসে, লালন-পালন করে। মনুর প্রতি সামান্য অবহেলা সে সহ্য করতে পারে না। এ জন্য নিজ স্ত্রীকে পর্যন্ত বকা-ঝকা করে সামান্য গাফলতির কারণে। মেনাজ তার সন্তানের মতো। তাছাড়া এই মনুর কল্যাণেই মেনাজের সংসার সচল রয়েছে – এ কথা সে তার স্ত্রী-পুত্রকে বারবার শ্মরণ করিয়ে দেয়।

'আশ্বিনের শেষের দিকে দুবেলা দুমুঠো জোটাতেই যখন প্রাণান্ত অবস্থা, সে সময় দৈনিক দেড়সের দুধ দিয়ে ঐ গাইটাই তাদের বাঁচিয়েছিলো– আদর করে মেনাজ যার নাম দিয়েছে মনু। ওরি কল্যাণে কিছু তবু খেতে মিলেছিলো, তা-নাহলে বহুজনের মতো তাকেও শহরের পথে বেড়িয়ে পড়তে হোতো দুমুঠো খাবার খুঁটে বাঁচতে।' (পৃ. ৯৫)

কিন্তু 'আষাঢ়ের শেষ দিকে গোমড়ক' লাগলে মেনাজ অস্থির, চঞ্চল হয়ে উঠে। কিন্তু এই দরিদ্র কৃষক তেমন কিছুই করতে পারে না। মনুর প্রতি আরও সতর্ক হয়ে উঠে সে। ছেলে, স্ত্রী এদের সাথে সামান্যতেই রাগারাগি করে মেনাজ মনুর প্রতি অবহেলার অজুহাতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নবর্গের মেনাজ বাঁচার একমাত্র অবলম্বন হারানোর আশঙ্কায় পাগলপ্রায়। প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়তার অসাধারণ এক চিত্র এ গল্পের শেষে বিধৃত হয়েছে চমৎকারভাবে-

'অকস্মাৎ সে মনুর গলা জড়িয়ে হাই মাউ করে কেঁদে উঠলো। ইচ্ছা করে দুনিয়ার মানুষকে ডেকে বলে-দেখ এসে কী নিদারুণ মৃত্যু! পশু, সামান্য একটা পশুর মৃত্যু আরো মৃত্যু-তমসার কী উত্তাল ঢেউ নিয়ে ছুটে আসছে। ওগো মানুষ, তাকে প্রতিরোধ করে আমার জীবনদাত্রীকে বাঁচাও। জীবনমূল থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে দিও না।' (পৃ-১০৯)

'মুক্তি' গল্পে হতদরিদ্র চেরাগ আলি স্ত্রী জয়তুনকে টাকার বিনিময়ে অন্যের হাতে বিক্রি করে মুক্তি খোঁজে। পেটপুরে খেয়ে থাকার স্বপ্ন দ্যাখে চেরাগ আলি। স্ত্রীকে বিক্রি করে বাড়ি ফিরে ভাবে, 'থাক, এবারে মিলেছে মুক্তি। মিলেছে নিঃস্বতা থেকে প্রাচুর্যে যাবার পথ। দুর্ভাগ্যকে দমনের পুঁজি।' কিন্তু এভাবে মুক্তি কি মিলে ?

'শাহের বানু' গ্রন্থের *জোর যার* গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালাম দক্ষিণ-বাংলার অতিপরিচিত একটি প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। আর তা হচ্ছে নদী-ভাঙন। নদী ক্রমান্বয়ে ভাঙতে শুরু করেছিল। আর পাঁচ সাত হাত বাকি ছিল, তা ভাঙনেই মরিয়মদের বাড়ি ভেঙে যাবে। মরিয়মের পিতা রহমালি বহু কষ্ট করে যে ক্ষেতে ফসল করছিল তা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। এখন বাকি শুধু ঘর-ভিটা। পাশের গ্রামের কাজেম আলী বড় জোতদার। সে এক সময় মরিয়মকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল। মরিয়মের পিতা রহমালি কাজেম আলীর এ প্রস্তাবে রাজী হয়নি। কেননা এটা ছিল কাজেম আলীর দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব। সতীনের ঘরে বিয়ে দিবে না বলে মরিয়মের পিতা সে প্রস্তাব নামঞ্জুর করে । এছাড়াও দুই পরিবারের মধ্যে একটা শত্রুতাও ছিল দীর্ঘদিন ধরে। এরপরও কাজেম আলী মরিয়মকে বিয়ে করবে বলে প্রতীক্ষা করেছে। 'জোর যার মুলুক তার' এ প্রবাদের মতোই কাজেম আলী মরিয়মকে করায়ত্ত করে। অপরদিকে মরিয়ম ফজুকে পছন্দ করতো, ফজুও তাকে ভালো বাসতো। কিন্তু ফজু নিম্নবর্গের প্রতিনিধি। তার আর্থিক অসঙ্গতি তার ভালোবাসাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। তবু তার মনে আশা ছিল মরিয়মের সমর্থন পেলে হয়তো সে পারিপার্শ্বিক অভাব-অনটন জয় করতে পারবে –

'তোমাকে আমার চাইই মরিয়ম । জানি আমি অতি দরিদ্র, আমার ঘরে, তোমাকে নেবার মতো অবস্থা আমার নাই, জানি আমার জীবিকারও কোনো সংস্থান নাই, কিন্তু তুমি যদি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াও, তবে এই নিষ্ঠুর উদাসীন পৃথিবীকে আমি ভয় করিব না। ভয় করিব না দুঃখের শত সহস্র ছোবলকেও –

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে পাশে লইয়া, তোমার হাতে হাত বাঁধিয়া লইয়া আমি সকল দুঃখকে জয় করিয়া লইব। তুমি আমাকে ভরসা দিও, আশা দিও – '(পৃ-১৩৫)।

কিন্তু হঠাৎ একদিন নদীর ভাঙনে পিতা-মাতা এবং ছোট ভাই সবাই পানিতে ভেসে গেল, শুধু বাঁচলো মরিয়ম। ঘুমন্ত অবস্থায় রাতে নদীর পানি হঠাৎ বেড়ে ঘর বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মরিয়ম সব কিছু হারিয়ে যেন নিঃস্ব হয়ে পড়ে। শামসুদ্দীন আবুল কালাম নদী ভাঙনের করুণ ছবি মর্মস্পর্শী ভাষায় এ গল্পে অঙ্কন করেছেন। নদী যেমন পিতার বাড়িঘর, ফসলের মাঠ, সংসারজীবন সবকিছু গ্রাস করেছে তেমনি কাজেম আলীও (উচ্চবর্গ বিশেষ করে আর্থিক দিক থেকে সঙ্গতিপূর্ণ) মরিয়মের অসহায়ত্বের সুযোগে তার প্রেম-পছন্দ - অভিলাষ সবকিছু কুক্ষিগত করেছে জোর করে। গল্পে নদীর কদর্য ও ভয়ংকর চিত্র কিভাবে মানুষের উদগ্র কামনার মধ্যে প্রতিবাসিত হয় তা লেখক বিবৃত করেছেন, পাশাপাশি দেখিয়েছেন নিম্নবর্গের প্রেম-ভালোবাসা কিভাবে উচ্চবর্গের আর্থিক অবস্থার কাছে পরাজিত হয়।

উপন্যাসের মতো শামসুদ্দীন আবুল কালাম ছোটগল্পেও নদী ভাঙনে ছিন্নমূল মানুষের ইতিকথা, ভাগ্যাহত মানবজীবনের করুণচিত্র *ভাঙ্গন* গল্পে অঙ্কন করার প্রয়াস পেয়েছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদী ভাঙ্গন খুবই স্বাভাবিক চিত্র, কিন্তু নদী ভাঙনের অন্তরালে মানুষের যে কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ হয় তা অনেকেরই অজানা। *ভাঙন* গল্পে হতভাগ্য সেসব মানুষের করুণ ছবিই আকঁতে চেষ্টা করেছেন লেখক। 'ছোট গঞ্জ। এককালে বড় বন্দর ছিল। আজ পাশের পূবে-পশ্চিমে দীঘল নদীর দূরন্ত খাবলে খাবলে ভেঙে ভেঙে খর্বায়তনা; অধিকাংশই নদীর গর্ভে লুপ্ত।' তবুও পাশে আছে থানা, স্কুল, সাবরেজিস্ট্রি অফিস, নানা মহাজনের আড়ত ইত্যাদি ইত্যাদি। না গ্রাম না শহর। ভাঙা, ছাড়াছাড়া। পাশে ছিল তারিনীখুঁড়ার চায়ের দোকান। জাহাজ, স্টিমার ইত্যাদির সংখ্যাও কমে গেছে। যাত্রীদের উঠা নামাও কমে গেছে। চারিদিকে ভাঙন আর ভাঙন।

আজিউল্লার পুত্র আনোয়ার এসকেন্দারের বারো বছরের কন্যা ময়নাকে ভালোবাসত। একদিন আলিঙ্গনরত অবস্থায় ময়নার ছোটভাই তাদের দেখে ফেললে ময়না চিৎকার করে কেঁদে উঠে। কথাটা দ্রুত পিতা আজিউল্লার কানে গেলে আনোয়ার পিতার মুখোমুখি না হয়ে ভয়ে সে রাতেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে সে যোগ দেয় মিলিটারিতে এবং বহু দেশ ঘুরে আড়াই বছর পর দেশে ফিরে। সেই বন্দরে তারিনীখুঁড়ার দোকানে বসে এবং পরিচয় দেয়। তারিনীর কাছে বাড়ির খবর জানতে চাইলে সে এড়িয়ে যায়। বন্দর হতে আনোয়ার দুই বোন ও পিতা-মাতার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

কাপড় কিনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বাড়িতে গিয়ে দেখে নদী ভাঙনে সবই শেষ। তারিনী তা জানত, কিন্তু ইচ্ছে করেই বলেনি। আনোয়ারের মনোজগতে তখন তোলপাড় এবং ভাঙন। লেখক গল্প শেষে আনোয়ারের মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করেছেন আবারও সেই প্রকৃতির ভাঙনের মধ্য দিয়েই –

'ভাঙা বন্দরের ভুতুড়ে দেহের উপর বিকেলের ছায়া নেমে এসেছে তখন। গাঙের বুকে ভাঙা বেলার রাঙা আলোর ঝলমলানি। পাড় ভাঙে – ঝুপ-ঝুপ।' (পৃ-১৬০)।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্পভুবন গড়ে উঠেছে মানবমনের বিচিত্র অনুভূতি ও নানারকম খেয়াল প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তাছাড়া মানুষের মানবীয় গুণাবলীর সদর্থক ও নঞর্থকদিকও কোনো কোনো গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রামীণ নিম্নবর্গের সুকুমার বৃত্তিগুলোর মধ্যে প্রেম, স্বজাত্যবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, মমত্ববোধ, সহানুভূতি, কল্যাণবোধ এবং হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা প্রতিশোধস্পৃহা প্রভৃতির চিত্রায়ণ শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। নিম্নবর্গের প্রেম ও প্রেমঘটিত নানা অনুষঙ্গ তার গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে।

অনেক দিনের আশা গল্পে নিম্নবর্গের একপেশে ভালোবাসার ছবিটি স্পষ্ট হয়েছে। 'অতি ছোটকাল থেকেই জানাশোনা' ফুলজান ও আয়নদ্দির। একসাথে লাফালাফি, মারামারি, মাছধরাধরি, জামরুল কাড়াকাড়ি করে ওদের দিন কেটেছে।কিন্তু ফুলজানকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দেয়া হয়। আর কালক্রমে আয়নদ্দি হয়ে যায় দাগী চোর। কিন্তু গ্রামে একমাত্র আশ্রয় তার ফুলজান। বিধবা ফুলজান তাকে সৎপথে আনার চেষ্টা চালায়। ফুলজানের অনেক দিনের আশা যদি আয়নদ্দি ভাল হয়ে যায় তবে তাকে নিয়ে সে নতুনভাবে জীবনটা শুরু করবে। এদিকে চুরির অপরাধে থানার দারোগা খোঁজে আয়নদ্দিকে। দারোগার হাত ধরে আয়নদ্দিকে বাঁচানোর জন্য ফুলজান আয়নদ্দির পরামর্শে গ্রামের বড়ো মিয়ার কাছে যায় এবং দেহ দিয়ে বড়ো মিয়া ও দারোগাকে তুষ্ট করে আয়নদ্দির ভবিষ্যত নিশ্চিত করে আসে।

'ফিরতে অনেক রাত্রি হয়। এতোকাল ধরে সংরক্ষিত ধন সে আজ বিলিয়ে দিয়ে নব-জীবনের ভিৎপত্তন করে এসেছে। আয়নদ্দি নিরাপদ। আর তার কোনো শংকা নেই। চোর হয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না।' (পৃ-১৩৪)।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এসে দেখে আয়নদ্দি অল্প বয়সী একটি মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ফুলজানের বাড়িতে হাসিগল্পে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ফুলজানের সমস্ত স্বপ্নের সমাধি ঘটে। নিম্নবর্গের মানুষের সাধারণ মনস্তত্ত্বের এ দিকটি গল্পকার অসাধারণ দক্ষতায় এ গল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পে নিম্নবর্গের আশা-আকাক্ষা ও প্রেম-বিরহের এই পালাবদল লেখক নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে শামসুদ্দীন আবুল কালামের স্পষ্ট ধারণা ছিল। গ্রামের সন্তান হিসেবে তিনি এ ব্যবস্থাকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। গ্রামের পরিচিত চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্ষুধা, অভাব, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র-যা তাঁর লেখাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। আবার মহাজনশ্রেণীর শাসন, শোষণ ও আগ্রাসনের ছবিও তিনি অঙ্কন করেছেন। *পৌষস্বপ্ন* গল্পে গ্রামীণ মহাজনশ্রেনীর প্রতিনিধি মালিকের অনাচারের বীভৎস রূপ প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামে অন্নসংস্থান করতে না পেরে স্বামীর হাত ধরে শহরে যায় মকু। কিন্তু সেখানেও কোনও আশার আলো দেখতে না পেয়ে গ্রামেই ফিরে আসে। অভাব-অনটনে ইতোমধ্যে মকুর স্বামীর মৃত্যু ঘটে। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে জোতদার মালেক মকুর বসতভিটা দখল করে। এবার মালেকের নজর পড়ে বিধবা মকুর উপর। মকু নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় মালেকের লোলুপ দৃষ্টির ছোবল হতে। 'যে সমুধুর পৌষ কল্পনায় সে গাঁয়ের পথে ছুটিয়া আসিয়াছে তাহা সব মিথ্যা হইয়া গেছে। শহরের রুক্ষ জীবন, ধূলিধোঁয়া মলিন আকাশ তাহাকে বারবার গাঁয়ের নির্মল সোনালি পৌষের কথা মনে করাইয়া যে আত্মীয়তার আকর্ষণে গাঁয়ের পথে টানিয়া আনিয়াছে তাহার মূলে এতোটুকু সত্য নাই।' (পৃ-৩৭)

কলাবতী গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালামের আরোধ্য বিষয় প্রেম হলেও হিন্দু-মুসলিম সর্ম্পকের একটি ভিন্ন মাত্রাও উম্মোচন করেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য খ্যাত এ অঞ্চলে ইংরেজের শাসনামলে এ সম্পর্কে চিড় ধরে। গল্পে আমরা পাই মুসলিম পরিবারের স্বচ্ছল কিন্তু অভিভাবকহীন মজিদের সঙ্গে হিন্দু পরিবারের সুরেনের অপূর্ব সুন্দরী কন্যা কলাবতীর আবাল্য পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগে প্রেম, আর সে সূত্রে সুযোগসন্ধানী একটি গোষ্ঠী কিভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দুটো পরিবারকে নিঃস্ব করে সব কিছু নিজেদের করে নেয়ার অসাধারণ কাহিনী। এ গল্পে লেখক স্পষ্ট করে বলেছেন যে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা আসলেই পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়। এর পেছনে দুই দিকেরই কিছু মানুষের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার বাসনা ক্রিয়াশীল থাকে। এ গল্পে গ্রামের মাতবর বৃন্দাবন চক্রবর্তী ও মজিদের সম্পত্তিলোভী আত্মীয়-স্বজনদের লালসার আগুনে পুড়লো মজিদ ও কলাবতী, সুরেনের সংসার। দাঙ্গার সময় মজিদ খুন হলো। কলাবতীর পিতা মজিদকে

Dhaka University Institutional Repository

আপন সন্তানের মতোই ভালবাসতো, এ খুনে সে এতটাই কষ্ট পেল যে নিজে এর দায়ভার স্বীকার করে জেলে গেল। এদিকে কলাবতী রূপান্তরিত হতে বাধ্য হল অন্যের ভোগের সামগ্রীতে। লেখক সে দিকটি ইঙ্গিত করেছেন গল্পের অন্তে – 'শুধু কলাবতী নয় এমনি ভুলে ভুলে হারায় এর চাইতেও দামি আরো অনেক সম্পদ কিন্তু অনুতাপে খানিকটা কাঁদলেই কী প্রায়শ্চিত্ত হবে তার।' পৃ-৫৮)

আসা যাওয়ার কথা গল্পে গ্রামীণ নিম্নবর্গের যুবক সাদেক ও গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর যুবতী রাবেয়ার প্রেম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রাবেয়ার ভাই অবস্থাসম্পন্ন কৃষক হাশেম খাঁ মৌন সম্মতিও এপ্রেমে ছিল কিন্তু বাধ সাধে নিয়তি। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে সাদেক শয্যাশায়ী হয়। গ্রামের সকলের আপত্তির মুখে পিতৃহীন সাদেককে কাসেম খাঁ নিজ বাড়িতে রেখে সেবা শুশ্রূষা করে। এর ফলে সবাই কাশেম খাঁকে বয়কট করে বা বলা যায় রোগাক্রান্ত হবার ভয়ে এড়িয়ে চলে। কাসেম খাঁ ফসল কাটার মৌসুমে লোকবলের সংকটে পতিত হয়। 'অবশেষে সবদিক ভেবেচিন্তে সাদেককে বাড়ীতে রেখে আসাই স্থির করে' কাসেম খাঁ। নৌকা করে যাবার পথে রাবেয়ার আবেগ দেখে সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে কিন্তু ততক্ষণে সাদেক পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অন্য জগতে চলে যায়। মর্মস্পর্শী ভাষায় এ গল্পে বর্ণিত হয়েছে গ্রামীণ যুবক-যবতীর করুণ প্রেমকাহিনী।

হঠাৎ গল্পে সাংসারিক অসচ্ছলতা কিভাবে মানুষের প্রেম-ভালোবাসা প্রিয়জন, স্বপ্ন, আকাক্ষাকে দূরে সরিয়ে দিতে বাধ্য করে লেখক সে দিকটিই স্পষ্ট করে তুলেছেন। রতন ও কুলসুমের ভালোবাসাও এভাবে ছিন্নভিন্ন হয় বাস্তব অবস্থার কারণে। 'এই আকাল ছিন্নভিন্ন করেছে সংসার, কেড়ে নিয়ে গেছে আত্মীয়স্বজন, দুঃখ-কষ্টে ভরে তুলে দুর্বিসহ করেছে জীবন, এমন কী হৃদয়ো তার চাপে চুরমার! এদিনে না মূল্য আছে জীবনের, না ভালোবাসার।' (পৃ-৮৩)

দুর্যোগ গল্পে গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারীরা কিরূপ নিগ্রহ ও নির্যাতনের শিকার হন সে বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাঞ্চনমালা অসুস্থ স্বামীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অবিচল প্রতীক। ঘটনাক্রমে গ্রামেরই প্রভাবশালী সুন্দর মিঞার অসুন্দর নজর পড়ে কাঞ্চনের উপর। রহমানকে দিয়ে সে কু-প্রস্তাব পাঠায় কাঞ্চনের কাছে বিনিময়ে স্বামীর চিকিৎসা, খাওয়া-পড়া তথা নিশ্চিত নিরাপদ জীবনের আশ্বাস। কাঞ্চন কিছু বুঝে উঠার আগেই সুন্দরের লোকেরা ঝরবৃষ্টির রাতে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যায়। গল্পে গ্রামীণ নিম্নবর্গের অসহায় নারীদের

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তাহীনতার চিরন্তন ছবিটি অঙ্কিত হয়েছে। প্রভাবশালীদের দাপটের বা ক্ষমতার কাছে এদের কিছুই করার থাকে না, হয়ে পড়ে নিতান্তই অসহায়–

'অসহায় হয়ে পড়ে রইলো কাঞ্চনমালা। ঝরবাদল চিরদিন থাকবে না। সাধ্যমত সুন্দর মিঞা খুঁজুক আজ তার দেহে দুনিয়ার তৃপ্তি; নর্মশ্রান্ত হয়ে ঘুমাক। তারপর জাগবে কাঞ্চন। দেশলাই-এর একটি কাঠিতে এই অন্যায়ের পুরীতে আগুন জ্বেলে বাইরে যেয়ে দুনিয়ার লোককে ডেকে বলবে-দেখো আমাকে। বলো আমি কী করতে পারতাম।' (পৃ-১০৯)।

নিম্নবর্গের নারীর ভালোবাসা 'ছোটজাত' হওয়ার অপরাধে কিভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় *ক্ষুধা* গল্পে তারই বিবরণ রয়েছে। গল্পটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের ছোট গল্প ১ম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমেনা ও হাশেম ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছে। শৈশবে তারা বনে বাদাড়ে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াতো। হাশেমের বাবা ছেলের জন্য বড়ো ঘরের কোনো মেয়েকে পুত্রবধু হিসেবে দেখতে চান। হাশেমের মা যখন আমেনার কথা বলে তখন সে বলে–'ঐ চেহারার মাইয়াডা ঘরে আনমু ? জানো ওরা কতো ছোটো জাত ?' (পৃ-১১৫)। আমেনার অন্যত্র বিয়ে হয়। কিন্তু অভাব-অনটনে বিপর্যস্ত হয় তার সংসার। স্বামী পুত্র হারিয়ে ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে আমেনা এখন পরের ঘরে ধান ভানে। আমেনার মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা যা হারিয়ে গেছে জীবন থেকে–

'সেই একই ক্ষেত-সেই মাটীর ফাটল এখনো আছে, সেই খেজুর গাছ, সেই কাদামাখা ধান, ইদুরের গর্ত সবই আছে-সব। সেই রৌদ্রে ঝিলিমিলি গ্রাম, বলাকার দল, ঘুঘুর কান্না, নাই কেবল সেই দিনগুলি !' (পৃ-১১৭)।

বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের মানুষের সমাজসমস্যার দিকগুলো শামসুদ্দীন আবুল কালাম তার ছোটগল্পে বারংবার তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবনের বিপর্যয় আর ধ্বংসের ছবি এঁকেছেন তিনি। এদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গ চিরকালই নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। তাদের সাধ, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম সবকিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর্থিক দিক থেকে নিম্নস্থ বলে তাদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ও নাগালের বাইরে থেকে যায়, কখনও কখনও নাগালের বাইরে চলে যায়। শামসুদ্দীন আবুল কালাম এ সব বাস্তবচিত্রই তার ছোটগল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। *বন্যা* গল্পে কৃষিজীবী পরিবারের গ্রামীণ নিম্নবর্গের প্রতিনিধি মধু ভালোবাসে হেমকে। আর্থিক অসঙ্গতি মধুর

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমকে ব্যর্থ করে দেয়। আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ লস্কর বাড়ির বড় ছেলের প্রেমাসক্ত হয় হেম, যা মধুকে হতাশ করে। নিম্নবর্গের মধুর প্রেম পরাজিত হয় মধ্যশ্রেণীর মনসুরের কাছে। 'বাজারের মেয়েদের মতো পয়সাওয়ালার দিকেই ঝুকিয়া' পড়ায় হেমের প্রতি মধুর ভালবাসা ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়। এক সময় মধু প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে। হেমকে অথৈ জলে ডুবিয়ে মধু হেমের বিশ্বাসহীনতা ও 'ছিনালী'র 'দাদ' নেয় ।'

আর্থিক সঙ্কটতাড়িত গ্রামীণ নিম্নবর্গের পারিবারিকজীবন-বিচ্ছিন্নতার চিত্র *বজ্র* গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। পরিবারবিচ্ছিন হয়ে কামরুন্নেসা অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আদিম পেশা গ্রহণে বাধ্য হয়। যুদ্ধফেরত আনোয়ার মা-বোনের সন্ধান করে। স্বগ্রাম থেকে আনোয়ারের আড়াই বছরের অনুপস্থিতিতে, দুর্যোগের হাহাকারের মধ্যে তার মা-বোন হারিয়ে গেছে। হারানো মা-বোনের সন্ধান করতে গিয়ে আনোয়ার ঘনটাক্রমে বোন কামরুন্নেসা ওরফে রূপসীর অতিথি হয়। ভোরে ঘুম ভেঙ্গে আনোয়ার মুখোমুখি হয় এক বজ্রকঠিন সত্যের।

সরজমিন গল্পে লেখক গ্রামীণ নিম্নবর্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়কার প্রকৃত অবস্থা নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। কাহিনীর বর্ণনাকারী রিলিফ ওয়ার্কের সূত্রে গ্রামীণ এসব ভুখানাঙ্গা মানুষের বাস্তবচিত্র দর্শন করে প্রেমিকা মিতার কাছে বর্ণনা করে। বন্যায় বিপর্যস্ত গ্রামীণ জনপদ। মানুষ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে লতাপাতা, শাক-সবজি এমনকি না খেয়ে দিন কাটায়। একটা ছেলে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অস্থির হয়ে পড়ে ছিল। ছেলেটিকে এক সময় কিছু শশা কেটে লবন দিয়ে দেওয়া হয়। প্লেটটা নিয়ে শশাগুলো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেয়ে নিলেও উপবাসী পেটে তা সহ্য হয় না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বমির সঙ্গে শশাগুলো বেরিয়ে আসে। তখন কাছেই উপস্থিত এক বৃদ্ধ সেগুলো ভালো করে ধুয়ে লবন দিয়ে মেখে খেয়ে ফেলে। এ দৃশ্য দর্শনে রিলিফ ওয়ার্ক টিমের এক সদস্য মর্মাহত হয়ে পড়ে। গল্পে আরো একটি পরিবারের করুণ পরিণতির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রান্তিক বর্গাচাষী বৃদ্ধ লালু খাঁ যার উৎপাদিত ফসলের বেশির ভাগ চলে যায় জমিদারের গোলায়। লালু খাঁ ছয়মাস নিজের ঘরের ভাত খেতে পায়, আর বাকি ছয়মাস লতা-পাতা, কলমিশাক ইত্যাদি খেয়ে দিন কাটায়। একদিন তার স্ত্রী জোবেদা বাচ্চাদের ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের জন্য বিলে যায় কলমি শাক তোলার জন্য। সেখান থেকে সে আর ফিরে আসেনি। ক্ষুধার যন্ত্রণায় মাথা ঘুরে পানিতে পড়ে মারা যায়। এভাবে শামসুদ্দীন আবুল কালাম গ্রামীণ নিম্নবর্গের করুণ কাহিনী এ গল্পে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাগ গল্পে প্রেমিকাকে পাবার উদ্দেশ্যে সুন্দরলালের নৈতিক বিচ্যুতি ও ভানুমতীর দৃঢ় আদর্শিক দিক পরিস্ফুটিত হয়েছে। নিম্নবর্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সুন্দরলাল ও ভানুমতী। তারা পরস্পরকে ভালবাসে। এদিকে ভানুমতীর মা-বাবা যথাক্রমে স্বরসতী ও রামজনম দু'জনে মিলে মেয়েকে দোজবরে অবস্থাসম্পন্ন পাত্রের কাছে ভানুমতীকে সম্প্রদান করতে চায়। সুন্দরলাল সব শুনে অর্থ উপার্জনের জন্য বেরিয়ে পড়ে। একমাসের মধ্যে বিপুল অর্থ (দশ হাজার টাকা) সংগ্রহ করে সে গ্রামে ফিরে আসে। দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সুন্দরলাল এ অর্থ লুঠ করে। সব জেনে ভানুমতী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে সুন্দরলালকে। গল্পে লেখকের অসাম্প্রদায়িক চেতনাও প্রকাশিত হয়েছে।

'ভানুমতী কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালোঃ শিউরপরসাদের মতো অমনি কাজ করেছো তুমি? মুসলমান যে তোমার পাশের বাড়ির মানুষ, তোমার ভাই, তাকে হত্যা করেছো তুমি ?- ভানুমতী উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো।

...

অকস্মাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে এলোমেলো পায়ে ঘরের দিকে ছুটে গেল ভানুমতী।' (পৃ-১৮০)

শামসুদ্দীন আবুল কালাম গ্রামীণ জীবনের সুখ, স্বস্তি, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, ক্ষয় ও বঞ্চনাকে পাঠকের সামনে নানা বিপ্রতীপ অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। গ্রামীণ জীবন বিশেষ করে সেখানকার নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। পাশাপাশি শহরের জীবনও কখনও কখনও তার রচনায় স্থান পেয়েছে, তবে সেখানে তাঁর লক্ষ্য ছিল একই অর্থাৎ শহুরে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণী। তবে শহরের তুলনায় গ্রামের প্রতিই শামসুদ্দীন আবুল কালামের পক্ষপাত বেশি ছিল। তিনি মনে করতেন শহরের কাছ থেকে বিনষ্টি আর প্রতারণা, কপটতা ছাড়া গ্রামের আর কিছুই পাবার নেই। এই বক্তব্য তার একাধিক রচনায় উঠে এসেছে। এরকম বক্তব্যধর্মী একটি গল্প হচ্ছে 'পথ জানা নাই' গল্পগ্রন্থের নামগল্পটি।

পথ জানা নাই গল্পটি সাহিত্যমোদী সমাজে শামসুদ্দীন আবুল কালামকে কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিত করেছে। গ্রাম ও শহর দুই জীবনকে একত্র করার নাটকীয় নিরীক্ষণ করেছেন গল্পকার এখানে। গল্পটির পটভূমি নিম্নরূপ –

Dhaka University Institutional Repository

মাউলতলা গ্রামের অধিবাসী গফুর আলী ওরফে গহুরালি শহরে যাবার একটা নবনির্মিত সড়কটিতে উন্মাদের মতো কোদাল চালাতে থাকে। প্রচণ্ড আক্রোশে সে সড়কটি নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। এর পেছনে গল্পকার একটি কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। গহুরালি যে মাউলতলার অধিবাসী, এটি দক্ষিণ বাংলার একটি নিভৃত গ্রাম। দীর্ঘদিন পর্যন্ত গ্রামটি ছিল সম্পূর্ণরূপে শহরের সঙ্গে যোগাযোগশূন্য। তাই এখানে জীবনের ছন্দটি ছিল অনেকটাই 'প্রাক-পুরাণিক'।'এখানকার মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবনগুলি তখন সংগ্রাম করিয়া ক্ষেতে ক্ষেতে শস্য ফলাইত; ভোগের অধিকার লইয়া আদিম বীরত্ব সহকারে মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই করিত, জোর করিয়া ধরিয়া আনা মেয়েমানুষকে বিবাহ করিয়া আর অবসর কালে গান কিংবা পালা বাঁধিয়া আনন্দ উৎসব করিত ।' (পৃ-১৩৮)। যেহেতু তাদের জীবন-যাত্রার একটি সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিজস্ব রীতি ছিল, তাই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না তাদের। আর তাই 'ইংরেজ সভ্যতা সনাতন ভারতবর্ষীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির মর্ম-মূল ধরিয়া নাড়া দিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু এই যুদ্ধের পূর্ব-কাল পর্যন্ত মাউলতলা গ্রামের তাহার কোন বিশেষ প্রভাব অনুভূত হয় নাই।' (পৃ-১৩৮)

ইংরেজ শাসনামলে এদেশে রেলপথ চালু হয়। বলা হয় এ রেলপথ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে, এদেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। আসল কথা ভিন্ন। শহরের সম্পদ লুণ্ঠনের পর বৃটিশদের চোখ পড়ে গ্রামগুলির উপর। রেলপথ স্থাপন ব্যতীত যেখানে পৌছানো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর এর মধ্য দিয়ে ইংরেজদের উদ্দেশ্য যেমন সাধিত হয় তেমনি এদেশের গ্রাম ও পরিবাগুলিও আক্রান্ত হয় ঔপনেবিশক শোষণের বেড়াজালে এবং আধুনিকতার নামে গ্রামাঞ্চলে আমদানি হয় নগরকেন্দ্রিক নানা হঠতা, নীচতা, অমানবিকতা, অনৈক্য। পর্যায়ক্রমে দুর্ভিক্ষ, ঘুষ, নারীপাচার, যৌনব্যাধির মতো খারাপ বিষয়গুলোও ইংরেজসৃষ্ট আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সূত্রে গ্রামগুলিতে আছড়ে পড়ে। গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালাম এ বিষয়গুলোই স্পষ্ট করে তুলেছেন।

গ্রামীণ নিম্নবর্গেরই একজন জোনাবালি হাওলাদার যে একটা গ্রাম থেকে 'তরুণ বয়সে ছিটকাইয়া শহরে গিয়ে পড়েছিলো' চল্লিশ বছর পরে আকস্মিকভাবে সে একদা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। এর মধ্যে জোনাবালি ইংরেজসৃষ্ট তথাকথিত মধ্যশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। চল্লিশ বছর পর আবার গ্রামে ফিরে এসে গ্রামবাসীদের কাছে তিনি রূপকথার মায়াপুরীর মতো আলোকজ্জ্বল শহরের ছবি মেলে ধরেন। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমষ্টিগত জীবনেরই সর্বত্র পরিবর্তন ও সাফল্যকে সূচিত

Dhaka University Institutional Repository

করতে চাইলে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ যে অপরিহার্য তা তিনি গ্রামবাসীদের বোঝাতে সক্ষম হন। রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে তিনি গ্রামবাসিদের বশীভূত করেন এবং শহরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি নতুন সড়ক নির্মাণ করেন। সেই নতুন সড়ক ধরে গ্রামের মানুষ শহরের সান্নিধ্য আসে। কেউ শহরে যায় বেড়াতে, কেউ যায় চাকরির সন্ধানে, আবার কেউ নিয়োজিত হয় গ্রামের শাক-সবজি শহরে গিয়ে বিক্রির কাজে। দরিদ্র গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় দরিদ্র কৃষক গফর আলিও তার ধানি জমির উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে শহরের দিকে চলে যাওয়ার সড়ক ধরে শহর ভ্রমণে যায়। ফিরে আসে খানিকটা বিস্ময় আর খানিকটা তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। তবে শহর তার রোজগারের নতুন পথ খুলে দেয়। তরিতরকারি থেকে শুরু করে গ্রামে লভ্য নানান জিনিস শহরে নিয়ে নিয়ে বিক্রি করে সে বেশ খানিকটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে। কিছুদিনের মধ্যেই খড়ের চালের বদলে টিনের চাল ঝকঝক করে তার ঘরে। তবে তার এই সুখের দিন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তর। সড়ক পথ ধরে তার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে মাউলতলার জনজীবনেও। হু হু করে বেড়ে যায় জিনিসপত্রের দাম। বাড়ে মানুষের দুর্ভোগ। গহুরালি এই দুর্দিনে শহর থেকে আসা দালালের সংস্পর্শে আসে। গহুরালি ভেবেছিল, তার কাছ থেকে সে কিছু উপকার পাবে। কিন্তু ঘটে তার উল্টোটি। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরের বউকে আর খুঁজে পায়না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারে যে, ঐ দালালের সঙ্গে তার বউ তাকে ত্যাগ করে শহরে চলে গেছে। মন্বন্তরের উত্তাপে গহুরালির আর্থিক জীবনের নিরাপত্তা অনেক আগেই বিপন্ন হয়েছিল। এবার ভস্মীভূত হয় তার মানসিক শান্তিটুকু।

ঔপনিবেশিক শাসন কিভাবে এদেশের গ্রাম ও গ্রামীণ জীবন ও পরিবারগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল লেখক তা এ গল্পে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। উপনিবেশ শোষণ বিরোধী লেখক স্পষ্ট করে বলেছেন–'রাজ্য-স্বার্থ লইয়া ভাঙাগড়ায় এই সব গ্রামের কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই কোনোদিন, কিন্তু অতীতের শতশত বৎসরে যাহা ঘটে নাই, দুইশত বৎসরের ইংরেজ-শাসনের ফলে এবার এখানে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিল।' (পৃ-১৫৬)।

এই আত্মপ্রকাশ এতই করুণ যে গহুরালির পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। গহুরালির পরবর্তী কার্যক্রম উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ। গহুরালির দুঃখ-কষ্ট ও স্ত্রীর পলায়নের পেছনে এই সড়ক, আর তাই এই সড়কের উপরই তার সমস্ত ক্ষোভ ও আক্রোশ। প্রচণ্ড আক্রোশে কোদাল হাতে সড়ক কেটে মিশিয়ে দিতে চায় সে। গ্রামের লোকজন এর কারণ সুধালে সে উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিলঃ 'ভুল, ভুল অইছিলো এ রাস্তা বানাইনন্যা। আমরা যে রাস্তা চাইছেলাম হেয়া এ না; ঠিক অয় নাই।' (পৃ-১৪৮)

কিন্তু কি করলে ঠিক হতো-এ প্রশ্নের উত্তর গহুরালির মতো সকলের কাছেই অজানা রয়ে গেছে। '

ওয়েভলেংথ গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালাম গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। গল্পে নিম্নবর্গের রহমানের সঙ্গে এক প্রবাসী লেখকের কথোপকথন সূত্রে গল্পকারের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। এই দু-মেরুর দু-জনের কথোপকথনে নগরের সঙ্গে গ্রামের যোজন যোজন ফারাকের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। দেশের পঁচাশি ভাগ গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের তেমন চেষ্টা নেই কোথাও। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অন্ধকারে রেখে, কর্মহীন রেখে এদেশে নানা শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। উন্নয়ন-পরিকল্পনার বাইরে থেকে যাচ্ছে গ্রাম ও গ্রামের বৃহত্তর সমাজ। আবার শহরে প্রগতির নামে নতুন 'লাইফস্টাইল' চালু হচ্ছে গ্রামগুলোকে অন্ধকারে রেখে, তবে তাতে প্রকৃত মুক্তি মেলে না ; 'বর্ণে-কর্মে ভাগাভাগি করে, একসময় নানা কৌলীণ্যের কাঠামোয় তৈরী হয়েছিলো সমাজ। কিন্তু ভাগ্যলিপি বলে কথিত সেই অবস্থা থেকে মানুষ বার বার মুক্ত হতে চেয়েছে। তবে মুক্তি দূরে থাক, সে মনে হয় আরো কঠিন-কঠোর শৃঙ্খলে জড়িয়ে পড়ছে।' (পৃ-৪৫)।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের মানুষ মাত্রই নদীভফুনের ভয়াল রূপটির সঙ্গে পরিচিত। শামসুদ্দীন আবুল কালামেরও এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা ছিল। নদীভাঙনে ছিন্নমূল মানুষের জীবনের করুণ চিত্রকে তিনি তাঁর একাধিক রচনায় অঙ্কন করেছেন। অনেক উচ্চবর্গ বা মধ্যশ্রেণীর মানুষও নদীভাঙনের কারণে রাতারাতি নিম্নবর্গে রূপান্তরিত হয়ে যায়। *মজা গাঙের গান* গল্পে নদীভাঙনের শিকার এক বৃদ্ধার করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নদীভাঙনে নিঃস্ব হয়ে মধ্যশ্রেণী থেকে নিম্নবর্গে পরিণত হয়ে বরুজানের বিয়াই দেশান্তরী হয়। দীর্ঘদিন পর আকস্মিকভাবেই বিয়াই বরুজানের ভাঙা বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। সংসারে এদের কারো কোন পিছুটান নেই। বৃদ্ধ বিয়াই তার গত জীবন, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা বৃদ্ধা বরুজানের কাছে বর্ণনা করে। গাঙে সব ভাসিয়ে নেয়ার পরও সে পুনরায় সংসার শুরু করেছিল। কিন্তু এক সময় সে উপলব্দি করে যে সংসারে কেউ-উ তার নয়। সন্তানেরা এই বৃদ্ধের মৃত্যুর পুর্বে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারায় ব্যস্ত হয়ে পড়লে বৃদ্ধ সংসার ছেড়ে চলে আসে।এদিকে বরুজানের সংসারও এক আকস্মিক 'তুফানে' লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। নাটকীয়ভাবে দুই বিয়াই-বিয়াইনের এই সাক্ষাৎ ঘটে এবং এরা পুনরায় সংসার শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

২.

শামসুদ্দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর যে জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে দেখা যায় এরা নিম্নবর্গের উপর আধিপত্য বিস্তারকারী। গ্রামে নানা সংকট সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে। নিম্নবর্গের জমি, বসতভিটাও দখল করে এই মধ্যশ্রেণীর মানুষগুলো। গ্রামের নেতৃস্থানীয় এই শ্রেণী কর্তৃক নিম্নবর্গকে শোষণের চিত্রই প্রকটভাবে শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পরস্পর বিরোধ প্রভৃতিতে এই শ্রেণী মদদ দেয়। আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল বিধায় এই শ্রেণীর অনেক শোষণেরই কোনো প্রতিবাদ হয় না। শামসুদ্দীন আবুল কালামের একাধিক ছোটগল্পে আমরা একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করি। আর তা হচ্ছে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণী তার বিত্ত-বৈভবের প্রভাব খাটিয়ে নিম্নবর্গের নারীদের নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে, ভেঙে দেয় অনেকের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন, এমনকি সংসারও। গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর জীবনচিত্র শামসুদ্দীন আবুল কালামের যে সব ছোটগল্পে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে সেগুলো নিম্নরূপ –

ছোটগল্প গ্রন্থ	ছোটগল্প
শাহেরবানু	*শাহেরবানু, পৌষ, জোর যার*
অনেক দিনের আশা	*কালীদহের তীরে, ক্ষুধা, বাদর*
পথ জানা নাই	*বন্যা*
পুঁই ডালিমের কাব্য	*কায়-কারবার।*

শাহেরবানু গল্পে মাজেদ ও শাহেরবানুর ভালোবাসার মাঝে আবির্ভূত হয় মধ্যশ্রেণীর কাসেম খাঁ। সচ্ছল কাসেম খাঁ-র দিকে শাহেরবানুর মায়েরও মৌন সম্মতি লক্ষ করা যায় যা মাজেদকে চিন্তিত করে। শাহেরবানুকে ঘিরে মাজেদের অনেক স্বপ্ন। 'শাহেরবানুকে লইয়া একটি ছোট্ট সচ্ছল সংসার গড়িয়া তুলিবে, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে নিজের বাহু ও বুদ্ধির শ্রমে প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সম্পদ আনিবে, শাহেরবানু কর্ত্রীত্ব করিবে - কতো রঙীন কল্পনা তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে।' (পৃ-৬)। কিন্তু দৃশ্যপটে মধ্যশ্রেণীর কাসেম খাঁর আবির্ভাবকে মাজেদ উপদ্রব মনে করে। শাহেরবানুকে একটি শাড়ি উপহার দিতে গিয়ে অসৎভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে যায় মাজেদ। আর তাতে ব্যর্থ হয়ে মাজেদের করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় কাসেম খাঁ-র আবির্ভাবই মাজেদকে বিপর্যস্ত করেছে এবং নিজের করুণ পরিণতি ডেকে এনেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পৌষ গল্পে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর অন্যতম প্রতিনিধি হলধর চক্রবর্তীর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মহাজন হলধর বর্গাচাষীদের উচ্চ সুদে টাকা ধার দেয়। সুদ-আসলে জোর করে ধারের অর্থ আদায় করে সে ও তার লোকজন। হলধর চক্রবর্তীর কাছ থেকে ৩০ টাকা নিয়েছিল বর্গাচাষী তাজু যা পৌষ মাসে উৎপাদিত ধান বিক্রি করে ঋণ শোধ করার আশায়। কিন্তু মা, স্ত্রী ও নিজের জন্য কাপড় কেনা জরুরী হয়ে পড়ে। তাই ফসল বিক্রির টাকা নিয়ে মায়ের জন্য শীতের কাপড়, মেয়ে ও স্ত্রীর জন্য কাপড় ও নিজের জন্য লুঙ্গি কিনতে মনোহার দোকানের দিকে পা বাড়ায় তাজু। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয় নি । মহাজনের অত্যাচারে তাজুর আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে যায়। গল্পে তাজুর আশাভঙ্গের কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে এবং মধ্যশ্রেণীর এই অত্যাচার, শোষণ, দয়াহীনতা শেষ হবার আশাবাদ উচ্চারিত হয়েছে এভাবে –

'শেষ হউক, হে ঈশ্বর, শেষ হউক এই দয়াহীনতার।' (পৃ. ৭২)।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের *জোর যার* গল্পটি নদীভাঙনের প্রেক্ষাপট অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নদীভাঙন কিভাবে রাতারাতি মানুষকে একেবারে নিঃস্ব করে দেয় গল্পে তা বর্ণিত হয়েছে। আবার নদীভাঙনের সুযোগে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর কেউ কেউ তাদের থাবা বসায় অসহায় মানুষগুলোর উপর। ঘরের বউ-ঝিরাও এদের হাত থেকে রেহাই পায় না। গল্পে এ ছবিগুলোও স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। নদী মরিয়মের পিতা রহমালির ফসলসহ ক্ষেত গ্রাস করে। এবার বসতভিটার আশপাশও ভাঙতে শুরু করে। এদিকে পাশের গ্রামের জোতদার কাজেম আলি মরিয়মকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে রহমালি তা নামঞ্জুর করে। কেননা এটি ছিল কাজেম আলির দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব। অন্যদিকে গ্রামেরই আরেক নিম্নবর্গীয় যুবক ফজু ভালোবাসতো মরিয়মকে। নদী এক রাতে মরিয়মের পিতা-মাতা, ছোট ভাই ও বসতভিটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, শুধু মরিয়ম ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। সব কিছু হারিয়ে মরিয়ম নিঃস্ব হয়ে পড়ে। প্রেমিক ফজু মরিয়মের পিতা-মাতা ও ছোট ভ্রাতার সন্ধানে 'ডুবাইতে ডুবাইতে' ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এদিকে মধ্যশ্রেণীর কাজেম আলি মরিয়মের অসহায়ত্বের সুযোগে তার প্রেম-পছন্দ অভিলাষ সবকিছুকে জোর করে কুক্ষিগত করে। নিম্নবর্গের ফজুর ভালোবাসারও ইতি ঘটে এভাবে।

'মরিয়মের কাছে যাইয়া একবার দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু বলিবার ভাষা মুখে যোগায় নাই। তাহা ছাড়া, স্বয়ং তালুকদার কাজেম আলিকে মরিয়মের কাছে দেখিয়া কিছু বলিবার সাহসও সে পায় নাই। এবারও পাইল না। কেবম শ্রান্ত, শীতকম্পিত বিষর্ষ চক্ষু দুইটি মেলিয়া তাহাদের গমনপথের দিকে তাকাইয়া রহিল।' (পৃ. ১৪২)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ মধ্যবিত্তের বৃথা বংশগৌরবের আস্ফালন এবং সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র *কালীদহের তীরে* গল্পের পটভূমি নির্মাণ করেছে। সামান্য ঘটনাকে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণী কত বড় করে তুলে নিজেদের বিপর্যয় ডেকে আনে এ গল্পে তা বর্ণিত হয়েছে। আসগরউল্লাহ এবং করিম সর্দার দুই গ্রামের দু'টি শত্রু পরিবার। আসগর সর্দারের গরু পুল পার হয়ে করিম সর্দারের ক্ষেতের ধান খেয়ে নিলে করিম সর্দার দায়ের এক কোপে গরুটিকে হত্যা করে। শুরু হয় দু'গ্রামের দুই মাতব্বরের লড়াই। সামান্য ঘটনা শেষ পর্যন্ত গ্রাম্য লড়াইয়ে রূপ নেয়। সাজ সাজ রবে দুই গ্রামেরই যোদ্ধারা মুখোমুখি অবস্থান নেয়। আসগর দলবলসহ লাঠি, ফলা, সড়কি, ধনুক ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত হয়। অন্যদিকে করিমের পোলা জামাল উঠতি যুবক এবং রণে পারদর্শী। কালীদহের তীরে এবার শুরু হয় যুদ্ধ। আসগর সর্দার কৌশলে জামালকে জখম করে এবং ধরে বাড়ি নিয়ে যায়। জামালকে ডাক্তার দেখানোর পর সে সুস্থ হয়ে ওঠে। আসগর সর্দারের মেয়ে হালিমা। জামাল ও হালিমা পরস্পরকে ভালোবাসে এবং দুই পরিবারের বৈরিতা চিরদিনের মতো অবসানকল্পে যুক্তি করে একত্রে পালিয়ে যাবার। রাতের অন্ধকারে পালাতে গিয়ে জামাল আসগর সর্দারের লাঠির আঘাতে মারা যায়। আসগর যখন বুঝতে পারে যে সে জামালকেই আঘাত করেছে ততক্ষণে জামাল আর বেঁচে নেই। 'প্রায়শ্চিত্ত আর অনুশোচনার অন্তিম শোক তার। কেউ তা বুঝতে চাইবে না, জামালকে জোর করে ধরে আনায় তার কী স্বার্থ ছিলো। কী সে স্বপ্ন! বিলাপ-বিধুরা কন্যা তার - সে-ও তো বুঝবে না! (পৃ. ১৯)।

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের ছোটগল্প' প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হওয়া শামসুদ্দীন আবুল কালামের *ক্ষুধা* একটি ব্যতিক্রমী গল্প। গ্রামীণ নিম্নবর্গের প্রতি গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি এ গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। আমেনা নিম্নবর্গের কৃষক কন্যা আর হাশেম মধ্যশ্রেণীর পিতার সন্তান। শৈশব থেকেই আমেনা-হাশেম এক সাথে বড় হয়েছে এবং পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু হাশেমের পিতা 'নিচুজাতে'র এই মেয়েটিকে কিছুতেই পুত্রবধু হিসেবে গ্রহণ করবেন না। তার আশা বড় কোনো ঘরের মেয়েকে পুত্রবধু হিসেবে আনবেন তিনি। আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখার গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর বাস্তবচিত্রটি এ গল্পে অসাধারণ দক্ষতায় লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই আমেনা-হাশেমের মিলন হয়নি। নির্মম বাস্তবতায় দু'জনের জীবন দুই দিকে ছিটকে পড়েছে।

বাঁদর গল্পে স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা সেই সঙ্গে স্ত্রীর বিশ্বাসহীনতার বিপ্রতীপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দেহের মতো স্থূল বুদ্ধির অধিকারী কেরামত আলি গরু কিনতে গিয়ে বিদেশ হতে এক পরমাসুন্দরী বউ নিয়ে আসে। কিন্তু অতি রোমান্টিক স্ত্রী বরুজান অল্প দিনের মধ্যেই কেরামতের প্রতি বিরক্ত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠে এবং একসময় মধ্যশ্রেণীর এক পর পুরুষের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। একদিন হাতে নাতে ধরাও পড়ে স্বামীর হাতে। মিথ্যা অজুহাতে সেদিন বাঁচলেও তার ঘরে বউকে না পেয়ে দা হাতে স্ত্রীর প্রেমিককে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হয়ে জংগলে তাদের কথোপকথন শুনে তাজ্জব বনে যায় সে। হাত থেকে দা খসে পড়ে। 'সুধু ভাবেঃ হায় খোদা, মুখ ফুটে ভালোবাসার কথাগুলো ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলিনি বলেই কী, আমার ভালোবাসা এমন মিথ্যে হয়ে গেলো?' (পৃ. ১৩৭)

বন্যা গল্পে গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় কৃষকপুত্র মধু'র ভালোবাসা পরাজিত হয়েছে মধ্যশ্রেণীর মনসুরের আর্থিক স্বচ্ছলতার কাছে। মধু হেমকে ভালোবেসে তাকে ঘিরে কল্পনার জাল বুনেছে। কিন্তু 'রহস্যময়ী' নারী হেমকে সে তার 'ডইয়াকন্যায়' অধিষ্ঠিত করলেও প্রতিদানে পেয়েছে ছলনা ও বিশ্বাসহীনতা। 'বাজারের মেয়েদের মতো পয়সাওয়ালার দিকেই ঝুকিয়া' পড়েছে হেম। তাই মধু এক সময় প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। নিম্নবর্গের মধু, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মধু, প্রেমিক মধু অনেক অনুনয় করেও যখন হেমের কাছ থেকে অবহেলা ও ঘৃণা পেয়েছে তখন সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। হেমের কাছে আবেগ ও দারিদ্র্য অপেক্ষা স্বচ্ছলতার হাতছানি ছিল অনেক লোভনীয়। তাই স্বচ্ছল মনসুরের প্রতিই সে ঝুকে পড়ে এবং অভিসারে যায়। হেমের চরিত্রের স্খলন লক্ষ করে মধু উপযুক্ত শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এক পলকে। মনসুরের মাথায় আঘাত করে হেমকে নিয়ে নৌকাযোগে অথৈ জলের দিকে অগ্রসর হয়। পানিতে ডুবিয়ে মধু 'দাদ' নিয়ে নেয় হেমের 'ছিনালী'র।

পুঁই ডালিমের কাব্য গল্পগ্রন্থে শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর পূর্বে রচিত গল্পগুলোর প্রবণতা থেকে সরে বাস্তবের কঠিন মাটি স্পর্শ করেছেন। প্রেম ও দাম্পত্য সুখ-অসুখের বিষয় ছেড়ে এ গ্রন্থে লেখক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-ব্যর্থতার ছবি অঙ্কনের পাশাপাশি এসবের কারণ অনুসন্ধানেও সচেষ্ট হয়েছেন। *কায়-কারবার* গল্পে শহরের আগ্রাসনে কিভাবে গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে সে বিষয়টি উঠে এসেছে। লেখক দেখিয়েছেন শহর ও শহরের মানুষের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে গ্রামগুলো কিরূপে রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। গল্পে অঙ্কিত চরিত্র আইনদ্দির কথাতেও শহরের আগ্রাসনের বিষয়টি প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

'আইনদ্দি হেসে ফেললো : এতোক্ষণে বুঝলাম। মাছ গেছে, সাপ গেছে, গেছে ব্যঙ বান্দর, এইবার ঘাস ধরিয়াও টান পড়ছে! কেন ঐ শহর বন্দরের মানুষে এখন বুঝি ঘাসও খাইতে শুরু করছে?' (পৃ. ৬৬)

Dhaka University Institutional Repository

গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র সওদাগর আজাহার মল্লিক ব্যবসা-বাণিজ্য করার আশায় শহর-বন্দর থেকে বেশ দূরে এক গাঁয়ে এসে উপস্থিত। কিন্তু গাঁয়ের মাঝি ও আরো দু'একজনের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারল এখানে ব্যবসা করার মতো কোনো জিনিসই আর অবশিষ্ট নাই। প্রায় সবই শহরে পাচার হয়ে গেছে। আর কিছু মধ্যসত্বভোগী এ সুযোগে রাতারাতি ধণিক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু গ্রামগুলো হয়ে পড়েছে জৌলুষহীন। গ্রামের মানুষগুলো যারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত তারা এতটুকু লাভবান হতে পারে নি। সব কায়-কারবারে এরাই সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হয়। গল্পে শহরের মানুষ কর্তৃক গ্রামকে নিঃস্ব করার বাস্তব চিত্রটিই অঙ্কিত হয়েছে।

৩.

কথাসাহিত্যে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে বক্তব্য ও বাগভঙ্গি নিয়ে ব্যাপক নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ছোটগল্প রচনায় তিনি বাংলা ভাষার তিনটি রীতিরই আশ্রয় নিয়েছেন। সাধুরীতি, চলিতরীতি ও আঞ্চলিক রীতির আশ্রয়ে শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর ছোটগল্পের ভুবনকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন রূপায়ণে আড়ষ্টতামুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত ভাষার ব্যবহার তাঁর ছোটগল্পের মূল্যবান সম্পদ। চলিতরীতিতে লেখা গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে 'পুঁই ডালিমের কাব্য', 'মজা গাঙের গান' অন্যতম। 'অনেক দিনের আশা', 'পথ জানা নাই', 'শাহেরবানু' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে শামসুদ্দীন আবুল কালাম সাধুরীতির আশ্রয় নিয়েছেন।

'শাহেরবানু' গল্পগ্রন্থের *শেষ প্রহর* গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্বপ্ন বর্ণনে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা পাঠকদেরকে নিমিষেই স্বপ্নের মোহময় জগতে নিয়ে যায় –

উঠানের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া এক জ্যোতির্ময় পুরুষ হয়তো বা আকাশ হইতে নামিয়াই তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আবক্ষলম্বিত তাঁহার শুভ্র ঋজু, সহস্ত দেহে শুভ্র বেশ, বাঁহাতে তসবিহ্। শান্ত সৌম হাসিভরা মুখের দুইটি রক্তিম ঠোঁট সান্ত্বনার বাণীতে কাঁপিয়ে উঠিতেছে। শীর্ণ চক্ষু দুটিতে মমতার অন্ত নাই। কাছে আসিয়া ডানহাতে কি পানীয় তিনি হোসেনের ঠোঁটের কাছে তুলিয়া ধরিলেন, তাহা পান করিয়া হোসেনের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। জ্যোতির্ময় পুরুষ সমস্ত দেহে কল্যাণহস্ত বুলাইয়া দিলেন। আরো কাছে আসিয়া হোসেনের মস্তক নিজ ক্রোড়ে লইয়া তাহার নিকটে বসিলেন।

গ্রামীণ প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতির সন্তানের কষ্টভরা জীবনের কথা ভাষারূপ পেয়েছে এভাবে –

Dhaka University Institutional Repository

ভিটায়া রাঙা রঙের বাহার। পলাশ-শিমূল আর মাদার গাছগুলিতে যেন আগুন ধরে গেছে। টুপটাপ করে ফুল ঝরে নীচেও তৈরী হয়েছে যেন এক অগ্নি-আস্তরণ। মরিচ ক্ষেতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেখানে বসে মাঝে মাঝে তাই মনে হয় রতনের। চারিদিকে কেমন অসহ্য বলে মনে হয়, ইচ্ছে করে সব ছেড়ে ছুড়ে সে পালিয়ে যায় কোনো সুদূর দেশে; ভালো লাগে না আর এই কষ্টভরা জীবন, এই দৈনন্দিন রূঢ়তা। (হঠাৎ, অনেক দিনের আশা (পৃ. ৭৩)।

রূপ-বর্ণনের ভাষায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের পরিমিতিবোধ লক্ষণীয় –

বাইশ তেইশ বছরের শীর্ণ-শ্যামা তরুণী। সারাদেহে আগাগোড়া সাদা পোষাক। বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ এক লহমা যেন তার মুখের উপর দিয়ে ঘুরে গেল। সব মিলিয়ে তেমন আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। (অভাবনীয়, দুই হৃদয়ের তীর পৃ. ১৩১)।

চলিত রীতির আশ্রয়ে শৈশবের নস্টালজিক বর্ণনায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম নিজ শৈশবকেই যেন টেনে এনেছেন –

শুধু খেয়াল করলেন বারবার তার মনে পড়ছে পুরোনো গ্রাম্য শৈশবকে। পাড়াগাঁয়ের সেই বহুদিনের পরিত্যক্ত বাড়িতেও একবার বেড়িয়ে আসলে যেনো নেহাৎ মন্দ হোতনা। সেই ছোট্ট বয়সে, ছোট্ট ছিপে খালের পাড়ে বসে মাছ ধরার দিনগুলি, উঠানকোণে চুলাশালের উনুন ঘিরে - নোতুন ধান, খেজুররস আর কাঁঠাল কুঁড়ির বিচিত্র গন্ধ পরিবেশে মায়ের মুখে গল্প শোনার রাত। (জীবনের শুভ অর্থ, পথ জানা নাই পৃ. ৩৬)।

গ্রামীণ নিম্নবর্গের ভাষায় আঞ্চলিকতার স্পর্শ শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গল্পগুলোকে বিশিষ্টতা দান করেছে –

স্ত্রী তবু খুঁত খুঁত করিল ঃ বুঝিনা দ্যাশের দশের কাম কারে কয় - মৌলবী সাইবে তো কইয়া গেল বেশ আছি, আমরা, রাস্তা-ফাস্তা বানাইয়া এম্নে-ওম্নে গেলে জীবনে আরো কষ্ট বাড়বে ছাড়া কমবে না। আরো কইলেন বোলে হগোলডিরে বাইর অওনইয়া স্বভাবে পাইছে, এয়া ভালো লক্ষণ না।

ঃ থুইয়া দেও হের কথা। নোতুন কোনো জিনিস করতে গেলে একদল মানুষ চাইর দিক দিয়া এরহম বাধা দেয়ই। (পথ জানা নাই - ঐ. পৃ. ১৪১)।

কখনও কখনও শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম সাধু ভাষাতেই ইতিহাসকে ধারণ করেছেন সাবলীল ভঙ্গীতে –

Dhaka University Institutional Repository

বিরাট এই দেশের ইতিহাসে রাজ্যরাষ্ট্রের ভাঙা-গড়া বহুবার ঘটিয়েছে, সুদূর দিল্লী কিংবা ঢাকা মুর্শিদাবাদের বাদশাহী তখতে কতো রাজশক্তির উত্থান পতন ঘটিয়াছে - মগ, পর্তুগীজ, বর্গীয় বন্যা কতোবার কতো স্থানে ঝড় তুলিয়া বহিয়া গেছে, কিন্তু মাউল তলার স্বকীয় জীবন-যাত্রায় তাহা কিছুমাত্র আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। (পৃ. ১৩৮ - ঐ)।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্প : নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্প : নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণ

১.

গ্রাম, নগর এবং ইউরোপ -এই তিন স্থানেই বসবাসের বিরল অভিজ্ঞতা ছিল শামসুদ্দীন আবুল কালামের। ফলে গ্রামের জীবন যেমন কাছ থেকে দেখেছেন, তেমনি কাছ থেকে দেখেছেন নগর ও নগরকেন্দ্রিক জীবনকেও। তবে গ্রামীণ নিম্নবর্গের মতোই শামসুদ্দীন আবুল কালামের অধিকাংশ রচনায় নাগরিক নিম্নবর্গের জীবনচিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। খেটে খাওয়া মানুষ, রিক্সাওয়ালা, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি বিচিত্র পেশার মানুষের জীবনকে তুলে এনেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর বহু ছোটগল্পে। নাগরিক নিম্নবর্গের জীবনচিত্র শামসুদ্দীন আবুল কালামের যে সব ছোটগল্পের মধ্যে প্রধান হয়ে ফুটেছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গল্পগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

ছোটগল্পগ্রন্থ	ছোটগল্প
পথ জানা নাই	'কাল-কাত্রির ভোর'
ঢেউ	'মাধ্যাকর্ষণ'
পুঁই ডালিমের কাব্য	'পুঁই ডালিমের কাব্য', 'জীবন-শিল্পী' 'লালবাত্তি' 'ম্যাজিক-লণ্ঠন'

কালরাত্রি ভোর গল্পটি দেশবিভাগের প্রেক্ষপেটে রচিত। অসাধারণ দক্ষতায় শামসুদ্দীন আবুল কালাম এ গল্পে রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাসে সরলপ্রাণ নিম্নবর্গের মানুষ কিরূপে নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে তারই ইঙ্গিত করেছেন। নিম্নবর্গের মানুষের অন্যতম পেশা ওস্তাগরি তথা দালান-কোঠা নির্মাণ সংক্রান্ত কর্ম। তেমনি একজন ওস্তাগর রমজান যার ঘরে খাবার থাকে না নিত্যদিন। কাজ করেও মজুরি পায় না, মালিক দিচ্ছি, দিব করে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। এদিকে পাকিস্তান-স্রষ্টা জিন্নাহ আসবে এবং তার আগমনের মধ্য দিয়ে সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়ে নতুন দিন আসবে – এরকম আশাবাদে চারপাশের সবাই উদ্দীপিত। নেতাকে একনজর দেখার জন্য সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা ও গভীর ব্যাকুলতা। রমজানও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে চেয়েছিল কিন্তু ঘরে চাল বাড়ন্ত বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজে যায়। কিন্তু মনটা পড়ে থাকে জনতার মিছিলের মাঝে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীর সাথে আলোচনায় যোগ দেয় যেখানে নতুন ভবিষ্যতের বীজ বুনতে থাকে ইটের গাঁথুনির মতো করে।

Dhaka University Institutional Repository

' আচ্ছা সাচ্ কালসে সবকুচ বদল যায়েগা? রমজান কাজ থামাইয়া প্রশ্ন করিল।

: শুনা তো।

: মগর ক্যায়সে? কেয়া করেঙ্গে কায়েদে আজম?

: ক্যায়সে কহুঁ! শুনা তো – গরিব আমীর নেহি রহেগা। সব একসাথ হো যায়গা – বিলকুল এক হো যায়গা। আমীর গরিবকা ওপর জুলুম নেহি করেগা। জমিদার রায়তকো উপর জবরদস্তি নেহি করেগা – সব জাগা জুলুমবাজী একদম খাতম হো যায়েগা।'(পৃ . ১১৪)

কিন্তু তাদের কল্পনা যে বাস্তবে কোনদিন হবার নয় তা গল্পের অন্তে রূপকী পরিচর্যায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। রমজানের কর্মস্থলের কাছ দিয়ে মিছিল যাবার সময় সেদিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ আলগা তক্তার উপর পা দিয়ে নিচে পড়ে যায় রমজান । তার পাশ দিয়ে বন্যাবেগে চলে যায় কায়েদে আজমকে অভ্যর্থনাকারীদের শোভাযাত্রা। মৃত্যুর পূর্বে রমজানের চোখে কেবল নতুন দিনের স্বপ্ন। স্বপ্নপ্রবণ শামসুদ্দীন আবুল কালাম শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন আর তা-ই রমজানের চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে এভাবে –

'শেষবারের মতো রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিতেঠে যেন চারিদিকে, আর তাহারই মধ্য হইতে তাহার মনে হইল এবার শেষ সকল যন্ত্রণার, যেন আর কয়েক প্রহর পরেই পূর্বদিগন্ত হইতে রাঙাভাঙা নোতুন দিনের সূর্য আসিয়া হাসি মাখা সোনার কিরণে সবদিক রাঙাইয়া তুলিবে। তিনি আসিয়াছেন! আর তো মতে কয়েক প্রহর বাকি!' (পৃ. ১১৭)

মাধ্যাকর্ষণ গল্পে নাগরিক নিম্নবর্গের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নাগরিক মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাবকে দেখানো হয়েছে। গল্পের বিহারী গ্রাম থেকে চাকুরি নিয়ে শহরে আসে। লন্ড্রির দোকানের কর্মচারী হয় বিহারী। পরে লন্ড্রীর মালিক বিহারীর কন্যা ললিতার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে যায় সে। প্রথম প্রথম বিহারী এ সম্পর্কে আপত্তি না করলেও পরে অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলক সচ্ছল বৈকুণ্ঠ দোকানে যোগ দিলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সে। আর্থিক মানদণ্ড কিভাবে মানুষের প্রেম-ভালোবাসাকে মূল্যহীন করে দেয় লেখক গল্পে সেই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। যদিও পিতার আশা পূর্ণ হয়নি। ললিতা-বিহারীর প্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে।

পুঁই ডালিমের কাব্য শামসুদ্দীন আবুল কালামের পরিণত বয়সের রচনা। নাগরিক নিম্নবর্গের সম্পূর্ণ জীবনচিত্র, নিম্নবর্গের প্রতি মধ্যশ্রেণীর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রভৃতি এ গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। নিম্নবর্গ ও

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যশ্রেণীর দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবন-ব্যবস্থার প্রতিও গল্পে ইঙ্গিত করা হয়েছে। লেখক কানু দেশে ফিরে নাগরিক মধ্যশ্রেণীর পার্টিতে যোগ দেয়। পার্টির চাকচিক্যের পাশাপাশি নিকস্থ বস্তিতে বসবাসরত নিম্নবর্গের জীবন লেখকের দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়ে এভাবে :

'মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল বাড়ির বাগানের পরেই একটা কালো কাদা ভরা পুতিগন্ধময় নালা। তরেই পারে একটা বিশাল এলাকা জুড়ে অজস্র ছাপড়ার ঢেউ। ছেঁচা মুলি বাঁশ, পিচবোর্ড, তেরপল পরত সাজিয়ে নৌকার ছইয়ের মতো অজস্র ছাপড়ার ঠাঁই প্রখর রৌদ্রের তলায় যেন ঝিম ধরে আছে। তারই শেষ সীমায় চোখে পড়লো বিরাট কতগুলো আবাসিক বাড়িও।' (পৃ. ১৭)

স্বাধীনতার পর বন্যার পানির মতো গাঁয়ের ভুখানাঙ্গা অভাবপীড়িত দরিদ্র লোকজন শহরে এসে জড়ো হয়। মূলত এরাই শহরের মধ্যশ্রেণীর জীবনকে সচল রাখার দায়িত্বও গ্রহণ করে। কিন্তু এই নিম্নবর্গের মানুষগুলোর প্রতি শহরে ভদ্রশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি লেখক কানুকে অবাক ও হতবাক করে দেয় :

'ওই সব বস্তীর বাইরের চেহারাটা দেখে ভাববেন না ওরা খুব খারাপ অবস্থায় আছে। উঁকি দিয়ে দেখুন গে, চুরি-চামারি লুটপাট করে ওরা এমন সম্পত্তিও করেছে যার ব্যবহারই জানে না।' (পৃ.২১)

নাগরিক নিম্নবর্গের প্রতি নাগরিক মধ্যশ্রেণীর মনে কোনও করুণা নেই। নগরে নিম্নবর্গের আগমনকে এরা উপদ্রব মনে করে। এদের সম্পর্কে তেমন কোনো ইতিবাচক ধারণা মধ্যশ্রেণীর মানুষের মাঝে নেই। আর এ পার্টিতে আসার মধ্য দিয়ে কানু এগুলো বিশদভাবে জেনে যেতে পারল। পার্টিতে আসার একটি উদ্দেশ্য হলেও তার সার্থক হলো, তাই কানু বলেছিল :

'বিন্দুতে, সিন্ধু-দর্শন নয়, সিন্ধুতে কেন্দ্রবিন্দু দর্শানোর দুরূহ কর্মে সাফল্য লাভের আত্মপ্রত্যয়ই আমাকে তাদের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।' (পৃ.৩৩)

জীবন-শিল্পী গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালাম আর্থিক কারণে কিভাবে সম্ভাবনাময় শিল্পীর সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়, তা অঙ্কন করেছেন নাগরিক নিম্নবর্গের একটি পরিবারের মানবেতর জীবনপ্রণালী বর্ণনার মাধ্যমে। গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র রাজু সাধারণ স্কুলমাস্টার এবং স্বভাবতই অন্য সব স্কুলমাস্টারের মতোই অবহেলার পাত্র। শিল্পী হবার ইচ্ছা ও সম্ভাবনা দুই-ই ছিল রাজুর মধ্যে। কিন্তু বাস্তবতার চাপে পিষ্ট হয় তার সকল সম্ভাবনা। সংসারের বোঝা চাপে রাজুর ঘাড়ে। ধার-কর্জ করে কোনরকমে সংসারের চাকা সচল রেখেছে রাজু। ঘটনাক্রমে একদিন বাজার হতে রাজু একটি ইলিশ মাছ নিয়ে বাড়ী ফেরে। অতঃপর এ মাছকে ঘিরে বাড়ির সদস্য ও প্রতিবেশীদের আনন্দ-উল্লাস দীর্ঘদিন পর একটি উৎসবের আবহ সৃষ্টি করে। মাছ কাটার দৃশ্য দেখে রাজুর মনে হয় 'উহা যেন

Dhaka University Institutional Repository

তাহারই রক্ত, সে-ই নিজের জীবন দিয়া উহাদের জীবন যোগাইয়া যাইতেছে।' পৃ . ৪৫ আবার সকলের খাওয়ার দৃশ্য রাজুর মনে এক শান্তির উদ্রেক করে।

'প্রদীপের আলোটুকু তখনও ঘরের তমসার সহিত লড়াই করিতেছে। আহার শেষে সকলের মুখেই একটা তৃপ্তির খুশি ফুটিয়াছে। বোনেরা, এমন কী প্রায়-অন্ধ বাপও থালা হইতে শেষতম খাদ্যকণাটিকে চাটিয়া পুছিয়া খাইয়া তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলিতেছেন। মায়ের মুখে অত ক্লান্তি-শ্রান্তির মধ্যেও সকলকে তৃপ্ত করিয়া খাওয়াইতে পরার আনন্দে একটু সুন্দর গরিমা ফুটিয়াছে। ইহার সমস্ত কালো কালো ছায়াপড়া সেই ভগ্নশ্রী ঘরের পরিবেশে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যরূপ লইয়াই তাহার চক্ষে ধরা দিল। রাজু সম্মুখে ঝুঁকিয়া দৃষ্টিকে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া সেই দৃশ্যের প্রতিটি খুঁটিনাটি বারবার করিয়া দেখিতে লাগিল। মনে হইল সে যেন তাহার সম্মুখে সেই অর্ধ-অন্ধকার ঘরের ফ্রেমে আঁটা কোন মহাশিল্পীর আঁকা একখানা চিত্রকেই দেখিতেছে। পরক্ষণেই ভাবিল, কাগজে-ক্যানভাসে, রঙে-তুলিতে জীবনের-ই বিরাট পটভূমিতে সে-ই তো সেই ছবিখানি আঁকিয়াছে তাহার নিজের জীবন দিয়া।' (৪৭ পৃ.)

গল্পে লেখক নাগরিক নিম্নবর্গের আকাঙ্ক্ষার ছদ্ম পরিতৃপ্তির ছবি এঁকেছেন অসাধারণ দক্ষতায়।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম সাধারণ মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা উপস্থাপন করেছেন তাঁর একাধিক ছোটগল্পে। চল্লিশের দশকের নানা সমস্যা সংকুলতা বিশেষত সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের দুঃখ দুর্ভোগের চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। 'পুইডালিমের কাব্য' গ্রন্থের *লালবাতি* গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালাম নিম্নবর্গের একটি অসহায় দিন মজুর পরিবারের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। দারিদ্র্য আর নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাসে মুজাফফরের পরিবার ধ্বংসের মুখোমুখি। গাঁয়ে একমাত্র ভিটেটুকু ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। অভাব-অনটন এ পরিবারটিকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরে। দিশেহারা হয়ে মুজাফফর সিদ্ধান্ত নেয়, গাঁয়ে আর নয়, শহরে যাবে সে পরিবারকে নিয়ে। তার আশা দু'মুঠো খাবার হয়তো সেখানে জুটবেই। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের উপর নির্ভর করে শহরে পাড়ি জমায় সে। এখানে আমরা নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি শহরের আগ্রাসন লক্ষ করি। আর সে আগ্রাসনে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শহরে এসে মুজাফফর একজন পরিচিত লোকের সহায়তায় বস্তিতে একটা ঠাঁই করে নেয়। পাটকাঠির মতো, ষোল বছরের মেয়েটিকে এক বাসায় ঝিয়ের কাজ দেয়। এভাবে কিছুদিন কেটে যায়। একদিন মেয়ের খোঁজ নিতে গিয়ে মুজাফফর জানতে পারে সে কারো হাত ধরে পালিয়েছে। ঘরে এসে দেখে রোগা অন্য মেয়েটিও মারা গেছে। দাফন করার জন্য লাশ নিয়ে গাঁয়ে যায় মুজাফফর এবং সে আর ফিরে আসে না। তখন মুজাফফরের বউ অদৃশ্য এক হত্যাকারীর প্রবল

Dhaka University Institutional Repository

আক্রোশ থেকে তার একমাত্র শিশু সন্তানকে রক্ষা করার জন্যে ট্রাফিক সিগন্যালের লালবাত্তিটাকে উপেক্ষা করে এক অনিশ্চিত গন্তব্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে দৌড়তে থাকে :

বিরাট পথে তখন অজস্র বাস, লরী, গাড়ি, রিক্সা পাগলা দৈত্যের মতো এদিক-সেদিক ছোটছুটি করছে। তাদের দৌরাত্ম্যে পায়ের তলার মাটিও কেঁপে উঠেছে থর থর করে। (পৃ. ৫৯)

ম্যাজিক-লণ্ঠন 'পুঁই ডালিমের কাব্য' গল্পগ্রন্থের অর্ন্তগত একটি প্রেমবিষয়ক গল্প হলেও এখানে নিম্নবর্গের আত্মপ্রতারণাব বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ম্যাজিকওয়ালা ম্যাজিক লণ্ঠনের বাক্সটা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া এই ম্যাজিক-লণ্ঠন দেখিয়েই সে তার জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে সেখানে নিত্যনতুন ঠাঁই খুঁজে বেড়ানো ম্যাজিকওয়ালার সঙ্গী হয় একদিন গাঁয়ের ঝি। সব ছেড়ে-ছুঁড়ে আসা ঝি-টিকে ম্যাজিকওয়ালা ফিরিয়ে দিতে পারে না। তাকে নিয়ে দেশান্তরী হয়ে ঘর-সংসারও শুরু করে। কিন্তু ম্যাজিকওয়ালার কেবলই মনে হয় অল্প বয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ঠিক হলো কি না বা মেয়েটিকে সে সুখী করতে পারবে তো। তাছাড়া এই ম্যাজিক-লণ্ঠনের গুণে মেয়েটিকে পেলেও বাস্তাব জীবন তো ভিন্ন, সেখানে কোনো ম্যাজিক কাজ করে না। ম্যাজিকওয়ালার মনে হয় দু'জনের সম্পর্কে কোথায় যেন একটা অসত্য দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ম্যাজিকওয়ালার মনে তাই আত্মপ্রতারণার অনুশোচনা। তাই বার বার মেয়েটির কাছে জানতে চায় সে অসন্তুষ্ট কী না। জবাবে মেয়েটি বলে –

'উনি যদি ফাটকি দিতে পারে, আমিই বা পারমু না কেন? সাজানো গোছানো ফাটকি দিয়া মুলুক ভুলানো আর একজনের মন ভুলানোর মধ্যে তফাতটা কী?' (পৃ.১২১-১২২)

২.

শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে নাগরিক মধ্যশ্রেণীর বহুকৌণিক জীবন চিত্রিত হয়েছে। বহুস্তরবিশিষ্ট নাগরিক মধ্যশ্রেণীর জীবনচিত্রের যে সব বিষয় শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে প্রধান হয়ে উঠেছে তন্মধ্যে আর্থিক সঙ্কটতাড়িত নাগরিক মধ্যশ্রেণীর পারিবারিক জীবন-কথা, অশান্তি ময় দাম্পত্যজীবন, অস্তিত্ব সংকট, রাজনৈতিক ও আদর্শিক অসঙ্গতি, রাজনৈতিক চৈতন্য, স্বদেশপ্রেম, গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, নাগরিক নিম্নবর্গের প্রতি শোষণ এবং

Dhaka University Institutional Repository

তুচ্ছতাচ্ছিল্যের প্রবণতা, নাগরিক মধ্যশ্রেণীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কথা, তাদের শিল্পী সম্ভাবনার কথা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মোটকথা নাগরিক মধ্যশ্রেণীর যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি ও জীবনযুদ্ধে নিয়োজিত এই শ্রেণীর মানুষের পরিচয় প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর নিম্নোক্ত ছোটগল্পগুলোতে।

ছোটগল্প গ্রন্থ	ছোটগল্প
দুই হৃদয়ের তীর	*নবমেঘভার, এক দুপুর বেলার সুর, প্রথম হাসির ইতিকথা, নীলদেয়াল, দুই হৃদয়ের তীর।*
পথ জানা নাই	*জীবনের শুভ অর্থ, সরজমিন*
ঢেউ	*একটি উপন্যাসের খসড়া, বসন্ত, রাগ ঢেউ*
মজা গাঙের গান	*রক্তের স্বাদ, নকল, দায়-দাবি*
পুঁই ডালিমের কাব্য	*পুঁই ডালিমের কাব্য; ভাঙন; গায়ের আগুন; সেই লোকটি আর সেই পাখিটির কথা, সেই লোকটি, সেই মেয়েটি আর সেই গাছটির গল্প, সেই মেয়েটি ও তার কাঠ গোলাপের গাছটির কথা, রাগ-বিরাগের নানাজি।*

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের 'দুই হৃদয়ের তীর' গল্পগ্রন্থের *নবমেঘভার* গল্পে সংকটতাড়িত মধ্যশ্রেণীর যুবকের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের দিক উন্মোচিত হয়েছে। 'ম্যাট্রিক পাশ দিয়া জল-পানি' পাওয়া মেধাবী ছাত্র সাজু, মিঞা পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে আর্থিক অনটনে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে শহর থেকে বহুদূরে স্বল্পবেতনে পোস্টমাস্টারের চাকরি গ্রহণ করে। এ সূত্রে সাজু মিঞা পরিচিতি পায় মাজুমাস্টার হিসেবে। মুরুব্বী ও সহায় পাবার কামনায় এ সময় মাজুমাস্টার বিয়ে করে স্বচ্ছল চাষীকন্যা মনিরাকে। সংসারে কন্যাসন্তান আসিলে মাজুমাস্টারের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠে। ফলে শুরু হয় দাম্পত্য কলহ। মাজুমাস্টারের দৈন্য এবং ব্যর্থতা মনিরা প্রতি পদক্ষেপে

Dhaka University Institutional Repository

বুঝিয়ে দেয়। সংসারচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ, স্ত্রীর শাণিত বাক্যবাহণ ক্ষতবিক্ষত, বিপন্ন মাজুমাস্টার মধ্যশ্রেণীর স্বপ্ন ও বাস্তবের ফারাক উপলব্ধি করেছে জীবন দিয়ে। আর তাই ;

'গৃহ মাজু মাস্টারের নিকট এখন প্রচণ্ড ভীতি। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিয়াছে সংসার ত্যাগ করিয়া যেইদিকে দুইচক্ষু যায়, চলিয়া যায়। কিন্তু শিশুকন্যাটি আসিয়া দুইহাত বাড়াইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে - হাসিভরা মুখে-চোখে মাজু মাস্টারের দিকে ডাগর দৃষ্টি ভরিয়া - তাহারই জন্য মাজু মাস্টারের বহু সংকল্প আজও পর্যন্ত কার্যে পরিণত করা হইয়া ওঠে নাই।' (নবমেঘডার, দুই হৃদয়ের তীর, পৃ. ৬)

সংসারের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, স্ত্রীর-সন্তানের চলে যাওয়া, আর্থিক অস্বচ্ছলতা প্রভৃতি সব কিছু ভুলে মাজুমাস্টার পোস্টঅফিসে বসে রোমান্টিক ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত করে, স্বপ্নতাড়িত হয়ে ওঠেঃ

'ভাবে কত চিঠি, কত তার আসে তাহার হাতে। তাহার নামাঙ্কিত হইয়া এমন একখানা চিঠি কি কোনোদিন আসিতে পারিল না। যাহাতে তাহাকে কেহ কামনা করে। ঐ তার বাহিয়া আসিতে পারে না কোনো সুদূরের আহবান ? যেখানে পৌঁছিয়া এই মনডার ত্যাগ করিয়া সে সেই শৈশবের উচ্ছলতা লইয়া উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে।' (নবমেঘডার, দুই হৃদয়ের তীর, পৃ. ১৪)

পরবর্তী গল্প 'এক দুপুর বেলার সুর' যেখানে বিবৃত হয়েছে ভালোবাসাবঞ্চিত এক শূন্যতার ইতিহাস। অন্তচারী ভালোবাসার মানুষটিকে হারিয়ে মানিকের জীবন একাকীত্বের বেদনায় আক্রান্ত হয়েছে। কলেজ ছাত্র মানিকের মেসের পাশেই ছিল জোছনাদের বাসা। সেই সূত্রে তাদের প্রণয় সংঘটিত হয়েছিল। পিতার মৃত্যু সংবাদে আকস্মিকভাবে মানিক গ্রামের বাড়ি যায়, ফিরে এসে জানলো জোছনার অন্যত্র বিয়ে হবার সংবাদ। শোকদগ্ধ মানিক হয়ে পড়লো বেদনাবিদ্ধ। জোছনাহীন মানিকের জীবনে সঙ্গীত হলো নির্জন বিষণ্ন দুপুর।

ভালোবাসার ক্ষেত্রে পরাজিত একজন শহুরে মধ্যশ্রেণীর নারীর কথা বিবৃত হয়েছে শামসুদ্দীন আবুল কালামের *প্রথম হাসির ইতিকথা* গল্পে। জিন্নত ভালোবেসে হয়েছে পরাজিত, শূন্য, গ্লানিবিদ্ধ এবং রক্তাক্ত। শিক্ষিতা মহিলা জিন্নত ভালোবেসে স্বেচ্ছায় পিতামাতা ভাইবোনের সকল বাধা অগ্রাহ্য করে বিয়ে করেছিল। স্বামীকে সুখী করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে সে। সারাক্ষণ অনুগত থেকেও স্বামীর অন্তর স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে সে। অকৃতজ্ঞ স্বামী এত ভালোবাসা পেয়েও দ্বিতীয় বিয়ের দিকে পা বাড়িয়েছে। বেদনাচঞ্চল জিন্নত পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভেবে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। অন্তর্জ্বালায় জর্জরিত জিন্নত নতুন বধুকে দোয়া করে এই বলে –

'থাক ভাই থাক। তুমি আমার স্বামীকে যেন খুশী করতে পারো এই দোওয়া করি।' (পৃ. ৬৪)

Dhaka University Institutional Repository

নীলদেয়াল গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালাম মধ্যশ্রেণীর 'টিপিক্যাল' মনোভঙ্গির ছবি এঁকেছেন। সোফি ও আমজাদের সংসারে ভালোবাসার কমতি নেই। কিন্তু সোফি নীল দেয়ালঘেরা একটি গৃহবাসী সুদর্শন যুবকের স্মৃতিকথা বিস্মৃত হতে পারে না। তার প্রতি দুর্বলতার কথাও সোফি স্বামী আমজাদের কাছে অকপটে স্বীকার করে। আমজাদ স্ত্রীর সরল স্বীকারোক্তিতে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ করে না। তাছাড়া সোফির বিস্তীর্ণ ভালোবাসা সে পেয়েছিল তাই মনে কোন অমূলক সন্দেহ স্থান পায় না। কিন্তু তারপরও মধ্যশ্রেণীর আমজাদ হতে পারে না ভারমুক্ত –

'কিন্তু তবু, মনে হলো তার, এই নীল দেয়ালটা যেন চিরকালের জন্য তারও দৃষ্টিতে ভেসে রইলো।' (পৃ.১৪৬)

'দুই হৃদয়ের তীর' গল্পগ্রন্থের নাম গল্পে শহুরে মধ্যশ্রেণীর দু'জন তরুণ তরুণীর প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসার কথা বর্ণিত হয়েছে। সহপাঠীকে বিয়ে করলেও দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারেনি এ গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র শাহেদ। দাম্পত্য বন্ধন তাদের স্থায়ী হয়নি আবার বিচ্ছেদও ঘটেনি তবে তারা আলাদা বসবাস করতো। পরে সে ভালোবাসে জিনতকে। কিন্তু সেখানে তার প্রেম প্রার্থনা হয়েছে উপেক্ষিত, অস্বীকৃত ও যাতনাদীর্ঘ। শাহেদের মনোযাতনা গল্পে বাণীরূপ পেয়েছে এভাবে –

'মানুষ যা ভাবে তা সচরাচর ঘটে না; তাই অধিকাংশ মানুষই বুকে বুকে আশাভঙ্গের বেদনা বয়ে বেড়ায়।' (পৃ. ১৪৭)

জিনতের প্রেমে অস্থির হয়ে উঠে শাহেদ, বার বার উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েও জিনতের কাছেই যেতে চায়, কিন্তু ইতোমধ্যে জিনত অপর এক যুবকের সাথে ভালোবাসার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রেমপ্রার্থী এক যুবকের ব্যর্থতার ছবি এ গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

জীবনের শুভ অর্থ গল্পে লোকনাথ ও অবিনাশ দুই বন্ধু। 'যুদ্ধের বাজারে ব্যবসায়ে ক্রমাগত ফেঁপে' লোকনাথ দত্ত নিম্নবর্গ থেকে নাগরিক মধ্যশ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে এবং অর্থ উপার্জনকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে অবিনাশ একজন লেখক। ১৩৫০ সালের অগ্রহায়ণ মাস। মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে। প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় যেনো সেই ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের চিত্র ফুটে উঠতো। ভিখারির ছবি, ভিখারির কথা প্রতিটি পেপারে যেন বড় বড় অক্ষরে লেখা হতো। এই কাহিনী নিয়ে অবিনাশ একটা বই লিখে নাম দিয়েছিলো 'জীবনের শুভ অর্থ'। বইটি উৎসর্গ করে বন্ধু লোকনাথ দত্তকে। বইয়ে দুই পরিবারের কাহিনীর সঙ্গে ১৩৫০ সনের মন্বন্ত

Dhaka University Institutional Repository

রের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বইটি পড়তে পিয়ে লোকনাথ দত্তের চোখ কিছু অংশে আটকে যায়, এ যেন তাকেই লক্ষ্য করে লেখা;

'আজীবন কল্পনা করে আসছো সুখ সম্পদ সৃষ্টি করে, তার পরিবেশে তুমি প্রসন্ন আরামে বাঁচবে। তা তুমি পারবে না। প্রত্যেক সমাজে মিশেছিলো স্ব স্ব আত্মধারণের নিরুদ্বিগ্নতার জন্য। তোমাকেও মাটিতে নেমে সকলের সাথে দাঁড়াতে হবে। সকলকে না মেনে, ভালো না বেসে তোমার বাঁচার স্বপ্ন ভুল। ক্ষুধাতুর দেশের সন্তান তুমি, একা নয়, সকলকে নিয়েই তোমাকে বাঁচতে হবে। ক্রমাগত প্রার্থনা, দাবি উপেক্ষা করে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তুমি উন্মাদ হয়ে যাবে।' (পৃ.৪৩)

বইটি পড়ে লোকনাথের বোধোদয় ঘটে, বাস্তব জগতে ফিরে আসে যেন সে। এতদিনের অর্থ উপার্জনের নেশা তার দূর হয়। অবস্থার উন্নয়ন ঘটলেও মন-মানসিকতায় লোকনাথ দত্ত এখনও আগের মতোই সংবেদনশীল ও সহৃদয়সংবেদী। পরিবর্তিত লোকনাথ সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সমব্যথী হয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায়। মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলাকাঙ্খার মাঝেই যে জীবনের সর্বোত্তম সাধনা ও সিদ্ধি লুকায়িত তা লোকনাথের জীবনদৃষ্টি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ গল্পে বাণীরূপ লাভ করেছে।

সরজমিন বাংলা কথাসাহিত্যে এক অসাধারণ সংযোজন। রিলিফ ওয়ার্কের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে নাগরিক মধ্যশ্রেণীর এক যুবক ও গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র এ কাজের ফাঁক ও ফাঁকি তার প্রেমিকার কাছে বর্ণন করেছে এ গল্পে। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালীন এদেশের নিম্নবর্গের প্রকৃত অবস্থার চিত্রও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকাহিনীর মধ্য দিয়ে গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালাম মধ্যশ্রেণী ও নিম্নবর্গের (বিশেষত দক্ষিণ-বাংলার) উত্থানের চমকপদ কাহিনীও বর্ণনা করেছেন প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করছি সে অংশটি –

'বাংলাদেশের সুদূর দক্ষিণের এক অংশ এ। সমুদ্রগর্ভ থেকে এর উদ্ভব। তার আগে তাথৈ তাথৈ পানি নাচতো এখানে - আজকের এই বন্যার পানির চেয়েও ভীষণ। একদিন সেখানে চর জাগলো। সেই চর ধীরে ধীরে এসে মিলিত হলো এ ধারের ভূখন্ডে। প্রকৃতির এ দান মানুষ কাজে লাগালো। তার নরম বুকে একদিন ফসলের সোনার শীষ মাথা দুলিয়ে নেচে উঠলো - অকৃপণ চিত্তে সে ছাড়লো তার পীযূষধারা।ওদিকে মানুষেরি একাংশে তখন দেখা দিয়েছে লোভের লড়াই। নিজেদের ক্ষুদ্র গন্ডী ছেড়ে তারা ক্ষুধা মেটানোর উপনিবেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে দিকবিদিকে। কেউ এসেছে সাতশো ডিঙ্গায় বিজয়ীর পাল উড়িয়ে, কেউবা সপ্তহাজার সৈন্যদলের পদভারে মাটি কাঁপিয়ে। বাহুর জোরে তারা কায়েম করলো তাদের অধিকার। দাস ছিল পুরাকালে; কর্ম ঃ প্রভুর স্বচ্ছন্দ্য-বিধান। রকম ফেরে এবার জমির আসল মালিকেরা হোলো প্রজা।

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরো কর্ম-ধর্ম মালিকের তুষ্টি। তারপর যুগ যুগ ধরে এই অন্যায় দাসত্বের বন্ধনে বাধা পড়ে এরা চাষীর দুই গরুর পেছনে আরেক গরুর মতোই চলতে থাকলো দিল্লীর মসনদে কতো উত্থান-পতন ঘটলো কিন্তু এদের ভাগ্য বদলালো না। ধর্ম-ভীরু বল ভীরু এরা, তাই বিদ্রোহ করতে জানে না।

কিন্তু কোথায়ও যে করেনি এমন কথা বলতে পারবে মিতা? পরিকল্পনাহীন যে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা কী কারু মঙ্গল এনেছে ?

তারপর থেকে কতো রাজ্যবদল, রাষ্ট্রগঠন করে ভালো ভালো লোক ভুলানো আদর্শের রঙ দিয়ে ইতিহাসের পাতা রাঙিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু এদের ভাগ্য কী বদলেছে?

বদলাতে পারেনি। কারণ আমরা ছিলাম, আমরা আছি।' (পৃ. ৮২-৮৩)

অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে এদেশের যে নিম্নবর্গের উত্থান তার জীবনে কখনোই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ধরা দেয় না। সংকটের আবর্তে বদ্ধ তাদের জীবন। নাগরিক মধ্যশ্রেণীর দৃষ্টিতে গল্পে গ্রামীণ নিম্নবর্গের বাস্তব জীবনচিত্র এ গল্পে অঙ্কিত হয়েছে।

একটি উপন্যাসের খসড়া গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দার্শনিক আহবাব ভারতবর্ষকে সোসিয়ালাইজড করার স্বপ্নে বিভোর। এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিপ্লবী দলে যোগ দেয় সে। দেশের পরিবর্তন আনতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিজীবন এলোমোলো হয়ে যায় নাগরিক মধ্যশ্রেণীর যুবক আহবাবের। সে ভালোবাসতো প্রতিবেশী মণিকা সিংহকে। মণিকাও আহবাবকে পছন্দ করতো। কিন্তু তাদের ভালোবাসা পূর্ণতা পাবার আগেই আহবারের বাড়ি খানাতল্লাশী করে আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়ায় অ্যারেস্ট হয় সে। তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় মুক্তি পায় আহবাব। কিন্তু ততদিনে তার চারপাশের জগৎ ও পরিচিত জনেরা বদলে গেছে। বান্ধবী রাফিয়া এড়িয়ে চলতে থাকে আহবাবকে। আর প্রেমিকা মণিকার বিয়ে হয়ে গেলো অকস্মাৎ। এই ধাক্কা সামলে নিতে কষ্ট হয় আহবারের। একদিন সিদ্ধান্ত নেয় আর রাজনীতি নয়। কেননা,

'দেশটা সুদ্ধ সব লোকগুলোকে মূর্খ মনে হচ্ছে, এদের সংগে আর পারা গেল না। বিপ্লবের শ্লোগান 'আজ লংগর খানা চাই' শ্লোগানে পরিণত হয়েছে।' (পৃ. ৬৯)

'*বসন্ত*', '*রাগ*' ও '*ঢেউ*' গল্পে নাগরিক মধ্যশ্রেণীর বহুকৌণিক প্রেমের নানামাত্রিক চিত্র অঙ্কন করেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। *বসন্তে* কবীর-কবিতার দাম্পত্য প্রেমের সুখী চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তবে গল্পটি শেষ হয়েছে বসন্তে আক্রান্ত হয়ে কোন এক বসন্তে কবীরের আকস্মিক মৃত্যুর

Dhaka University Institutional Repository

করুণ সংবাদের মধ্য দিয়ে। 'শহরের সে মেসের ঠিকানা থেকে যে চিঠি এসেছিলো তাতে শুধু ছিলো বসন্তে কবীরের মৃত্যুর খবর। বিচিত্র বসন্ত।' (পৃ. ১০৯)

'*রাগ*' গল্পে নগর থেকে আসা মধ্যশ্রেণীর যুবক কোরবান গ্রামের চৌদ্দ বছর বয়সী রিজিয়ার প্রেমাসক্ত হয়ে গ্রামেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। 'ঢেউ' গল্পে প্রেম কিভাবে একজন মানুষের জীবনকে নতুন আলোয় আলোকিত করে তা বর্ণিত হয়েছে হালিম-আফিয়ার প্রেম কাহিনীর মধ্য দিয়ে। পিতৃ-মাতৃহীন হালিম বড় আশা জেবুর কাছে মানুষ হয়েছে। ভাইটি একা হয়ে যাবে ভেবে বড় বোন বিয়ে পর্যন্ত করেনি। কিন্তু সংসারে দুঃখ-কষ্ট দেখতে দেখতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে হালিম, সিদ্ধান্ত নেয় আত্মহত্যা করার। কিন্তু আকস্মিকভাবেই প্রেমিকা আফিয়ার সংস্পর্শে হালিম 'আবার জীবনের সব গ্লানি, সব ব্যর্থতা, সব পরাজয় মুছে ফেলে নতুন করে জীবনকে বরণ করার আনন্দে উদ্বেল' (পৃ. ১২০) হয়ে উঠে। তাই সে নতুন সিদ্ধান্তে আসে; 'আমি বাঁচবো, আমি বেঁচে থাকবো, আমি ভালোবাসবো।' (পৃ. ১২১) জীবনযুদ্ধে পরাজিত হতে চায় না নাগরিক মধ্যশ্রেণীর যুবক হালিম। লেখালেখি শুরু করে, পত্রিকায় সে প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ভাইয়ের গর্বে বোন জেবু'র বুক ভরে যায়। ভাই-বোনের সংসার সমুদ্রে আনন্দের ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকে।

ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শামসুদ্দীন আবুল কালামের সম্পৃক্তির প্রভাব লক্ষ করা যায় তাঁর একাধিক ছোটগল্পে। '*রক্তের স্বাদ*' রাজনৈতিক বক্তব্যধর্মী একটি গল্প। স্বদেশী আন্দোলনকালে একদল সুযোগ সন্ধানী লোক কিভাবে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করেছে গল্পে সে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আন্দোলনের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে অনেকেই লুটতরাজে অংশগ্রহণ করে অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। নিম্নবর্গ হয়েছে মধ্যশ্রেণী, আবার মধ্যশ্রেণী হয়েছে উচ্চবর্গ, আবার নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর কেউ কেউ রাতারাতি উচ্চবর্গে রূপান্তরিত হয়েছে। গল্পে লেখক তাই বলেছেন,

কয়েকদিনের মধ্যেই 'সাম্রাজ্যবাদ' আর ঔপনিবেশিকাতর বিরুদ্ধে আন্দোলন হিন্দু আর মুসলমানদের পরস্পরের দিকে উদ্দাম হয়ে উঠলো আর সেই সুযোগে ঐ সর্দারী সংগ্রামীরা লুটপাট, খুনজখম, ছিনতাই আর রাহাজানি কারবারে বেশ পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। (পৃ. ৯)

নকল গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালামের প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধে বিশ্বাসী লেখক গল্পের বাবা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেরূপ আধুনিক চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। 'সবাই এখন নিজের একটা আইডেন্টিটি খুঁজছে। সনাতনভাবে বিয়ের মধ্যে তার সব বিলুপ্তি বলেই

Dhaka University Institutional Repository

তো মেয়েরা এভাবে দুনিয়ার সবখানেই ফুঁসে উঠছে। দাসও দাস থাকতে চাইছে না, আর মেয়েরাও চাইছে না আর কেবল হাড়ি-বাসন ঠেলতে।' (পৃ. ১৭)

দায়-দাবি গল্পে সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামকেন্দ্রিক উন্নয়নের উপর লেখক জোর দিয়েছেন। শহরের নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন ত্যাগ করে বাবা-মার একমাত্র ছেলে তার সিদ্ধান্তের কথা জানায় এভাবে,

'গ্রামে যাচ্ছি। এক অখ্যাত অবজ্ঞাত গ্রামে। দূর থেকে এই দেশ এই সমাজকে যেমন দেখছি তা যেন কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনা এখানে। এই ইট কংক্রীট ছেড়ে যাচ্ছি সেইখানে যেখানে পায়ের তলায় এখনো পাবো নরম মাটি, সবুজ ঘাস আর মাথার ওপরে খোলামেলা আকাশ। হয়তো একটি নিরক্ষরা গ্রামের মেয়েকে নিয়ে সংসার করবো। যারা এখনও দেশের খাঁটি মানুষ, তাদের সঙ্গে মিলে মিশে এতোকালের স্বপ্নের দেশ গড়ে তুলতে নিজেকে বিকিয়ে দেবো।' (পৃ. ৮২)

এভাবে নাগরিক মাধ্যশ্রেণী থেকে এদেশের উন্নয়নের, নেতৃত্বের সত্যিকারের প্রচেষ্টার বিষয়টিকে লেখক গল্পে অঙ্কন করেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর রাজধানীকেন্দ্রিক নাগরিক মধ্যশ্রেণীর জীবনচিত্রের নানা বৈচিত্র্য শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর 'পুঁই ডালিমের কাব্য' গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের ভূমিকাতেও রয়েছে তারই ইঙ্গিত - 'গল্পগুলো ১৯৭২ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। সুতরাং রচনাকালের আনুমানিক সময়ও সেইভাবে ধরে নিতে হবে। একটা পরিবর্তনশীল সমাজের বিভিন্ন চিত্রকল্প এবং সামাজিক ইঙ্গিতগুলোই মুখ্য।'

গ্রন্থের নাম গল্পে প্রবাসী কানু'র স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন এবং এখানে পূর্ব-পরিচিত বান্ধবী সাজেদার অনুরোধে একটি পার্টিতে যোগদানসূত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। নাগরিক মধ্যশ্রেণী কর্তৃক আয়োজিত এই পার্টিতে যোগ দিয়ে কানু'র মনে হল সে যেন বিদেশেই আছে। চাকচিক্যময় পার্টির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে - 'আরো যারা এদিকে সেদিকে নৃত্যে কী আলাপে মগ্ন তাদের বেশবাস এবং সজ্জায় নানা ঔপনিবেশিকতার ছাপ হাইফাইয়ের চেয়েও উচ্চকণ্ঠ। বুফে টেবিলের ওপর রাজ্যের সরঞ্জাম, তারই ধারে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক। বিদেশে গাই-গরু না কী সম্মেলন এ্যাটেন্ড করার অভিজ্ঞতা প্রায় জোর করেই শোনাচ্ছিলেন এক যুবতীকে; (পৃ. ১৯) এদের এ জগতের সাথে কানু বাইরের জগত মেলাতে পারে না। চারিদিকে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত একটি দেশ ও দেশের মানুষ সারাক্ষণ অভাব-অনটনে বিপর্যস্ত অথচ আরেক দল মানুষের বিলাসী জীবন-যাপন। নাগরিক মধ্যশ্রেণীর

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিভঙ্গিও লেখক গল্পে চিত্রিত করেছেন যেখানে নিম্নবর্গের প্রতি উপেক্ষা, ক্ষোভ, করুণা ও বিরক্তিই প্রধান;

'স্বাধীনতা অর্থ ওরা যে কি বুঝেছে তা খোদাই মালুম। এককালে সেই পার্টিশনের পরে এমন সুন্দর কলকাতা শহরটাকেও এই দেশের গাঁও-গ্রামের লোকেরা গিয়ে একবার বস্তী বানিয়ে ফেলেছে যেভাবে, ঠিক মনে হয়, সেই একই রকম ভাবে এই শহরটারও সব বিউটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' (পৃ. ২০)

ভাক্ষ গল্পে মধ্যশ্রেণীর অযৌক্তিক কুসংস্কার ও নীতিবিলাসের বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে অভ্যাগতদের উপস্থিতি, খানাপিনার আয়োজন বাড়িতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের হৈ চৈ সব মিলিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ। হঠাৎ খবর রটলো যে বিয়ে ভেঙে গেছে। সকলেই স্তম্ভিত। কন্যাদায়গ্রস্থ অসহায় পিতার করুণ চাহনি দ্রুতই পরিবেশটাকে ভিন্ন মাত্রা দান করে। কনে দরজায় খিল এটে দেয়। অনেকের ধারণা ছিল যৌতুকের কারণে বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু আসল ঘটনা ভিন্ন। বরপক্ষের লোকজন কিভাবে যেন সংবাদ পেয়েছে মেয়েটির পিতৃপরিচয় গোপন করা হয়েছে। আসলে এটা গুজব হলেও বরপক্ষ আশ্বস্ত হতে পারে না। তাই চিরকালিক সংস্কারবশত তারা কন্যার কর্তাকে ভদ্রতার লেবাসমেশানো ভাষায় জিজ্ঞাসা করে –

'কিছু মনে করবেন না, তা মেয়েটির বাপ আপনিই তো, না সত্যি সত্যিই এর মধ্যে কোনো ইয়ে আছে?' (পৃ. ৭৭)

গায়ের আগুন গল্পে মধ্যশ্রেণীর সমাজের নানা অসঙ্গতিকে লেখক তীব্র কটাক্ষে উপস্থাপন করেছেন। কিছু মানুষ সব সময়ই গুজব সৃষ্টি করে তা রটাতে ওস্তাদ। আর কেউ কেউ গুজবের আরো অনেক ভালপালা বিস্তারে সহায়তা করে। কাজ কর্মহীন বেকার মধ্যশ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে লেখক এ গল্পে নিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'ইস্যু' সন্ধানে ব্যস্ত এ শ্রেণীর চরিত্রটি লেখকের নখদর্পণে। তাছাড়া প্রবাসী হওয়ার সুবাদে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এখানকার সমাজব্যবস্থার একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণও করতে পেরেছেন বাস্তবতার নিরিখে। আর তাই বাঙালি মধ্যশ্রেণীর চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন সাবলীল ভঙ্গীতে। এ গল্পে 'কোন বাড়ির কাজের মেয়েটা কয় মাসের পোয়াতি, আবুধাবী থেকে কার ছেলে না ভাইপো মাসে মাসে কতো টাকা পাঠায়, সদ্য দেখা সিনেমায় সব গানগুলো নায়িকা নিজেই গেয়েছে কি না' (পৃ. ৭৮) এ সব নিয়ে মেতে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে এখানকার অধিকাংশ তত্ত্ববিশারদ। একজনের সুখ বা দুঃখ দুই-ই দর্শনে অন্যের গায়ে আগুন জ্বলতে থাকে।

সেই লোকটি আর সেই পাখিটির কথা, সেই লোকটি, সেই মেয়েটি আর সেই মাছটির গল্প, সেই মেয়েটি ও তার কাঠ গোলাপের গাছটির কথা নামক গল্পত্রয়ী ভিন্ন ধারার । প্রতীকী এ গল্পগুলোকে শামসুদ্দীন আবুল কালামের আত্মজৈবনিক রচনাও বলা যেতে পারে। গল্পগুলোতে প্রকৃতির প্রতি লেখকের সরল ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। আর প্রকৃতি-প্রেমের মধ্য দিয়ে সমাজের নিষ্ঠুরতাকেও প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রতীক রূপকের আশ্রয়ে লেখক নিজ জীবনের ব্যর্থতাকেও ইঙ্গিত করেছেন।

রাগ বিরাগের নানাজী গল্পটি ঔপনিবেশিকতার ছত্রছায়ায় লালিত সদ্য গজিয়ে উঠা মধ্যশ্রেণীর মন-মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। গল্পে প্রবীণ নানাজীর সঙ্গে তার তথাকথিত আধুনিক নাতি-নাতনীর বিরোধের মধ্য দিয়ে লেখক নিজ মনোভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। আধুনিকতার নামে, প্রগতির নামে আমরা নিজস্ব হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়েছি যা গল্পের নানাকে পীড়িত করেছে। তাই নানার আক্ষেপের সীমা নেই –

'যদি বলি পেট কামড়ালে কাদা লেপে রোদে পড়ে থাকো, তোমরা টিটকারী দাও। মা'এর বুকের দুধ নয়, তোমাদের বেবী-ফুড খাওয়ানোর ফুটানি চাই। এদেশের বাচ্চারা একদিন হয়তো আর গরু-ছাগলের চেহারাটা কেমন তাও বলতে পারবে না। এসব বিদ্যে সব অন্যের ঘরে তুলে দিয়েছো, সাহেব হবার নেশায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আর ঘেন্না করছো।' (পৃ. ১১০)

এদেশের মধ্যশ্রেণীর 'টিপিক্যাল' মনোবৃত্তি গল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় পাওয়া জ্ঞানকে হেলা করার মতো বিলাসিতা কেবল এদেশের মধ্যশ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। আর এ বিসর্জনের জন্য চমৎকার ওজর আছে তাদের কাছে। 'হিন্দুয়ানী'র ধোয়া তুলে একসময় এদেশে অনেক আপন জিনিসও বঞ্চিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৬২৩-১৬৯০) কথা। যিনি প্রথম বাঙালি মুসলিম কবি হিসেবে এ জাতির দৈন্যতাকে প্রকাশে সোচ্চার হয়েছিলেন। হিন্দুদের ভাষা বলে নিজ মাতৃভাষাকে ত্যাগের মতো আত্মঘাতী পরিকল্পনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে কিনা সন্দেহ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.

নগরে বসবাসরত নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবনের কঠোর জীবন-সংগ্রামের কথা শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর বিভিন্ন গল্পগ্রন্থের একাধিক গল্পে চিত্রিত করেছেন। আরসে চিত্রায়নের অধিকাংশই হয়েছে চলিত রীতির গদ্যে -

কতবার শুনেছি দেশের শতকরা পচাঁশি ভাগ মানুষ আছে গ্রামে। এখনো এদেশের মৌল জীবন সেখানে। প্রগতির নামে যে, লাইফস্টাইল চালু হচ্ছে এই রাজধানীতে - এই শহরে, তাতে শরীক হবার জন্য রহমানের মতো লোকের আগ্রহে, আমি আমার আত্মীয়ার মতো বিরক্তিবোধ করতে পারলাম না। বর্ণে-কর্মে ভাগাভাগি করে একসময় নানা কৌলিন্যের কাঠামোয় তৈরী হয়েছিলো সমাজ। কিন্তু ভাগ্যলিপি বলে কথিত সেই অবস্থা থেকে মানুষ বারবার মুক্ত হতে চেয়েছে। তবু মুক্তির দূরে থাক, সে মনে হয় আরো কঠিন-কঠোর শৃঙ্খলে জড়িয়ে পড়ছে। (ওয়েভলে০থ, পৃ. ৪৫, মজা গাঙের গান)।

পাকিস্তান আমলে এক নেতার ঢাকা সফরকে ঘিরে নিম্নবর্গের বিচিত্র পেশার মানুষের মধ্যে বেশ আলোড়ন-উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। সে উন্মাদনার রূপ প্রকাশিত হয়েছে 'কাল রাত্রি ভোর' গল্পের নাগরিক নিম্নবর্গের দুই রাজমিস্ত্রীর কথোপকথনে। আর স্বভাবতই সমকালের উর্দূভাষার প্রভাবকে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর গল্পেও স্থান দিয়েছেন এভাবে -

ঃ আচ্ছা সাচ্ কালসে সবকুচ বদল যায়েগা? রমজান কাজ থামাইয়া প্রশ্ন করিল।

ঃ শুনা তো।

ঃ মগর ক্যায়সে ? কেয়া করেঙ্গে কায়েছে আজম ?

ঃ ক্যায়সে কাহুঁ ! শুনা তো - গরিব আমীর নেহি রহেগা।

সব একসাথ হো যায়গা - বিলকুল এক হো যায়গা। আমীর গারিবকা ওপর জুলুম নেহি করেগা। জমিদার রায়তকো উপর জবরদস্তি নেরি করেগা - সবা জাগা জুলুমবাজী একদম খতম হো যায়েগা। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক পরিমন্ডলে নাগরিক মধ্যশ্রেণী ও নিম্নবর্গের কথা চিত্রায়নের পাশাপাশি শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম এর থেকে বিরেয়ে আসার চেষ্টা কথাও বলেছেন। 'পুঁই ডালিমের কাব্য' গল্পগ্রন্থের নাম গল্পে 'ঔপনিবেশিকতা' শব্দটি কোনরূপ আগ-পাছ ব্যাখ্যা ছাড়াই

Dhaka University Institutional Repository

স্বতঃসিদ্ধ প্রতিপাদ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে এতটুকু দ্বিধা করেননি লেখক। নাগরিক মধ্যশ্রেণীর বাবুয়ানা ও বিলাসিতাকে বর্ণনা করতে নিয়ে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের 'ঔপনিবেশিকতা' শব্দটির একক ব্যবহার লক্ষণীয়।

তার খোঁপায় বাঁধা জরির মালা স্থানচ্যুত হয়ে দুলছে দেহের তালে তালে আরো যারা এদিকে সেদিকে নৃত্যে কী আলাপে মগ্ন তাদের বেশবাস এবং সজ্জায় নানা ঔপনিবেশিকতার ছাপ হাইফাইয়ের চেয়েও উচ্চকণ্ঠ। বুফে টেবিলের ওপর রাজ্যের সরঞ্জাম, তারই ধারে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বিদেশে গাই-গরু না কী সম্মেলন এ্যাটেন্ড করার অভিজ্ঞতা প্রায় জোর করেই শোনাচ্ছিলেন এক যুবতীকে; তিনিও কনুই অন্যহাতের তালুতে ভর করে লাশটাকে মুখের কাছে রেখে শোনার ভান করছিলেন বটে; কিন্তু তার দৃষ্টিটা স্থির ছিলো না, এরই মধ্যে লুকোচুরি খেলার ভান করে ঐ ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে; তাদেরই একজনের ধাক্কায় ভদ্রমহিলার হাতের গ্লাশ ছলকে পানীয় পড়ে গেল একজনের বুকের ওপর, তার দামী শাড়িতে কিন্তু হায় হায় করে ওঠার আগেই যখন জানতে পারলেন সেই মকটটি ঐ গাইগুরুবিশারদের পুত্রধন, তখন যেভাবে মুখের ভান বদলে এদিকে এছোতো খোকা, তোমার নামে কী - ভাবে আপ্যায়ন উদ্যোগী হলেন, তা দেখে মনে মনে তার তারিফ না করে পারলাম না। হাসি এড়িয়ে অন্যত্র তাকাতেই চোখ পড়লো বুফে-টেবিলের মধ্যখানে ভাসে সাজানো প্লাস্টিকের ফুলের গোছা। মনে মনে নিজেকে তখনই আশ্বস্ত করলাম, না স্বদেশেই আছি! (১০ পু.ডা.কাব্য, ঐ)।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা পরাধীন ভারত, পশ্চিমা উপনিবেশের অধীন স্বদেশ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে জীবন সংগ্রামে মুখর মানুষ, পরাধীনতার গ্লানিতে তাদের পীড়িত আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অরাজকতা বিশেষত নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর যাপিত জীবনের খুঁটিনাটি এবং আধুনিকতার বিকাশ ও পরিপুষ্টিসহ সমকালের একটি সার্বিক প্রতিভাস। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কালিক চেতনায় তাঁর সময়ের পরাধীন ভারতের মধ্যশ্রেণী ও নিম্নবর্গ যে অনেকান্ত বিষয় ও অনুষঙ্গের প্রতিবেদন সৃষ্টি করেছে, সেই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চিহ্ন সমৃদ্ধ ছবিতেই তাঁর জীবনবোধের স্বরূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে – প্রাসঙ্গিকভাবেই যা আধুনিক কথাসাহিত্যের শিল্পকর্মেও প্রতিভাত।

নিম্নবর্গের মানুষগুলো অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে 'তাড়া খেয়ে' কেবল 'নামা'র দিকে চলে যায়। নদী ও সমুদ্র-তীরবর্তী সেসব জনবিরল অঞ্চলে এরা প্রকৃতির হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ছাড়াও মহাজন শ্রেণী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আছে বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল, নদীতীরবর্তী বন-বাদাড়, সমুদ্র-তীরবর্তী শ্বাপদসংকুল নিম্নাঞ্চল এবং এসব ঘিরে বেঁচে থাকা নিম্নবর্গের সাধারণ নর-নারীর জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসা, আশা-আনন্দ, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা। অন্যদিকে উচ্চতর জীবন অনুসন্ধানে, পল্লী অঞ্চল থেকে শহর অঞ্চলে আসা নিম্নবর্গের কথাও তাঁর কথাসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। নাগরিক নিম্নবর্গের অন্তর্গত বস্তি বাসীর কথাও আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণী এবং নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন পেশাজীবী ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর নিরন্তর জীবনসংগ্রাম তথা অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধই শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে দারুণভাবে বিধৃত। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে বিপর্যস্ত নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রামীণ ও নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর মূল সুর তথা অভাবপীড়িত সমাজেরই চিত্র যেমন বিম্বিত হয়েছে চর্যাপদ ('হাড়ীতে ভাত নাই নিতি আবেশী') হতে শুরু করে হালের রফিক আজাদ (ভাত দে হারামজাদা / নইলে মানচিত্র খাবো) কিংবা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* পর্যন্ত, তেমন করেই শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর কথাসাহিত্যে দারিদ্র্যের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর বিপুল জনগোষ্ঠীর।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাসে অবস্থান করেও শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম এ-দেশের সমাজ ও সময় হতে কখনোই বিচ্ছিন্ন হননি যার স্বাক্ষর বহন করছে তাঁর কথাসাহিত্য। গ্রামীণ জীবন, সংস্কার, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, মাটির কথা, মাটির মানুষের কথা ও তাদের ভাষা শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যের অন্বিষ্ট বিষয়। গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণী এবং নাগরিক নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর 'সম্পূর্ণ জীবন' তার উপন্যাস ও ছোটগল্পে যেভাবে বিধৃত হয়েছে তা বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল।

বাংলা কথাসাহিত্যের কালক্রমে, গ্রামীণ ও নাগরিক পরিমণ্ডলে বসবাসরত নিম্নবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর জীবন-রূপায়ণে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম প্রাগ্রসর ও যুগাতিক্রমী কথাশিল্পী।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

ক. মূলগ্রন্থ (উপন্যাস)

আলম নগরের উপকথা (১৯৫৪)	: ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, ঢাকা, কোহিনুর লাইব্রেরী
কাশবনের কন্যা (১৯৫৪)	: পরিমার্জিত জয়ন্তী সংস্করণ জৈষ্ঠ্য, ১৩৯৪, ঢাকা, মুক্তধারা
সবাই যাকে করলো হেলা (১৯৫৯)	: ১০ জানুয়ারি, ১৯৫৯, ঢাকা, ওসমানিয়া বুক ডিপো
কাঞ্চনমালা (১৯৬১)	: ১৬ই জৈষ্ঠ্য ১৩৬৮, ঢাকা ওসমানিয়া বুক ডিপো
জীবন কাব্য (১৯৬৩)	: শ্রাবণ ১৩৬৩, ঢাকা, দি প্যারাডাইজ লাইব্রেরী
জায়জঙ্গল (১৯৭৮)	: ফাল্গুন ১৪০৯, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ
মনের মতো ঠাঁই (১৯৮৫)	: সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, ঢাকা, মুক্তধারা
যার সাথে যার (১৯৮৬)	: ডিসেম্বর ১৯৮৬, ঢাকা, মুক্তধারা
সমুদ্রবাসর (১৯৮৬)	: জানুয়ারি ১৯৮৬, ঢাকা, মুক্তধারা
নবান্ন (১৯৮৮৭)	: এপ্রিল ১৯৮৭, ঢাকা, মুক্তধারা
কাঞ্চনগ্রাম (১৯৯৮)	: ফাল্গুন ১৪০৪ ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ
কুল-উপকুল (২০০৫)	: ঈদসংখ্যা, অন্যদিন ২০০৫, ঢাকা, অন্যদিন
বয়:সন্ধিকাল (২০০৬)	: ঈদসংখ্যা, প্রথম আলো ২০০৬, ঢাকা, প্রথম আলো

খ. মূলগ্রন্থ (ছোটগল্প)

অনেক দিনের নাশা (১৯৫২)	: সেপ্টেম্বর ১৯৫২, ঢাকা, ওয়ার্সী বুক সেন্টার
ঢেঁই (১৯৫৩)	: মার্চ ১৯৫৩, ঢাকা, ওয়র্সী বুক সেন্টার
পথ জানা নেই (১৯৫৩)	: বৈশাখ ১৩৬০, ঢাকা, প্যারাডাইজ লাইব্রেরী
দুই হৃদয়ের তীর (১৯৫৫)	: জৈষ্ঠ্য ১৩৬২, ঢাকা, কোহিনুর লাইব্রেরী
শাহেরবানু (১৯৫৭)	: ১লা বৈশাখ, ১৩৬৪, কলকাতা, নবযুগ প্রকাশনী।
পুঁই ডালিমের কাব্য (১৯৮৭)	: অগ্রহায়ণ ১৪০২, ঢাকা, মুক্তধারা

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক-গ্রন্থ

অচ্যুত গোস্বামী : *বাংলা উপন্যাসের ধারা* (কলকাতা: পাঠ ভবন, দ্বি.সং. ১৯৬৮)।

অরবিন্দ পোদ্দার : *মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য বিচার* (কলকাতা: উচ্চারণ, ১৯৮৫)।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৩৬৮)।

: *কালের প্রতিমা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৭)।

অশ্রুকুমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮)।

আনিসুজ্জামান : *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪)।

আবু জাফর শামসুদ্দীন : *চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য* (ঢাকা: পাকিস্তান কমিটি, কংগ্রেস ফর কালচারাল, ১৯৬৪)।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : *কথা ও কবিতা* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮১)।

আবুল কাসেম ফজলুল হক : *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশার্স, ১৯৮৮)।

আবদুল মতিন : *শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও তাঁর পত্রাবলী* (ঢাকা: র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, ১৯৯৮)।

Dhaka University Institutional Repository

গোপাল হালদার : *সংস্কৃতির রূপান্তর* (কলকাতা: পুঁথিঘর, ১৩৬৫)।

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : *বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ* (কলকাতা: অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, ১৯৭৭)।

গৌতম ভদ্র পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) : *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বি.মু. ১৯৯৯)।

জীনাত ইমতিয়াজ আলী : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০১)।

বদ্‌রুদ্দীন উমর : *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশর কৃষক* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৩৭৯)।

বিনয় ঘোষ : *মেট্রোপলিটান মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, দ্বি.মু. ১৯৭৭)।

: *বাংলার বিদ্যৎসমাজ* (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৭৮)।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)।

: *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২)।

: *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১)।

মনসুর মুসা : *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস* (ঢাকা: পূর্বলেখ প্রকাশনী, ১৯৭৪)।

মহীবুল আজিজ : *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ২০০২)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *লেখকের কথা* (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৩৬৪)।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ ইদরিস আলী ; *বাংলাদেশের উপন্যাস : সাহিত্যে মধ্যবিত্তশ্রেণী (১৯৪৭-৭০)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫)।

রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২)।

শিশির কুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৫)।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৮০)।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, সং. ১৯৭৬)।

সেলিনা বাহার জামান (সম্পাদক) : *শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৮)

সৈয়দ আকরম হোসেন : *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

: *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসঃ চেতনালোক ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮)।

: *প্রসঙ্গ: কথাসাহিত্য* (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭)।

সৈয়দ আবুল মকসুদ : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা: মিনার্ভা বুকস, ১৯৮১)।

Dhaka University Institutional Repository

সুকুমার সেন : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৬)।

হাসান আজিজুল হক : *কথাসাহিত্যের কথকতা* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮১)।

হুমায়ুন কবির : *বাঙলার কাব্য* (কলকাতা: চতুরঙ্গ, ১৩৬৫)।

ক্ষেত্র গুপ্ত : *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: গ্রন্থনিলয়)।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক প্রবন্ধ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : আঞ্চলিক উপন্যাস, *সাহিত্য সন্ধান* দ্বি.সং. সাহিত্যবিহার, কলিকাতা, ১৯৮৮।

আবুল আহসান চৌধুরী : "কাশবনের কন্যা" চকিত অবলোকন, তদেব।

আবুল কাসেম ফজলুল হক : "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন ভাবনা ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে" উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান : "বাঙালি নারী ঃ সাহিত্যে ও সমাজ" *এক্ষণ* ৩৪ বর্ষ, ২০ খণ্ড, ৩-৪ সংখ্যা, শারদীয় ১৪০১।

টমাস ব্যাবিঙটন মেকলে : "মিনিটস্ অন এডুকেশন" কলকাতা, ১৮৩৫।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : "ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস" নিম্নবর্গের ইতিহাস, সম্পাদনা: গৌতম ভদ্র পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, আনন্দ পালবিশার্স, দ্বি.মু. ১৯৯৯। পৃ. ১-২১

: "ইতিহাসের উত্তরাধিকার" তদেব, পৃ. ১২১-১৬০।

বদরুদ্দীন উমর : "বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত" বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি, পল্লব পাবলিশার্স, ১৩৯৫, ঢাকা।

বিনয় ঘোষ : 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও সিপাহী বিদ্রোহ' *নতুন সাহিত্য*, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজিৎ ঘোষ : "কাশবনের কন্যা : নারীর মুখ" ঊষালোকে, সম্পাদনা: মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ, নব পর্যায় তৃতীয় সংখ্যা॥ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪, ঢাকা।

: 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ: পটভূমি ঢাকা', বাংলাদেশের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১।

রণজিৎ গুহ : "নিম্নবর্গের ইতিহাস" নিম্নবর্গের ইতিহাস, সম্পাদনা: গৌতম ভদ্র পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তদেব। পৃ. ২২-৪৬।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম : "কাশবনের কন্যা সম্পর্কে", তদেব।

Asok Sen : 'Subaltern Studies: Capital, Class and Community by ASOK SEN' *Subaltern studies* Vol-V, edited by Ranjit Guha, Delhi, Oxford University Press, Page-203.

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক পত্রিকা

: ঈদসংখ্যা *প্রথম আলো*, ২০০৬।

: ঈদসংখ্যা *অন্যদিন*, ২০০৫।

: *জনকণ্ঠ*, ১০ মার্চ, ১৯৯৭।

: *ভোরের কাগজ*, ৭ মার্চ, ১৯৯৭।

: *সংবাদ*, ২০ মার্চ, ১৯৯৭।

: *সুন্দরম*, গ্রীষ্ম, ১৩৯৫।

: *ঊষালোকে*, নব পর্যায় তৃতীয় সংখ্যা॥ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪।

: স্মরণিকা: শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মৃতি পরিষদ (ঢাকা: শা. আ. কা. স্মৃতি পরিষদ, ১৩ মে, ২০০৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Aristotle	:	*The Politics*, Tr.: Ernest Barker (Great Britain, Oxford at the Clarendon Press, 1948).
B. B. Misra	:	*The Indian Middle Class* (London: Oxford University Press, First Published, 1961).
	:	*The World Book Encyclopedia*, Vol-13 (London: World Book Inc., 1943).
Erich Fromm	:	*The Sane Society* (New York: Rinehart, 1986).
G. S. Fraser	:	*The Modern Writer And His World* (London: Andre Deutsch, 1964).
Georg Lukacs	:	*History and Class - Consciousness* (London: NLB, 1971).
Herbert Read	:	*The Meaning of Art* (London: Fabor and Faber, 1951).
Humayun Kabir	:	*The Bengali Novel* (Calcutta: Firma K.H. Mokhopadhyay, 1968).
J. H. Cuddon	:	*A Dictionary of Library Terms* (England: Penguin Books, revised edn., 1979).
Kamruddin Ahmed	:	*A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh* (Dacca: Inside Library, Fourth edn., 1975).
Karl Marx	:	*Economic and Philosopic Manuscripts of 1844* (Moscow: Progress Publishers, Fifth edition, 1977).
M. Rosenthal & D. Yadid (ed.)	:	*A Dictionary of Philosophy* (Moscow Progress Publishers, 1967).

Dhaka University Institutional Repository

R. C. Dutta : *The Economic History of India* (Delhi: Vol-II, 1960).

R.M. Hartwell : *Industrial Revolution and Economic Growth* (London: Methuen, 1971).

Radhakamal Mukerjee : *Land Problems of India* (London: Longmans, Green and Co. Ltd., 1933).

Ranjit Guha (edited) : *Subaltern Studies* Vol-V (Delhi: Oxford University Press, 1987).

: *A Rule of Property for Bengal. An Essay on the Idea of Permanent Settlement* (Paris: Mouton and Con., 1963).

Ronald N. Stromberg : *An Intellectual History of Modern Europe* (New Jerssy: Prentice Hall, 1975).

Sumit Sarkar : *Modern India - 1885-1947* (New Delhi: Macmillan India Limited, 1983).

Tulukder Muniruzzaman : *The Bangladesh Revolution and its Attermath* (1980) (Dhaka: University Press Limited, Second Edition, 1988).

William P-Scot : *Dictionary of Sociology* (Delhi: Goyl SaaB, First Indian edition, 1988).

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম: জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি

১৯২৬ আগস্ট জন্মস্থান বৃহত্তর বরিশালের নলছিটি থানার কামদেবপুর গ্রাম। পিতা: আকরাম আলী, মাতা: ফুলমেহের (মেহেরুননেসা)।

১৯৪১ বরিশালের জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ ও স্থানীয় ব্রজমোহন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি।

সাহিত্যে হাতেখড়ি স্কুল-জীবনেই। বি.এ ক্লাসের ছাত্র হওয়ার আগেই সেকালের বিখ্যাত গল্প "শাহেরবানু" লিখেছেন। গল্পটি প্রকাশিত হলে পটুয়াখালির তৎকালীন মুন্সেফ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক ও বিখ্যাত গল্প-লেখক সোমনাথ লাহিড়ীও গল্পটির প্রসংসাসূচক সমালোচনা লিখেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

রাতের অতিথি, কিশোর রহস্য উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ: ১৯৪১।

প্রকাশক: দেব সাহিত্য কুটীর, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। প্রহেলিকা সিরিজের আওতায় ১২নং বই হিসেবে প্রকাশিত।

১৯৪৫ *কাকলি মুখর* নামে উপন্যাস (কিশোর) রচনা যা পরবর্তীকালে বেঙ্গল পাবলিসার্স, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সদ্য মুক্তি-প্রাপ্ত রাজবন্দি নলছিটি থানার সিদ্ধকাঠি গ্রামের দিবাকর মুখার্জীকে নিয়ে এর আখ্যান রচিত হয়েছে।

প্রকাশিত গ্রন্থ

শাহের বানু, গল্প-সংকলন। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৪৫, কলকাতা।

উৎসর্গ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। গল্পসূচি: শাহের বানু, ইতিকথা, জাহাজঘাটের কুলি, কেলায়া নায়েব মাঝি, পৌষ, শেষ প্রহর, মূলধন, মুক্তি, জোর যার, ভাঙন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১লা বৈশাখ, ১৩৬৪ (১৯৫৭)। প্রকাশক, নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা।
দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের নিবেদন–

বহুদিন ধরে এই বইখানি ছাপা ছিলো না। সম্প্রতি 'নবযুগ প্রকাশনী' কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এর বর্তমান সংস্করণ আবার পাঠক-সমাজের কাছে উপস্থিত করা গেল।

গল্পগুলি নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো এবং অধিকাংশেরই রচনাকাল তেরোশো পঞ্চাশ-একান্ন সাল।

গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ব্যাপারে বন্ধু নির্মলেন্দু গুপ্ত, মোজাম্মেল হক প্রভৃতি নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর বিশেষ করে স্মরণ করি অগ্রণী বুক ক্লাবের দেবকুমার গুপ্ত ও প্রফুল্ল রায়কে যাঁদের উদ্যোগে অখ্যাতনামা লেখকের এই ক্ষুদ্র গল্প-সংকলনখানি প্রথম সুধীসমাজে নিবেদিত হবার সুযোগ পেয়েছিলো। এই বই আমাকে যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাটুকু দিয়েছে, তা তাঁদেরই চেষ্টায় সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের আমি ভুলবো না।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে জানানো প্রয়োজন। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি।

কামদেবপুর, বরিশাল — আবুল আলাম শামসুদ্‌দীন

১লা বৈশাখ, ১৩৬৪

সাইজ ॥ ১/৮ ডিমাই, পৃষ্ঠা ॥ ১৬০, মূল্য ॥ টাইপ ॥ ?

১৯৪৬ বি.এ. পরীক্ষা সমাপ্ত। সাহিত্যকর্মে জড়িয়ে পড়েন আরও ব্যাপকভাবে। বরিশাল বিএম কলেজের বাংলা অধ্যাপক সুধাংশু চৌধুরী এবং শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাত-সতেরো শিরোনামে একটি কবিতা সংকলন। এ সংকলনের প্রকাশকও ছিলেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। এই সংকলনের লেখকদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, আহসান হাবীব, জীবনানন্দ দাশ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গুণ, বিমলচন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষ ও সুধাংশু চৌধুরী প্রমুখ। সংকলনে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের তিনটি কবিতা ছিল।

বি. এ. পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাসে অধ্যায়ন। কলকাতার মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় ছোটগল্প *'কলম'* প্রকাশিত। গল্পটি পঞ্চাশের দশকে পূর্ববাংলার ম্যাট্রিকের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৪৭ দেশ-বিভাগ সমাপ্ত। দেশ-বিভাগের কালে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম কলকাতায় অবস্থান করেন। পরবর্তীকালে ঢাকায় আসেন। বিখ্যাত উপন্যাস *কাশবনের কন্যা* রচিত, গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষা।

১৯৪৮ অসাধারণ ছোটগল্প *পথ জানা নাই* রচনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাসে লেখাপড়া শুরু। ঢাকায় আগমন। রেডিও পাকিস্তানে যোগদান। প্রথমে স্টাফ আর্টিস্ট এবং পরে ইন্টারভিউ দিয়ে প্রোগ্রাম এসিসটেন্ট পদে নিযুক্তি পান।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কাকলি মুখর, কিশোর উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ॥ বাংলা ১৩৫৫ (১৯৪৮)। প্রকাশক॥ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিসার্স, কলকাতা। পৃষ্ঠা॥ ১১৯; মূল্য॥ ২.০০। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দি নলছিটি থানার সিদ্ধকাঠি গ্রামের দিবাকর মুখার্জীকে নিয়ে এর আখ্যান রচিত।

১৯৫০ তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তরে এ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর হিসেবে যোগদান।

ঢাকায় কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসে যোগদান এবং 'মাহে নাও' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। কবি আবদুল কাদিরের এই পদে যোগদানের জন্যই শামসুদ্‌দীন আবুল কালামকে ঐ দায়িত্ব ছাড়তে হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত গ্রন্থ

১৯৫২ *অনেক দিনের আশা* ছোটগল্প সংকলন।

১৯৫৩ প্রকাশিত গ্রন্থ

পথ জানা নাই গল্প-সংকলন। প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৬০, এপ্রিল ১৯৫৩। প্রকাশক: আলাউদ্দীন আহমদ, প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান। মুদ্রাকরঃ আলাউদ্দীন আহমদ, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা, পূর্ব-পাকিস্তান। প্রচ্ছদপট: কামরুল হাসান। প্রতিটি গল্পের শিরোনামা'র ড্রইং করেছেন কাজী আবুল কাসেম। উৎসর্গ: আবু সয়ীদ আইয়ুব ও সৈয়দ মুজতবা আলীকে। দাম: তিন টাকা। গল্পসূচি: বন্যা, মেঘনায় কতো জল, জীবনের শুভ অর্থ, বজ্র, মদন মাঝির 'গেলেপতার', সরজমিন, বাণ, কাল-রাত্রির ভোর, অনেক দিনের আশা, পথ জানা নাই। পৃষ্ঠা: ১৪৮ + ৮, সাইজ: ১/৮ ক্রাউন, টাইপ: মনোটাইপ।

নিবেদন

প্রকাশক জনাব আলাউদ্দীন আহমদ, পূর্ব-পাকিস্তানের পুস্তক প্রকাশক সমাজে এক আশ্চর্য আবির্ভাব। চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া তিনি সাহিত্য-গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হইয়া ঢাকায় সাহিত্যিক মহলে বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত গভীর পরিচয়ে অন্তরের যে মানুষটির পরিচয় লাভ করিয়াছি তাহা প্রকাশকদের মধ্যে দুর্লভ। এই পুস্তকটি প্রকাশকালে তাঁহার উদ্যমকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমার এ গ্রন্থের গল্পগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও বর্তমানে পুস্ত কাকারে প্রকাশ করা কেবলমাত্র তাহার উদ্যমেই সম্ভব হইল। প্রথাহিসাবে ভূমিকাতে লেখকের আত্মকথা নিবেদনের রেওয়াজ হইলেও, আমার এই পুস্তকের প্রকাশকের কথা গর্বের সহিত বাংলা ভাষাভাষী পাঠক ও সাহিত্যিকদের কাছে নিবেদন করা কর্তব্য মনে করিলাম।

২৪/এ, আজিমপুর এস্টেট্স, ঢাকা। আবুল কামাল শামসুদ্দীন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢেউ, ছোটগল্প-সংকলন। প্রথম প্রকাশ ॥ মার্চ, ১৯৫৩; প্রকাশক ॥ আবদুল বারি ওয়াসী, ১০, মাহুতটুলী রোড, ঢাকা-পাকিস্তান; প্রচ্ছটপট ॥ আমিনুল ইসলাম; মুদ্রাকর ॥ রফি উদ্দিন গাজী, আলতাফ প্রেস, ১১, শরৎ চক্রবর্ত্তী রোড, ঢাকা; মূল্য ॥ ২॥ ০ টাকা (পাকিস্তানী); গল্পসূচি ॥ মাধ্যাকর্ষণ, একটি নিদারুণ দুর্ঘটনা, একটি উপন্যাসের খসড়া, জামাই, বসন্ত, রাগ, ঢেউ; পৃষ্ঠা॥ ১৪৭; সাইজ॥ ১/৮ ডিমাই।

প্রকাশকের নিবেদনঃ

পরিবেশ যতোই প্রতিকূল হোক না কেন প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে কোনো না কোনো কালে এ 'ঢেউ' আসবেই। তার আবির্ভাব যেমন অপ্রতিরোধ্য আর অনিবার্য তেমনি উন্মাদনাভরা। দক্ষিণ সমুদ্র হাওয়ারি মতো এ হৃদয়ে হৃদয়ে চাঞ্চল্য আনে; কখনো সে উদ্দাম, কখনো বা ধীরগতি। জীবনে বসন্তাগমের মতোই মধুর এর সঞ্চরণ। কুশলী লেখক এই গ্রন্থে দুটি বা ততোধিক তরুণ তরুণীর হৃদয়ে এই ঢেউ এর সংঘাতে বিচিত্র ভাবানুভূতির কথা অপূর্ব রসসম্বন্ধ বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেম-বিরহে, মিলনে বিচ্ছেদে, চাটুল্য ও গাম্ভীর্যে এর প্রত্যেকটি গল্প যেমন অপূর্ব রসাভিসিক্ত তেমনি অনেকদিন মনে রাখবার মতো।

–প্রকাশক

১৯৫৪ বিখ্যাত উপন্যাস *কাশবনের কন্যা* প্রকাশিত।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কাশবনের কন্যা, উপন্যাস। রচনাকাল ১৯৪৮। প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬১ (১৯৫৪), প্রকাশকঃ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৬-১৮ বাবুবাজার, ঢাকা-১। প্রচ্ছদঃ জয়নুল আবেদীন। সাইজঃ ১/৮ ক্রাউন, পৃষ্ঠাঃ ২৯২। দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৩৬৪ (১৯৫৭), টাইপঃ ? ; সাইজঃ ক্রাউন। প্রকাশক : মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৬-১৮ বাবুবাজার, ঢাকা-১। *প্রচ্ছদঃ জয়নুল আবেদীন।* সাইজঃ ১/৮ ক্রাউন, পৃষ্ঠাঃ ২৯২। তৃতীয় সংস্করণঃ বৈশাখ ১৩৭৫ (১৯৬৮), প্রকাশক : মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৬-১৮ বাবুবাজার, ঢাকা-১। অঙ্গভূষণঃ জয়নুল আবেদীন। প্রচ্ছদঃ মহিউদ্দীন ফারুক। মুদ্রণ : কালচারাল প্রেস, ৬৮ বেচারাম দেউড়ী , ঢাকা-১। দাম : পাঁচ টাকা। পৃষ্ঠাঃ ২২৪ + ১৬। টাইপঃ ?, সাইজঃ ১/৮ ডিমাই।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

কাশবনের কন্যা কথাশিল্পী শামসুদ্‌দীন আবুল কামামের প্রথম এবং পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পাঠক-সমালোচক মহলে উপন্যাসটি অভিনন্দিত ও বহু-আলোচিত। তৃতীয় সংস্করনের আত্মপ্রকাশ উপন্যাসটির জনপ্রিয়তারই নিদর্শন।

পাঠক মহলের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়ে গেল। বইটি ইতিপূর্বে ক্রাউন সাইজে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণ ডিমাই সাইজে প্রকাশ করা হলো।

উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদীন। সাইজ পরিবর্তনের ফলে সেই প্রচ্ছদচিত্রটি বর্তমান সংস্করণে ব্যবহার করা সম্ভব হলো না। নানা কারণে জয়নুল আবেদীনের পথে নতুন প্রচ্ছদচিত্র এঁকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমান সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন তাঁরই ছাত্র শিল্পী মহিউদ্দীন ফারুক।

আশা করি *কাশবনের কন্যার* নতুন সংস্করণ আগের মতোই পাঠক ও সুধী মহলের মনোব্যঞ্জনে সক্ষম হবে।

–প্রকাশক

জয়ন্তী সংস্করণ

প্রকাশকাল: ১৯৮৭। প্রকাশক: চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। মুদ্রাকর প্রভাংশুরঞ্জন সাহা, ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। প্রচ্ছদ শিল্পাচার্য জযনুল আবেদীনের আঁকা ছবি অবলম্বনে হাশেম খান। মূল্য সাদা: ৭৫.০০ টাকা, লেখক কাগজ: ৫৫.০০। সাইজ: ১/৮ ডিমাই, পৃষ্ঠা: ২৫৪। টাইপ: মনোটাইপ। পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ: প্রকাশসাল: আষাঢ় ১৪১০, জুন ২০০৩। প্রকাশক: শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চিরায়ত প্রকাশন, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩। পৃষ্ঠা: ১৮৮, ১/৮ ডিমাই সাইজ। টাইপ: কম্পিউটার কম্পোজ। ভূমিকা : পবিত্র সরকার।

১৯৫৫ আবুল কালাম শামসুদ্‌দীনের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম নাম গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত গ্রন্থ

আলম নগরের উপকথা, উপন্যাস। রচনাকাল ১৯৫২। দুই মহল নামে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশঃ ১ বৈশাখ ১৩৬২ (১৯৫৫)। প্রকাশকঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী, কোহিনূর, লাইব্রেরী, ৩৫ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা-১। সাইজঃ ১/৮ ডিমাই, পৃষ্ঠাঃ ২৩৬। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় নাম বদলে আলম নগরের উপকথা রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকাশঃ শ্রাবণ ১৩৭১। প্রকাশকঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী, কোহিনূর, লাইব্রেরী, ৩৫ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা-১। প্রচ্ছদপটঃ প্রাণেশকুমার মণ্ডল। ছেপেছেনঃ এ.আর চৌধুরী, কোহিনূর প্রেস। ৩৫ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা-১। সাইজঃ ১/৮ ডিমাই, পৃষ্ঠাঃ ২৩৬। সাইজঃ ১/৮ ডিমাই, স্মল পাইকা; পৃষ্ঠাঃ ২১৫। উৎসর্গঃ মোসাম্মাৎ নগিনা খাতুন ও মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম-এর করকমলে--

একটি শ্রুত কাহিনীর আংশিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া উপখ্যানখানি রচিত হয়েছে। মূলতঃ ইহা চলচ্চিত্রের জন্যই রচিত হইয়াছিল - চলচ্চিত্রখানি এখনও অসমাপ্ত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। ইহার মূল ঘটনাবলম্বনে একখানি মঞ্চনাটকও লিখিত হইয়াছে।

প্রকাশক জনাব আজিজুর রহমান চৌধুরী এই জাতীয় পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে নবাগত। এই পুস্তকের রচনাই কেবল আমার - বাকি কৃতিত্ব তাঁহারই।

আরেকটি কথা, এই উপাখ্যানের বিষয়বস্তু, চরিত্র প্রভৃতির সহিত কাহারও সদৃশ্য যদি থাকিয়াও থাকে তাহা ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্যমূলক নহে।

২৪ / এ, আজিমপুর এস্টেটস্, ঢাকা। শামসুদ্দীন আবুল কালাম

আশিয়ানা, উপন্যাস। রচনাকালঃ ১৯৪৭-৪৮। প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৫৫। প্রকাশকঃ রাজ মুহাম্মদ সরকার, জাহাঙ্গীর পাবলিশিং হাউস, ২১নং রাজার দেউড়ি, ঢাকা। মুদ্রাকরঃ আবদুল মজিদ সরকার, ২/২ রাজার দেউড়ি, ঢাকা। প্রচ্ছদপটঃ হাবিবুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

পাঠান। মূল্যঃ এক টাকা চার আনা মাত্র। সাইজঃ ১/৮ ডিমাই। উৎসর্গঃ জয়নুল আবেদীনকে।

নিবেদক

এই গ্রন্থের মূল কাহিনী 'একটি নীড়ের কাহিনী' নামক ছোটগল্পের আকারে কলিকাতা হইতে 'মহাকাল' (শ্রী প্রতাপ রায়) সম্পাদিত 'কালান্তর' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৪৯ সনে রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা হইতে ইহার বেতার-নার্ট্যরূপ প্রচারিত হয়। বেতার-নাট্যে ইহার নোতুন নামকরণ করা হইয়াছিল 'নীড়'; উক্ত গল্প এবং বেতার-নাট্য অবলম্বনেই বর্তমান চিত্রনাট্যটি রচিত হইয়াছিল। এই আঙ্গিকে পূর্ব-পাকিস্তানে উপন্যাস লিখিবার প্রচেষ্টা এই প্রথম।

এই চিত্র-নাট্যটি উর্দুতেও অনুবাদিত হইয়াছিল। পাঠক সাধারণের কাছে আদরণীয় হইলে ভবিষ্যতে এই ধরণের আরও বই লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এই পুস্তকখানি প্রকাশের ব্যাপারে বন্ধু অধ্যাপক আহমদ শরীফ, ইকবাল একাডেমী রিসার্চ স্কলার আবু সায়ীদ নুরুদ্দীন, কাজী আবদুল ওয়াদুদ এবং আজাদ ও মোহাম্মদী কর্তৃপক্ষের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ; মামুলী ধন্যবাদ দিয়া তাহা শেষ করা চলে না।

আজাদ-সম্পাদকের নাম ও আমার নাম হুবহু এক হওয়াতে যে সব অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসানের জন্য এখন হইতে আমার নাম 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম' বলিয়া লিখিত হইবে। অনেকে নামের শেষে 'বরিশাল' লিখিতে বলিয়াছিলেন, তাহা শোভন মনে হইল না।

২৪ /এ, আজিমপুর এস্টেটস্, ঢাকা। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম।

দুই হৃদয়ের তীর, ছোটগল্প সংকলন। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৫৫। গল্পসূচিঃ নবমেঘভার, এক দুপুর বেলার দুর, প্রথম হাসির ইতিকথা, অম্লমধুর, যুগে যুগে, অভাবনীয় নীল দেওয়াল এবং দুই হৃদয়ের তীর।

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের নিবেদন

এই গল্পগুলো বিভিন্ন সম্পাদক-বন্ধুদের তাগিদে লেখা। কিন্তু সংকলন কালে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এ জাতীয় অন্যান্য বহু লেখা ছিল, কিন্তু সেইসব গল্পের কোনো কপিই আমার কাছে নেই। আরেক কথা, দৈনিক আজাদ পত্রিকা সম্পাদক ও আমার নাম এক হওয়াতে যে সব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, তার অবসানের জন্য এখন থেকে আমার নাম 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম' বলে লেখা হবে।

১৯৫৬ চলচ্চিত্র বিষয়ে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোর ফেলোশীপ লাভ। ছয় মাসেরও অধিক কাল পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর।

ইউনেস্কো কর্তৃক *কাশমনের কন্যা* অনুবাদের জন্য ৫০০ ডলার বরাদ্দ হলেও বইটি অসম্পূর্ণ এই অজুহাতে অনুবাদ দিতে অসম্মত।

প্রকাশিত গ্রন্থ

জীবন কাব্য, উপন্যাস। রচনাকাল: ১৯৪৭-১৯৫৩। প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৬৩, (১৯৫৬)। প্রকাশক: এ আহমদ, পক্ষে প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা। মুদ্রক: এ আহমদ, দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী: মোস্তফা শওকত কামাল। দাম: তিন টাকা। উৎসর্গ: জনাব আবু হোসেন সরকার শ্রদ্ধাভাজনেষু। সাইজ: ১/৮ ব্রাউন। টাইপ: মনোটাইপ। পৃষ্ঠা: ১৪৪+৮।

নিবেদন

বিভিন্ন সময়ে লেখা কতকগুলি গল্পকে একটি মৌলিক ভাবানুসারে গ্রহণ করিয়া বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করা হইল। ইহার প্রকাশনার ব্যাপারে কবি ও মনস্বী লেখক সৈয়দ আলী আহসান-এর সহায়তা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

Dhaka University Institutional Repository

আজাদ-সম্পাদক সাহেবের নামের সঙ্গে আমার নাম এক হওয়াতে যে সব অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিরসনের জন্য এখন হইতে আমার নাম 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম' লিখিতেছি। আমার অন্যান্য বই-এর একটি তালিকাও এই গ্রন্থের সঙ্গে দেওয়া হইল।

২৪ এ আজিমপুর এস্টেট্‌স — বিনীত

ঢাকা, আষাঢ়, ১৩৬৩ — শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম

১৯৫৭ সফর শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

কিশোর রহস্য উপন্যাস *কাকলি মুখর,* প্রকাশিত। ছোটগল্প সংকলন *শাহেরবানু-র* দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত।

১৯৫৮ রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান। ফ্র্যাংকফার্ট বুক ফেয়ারে যোগদান।

১৯৫৯ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে ইতালীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান 'সিনে সিত্তা'-য় (Cine Citta) ফটোগ্রাফি, সেট-ডিজাইনিং, পাশ্চাত্য সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্র সম্পাদনা সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য তিনি রোমে ফিরে যান। এবং রোমের 'একসপেরিমেন্টাল সেন্টার অব সিনেমেটোগ্রাফি' থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ শেষে একটি ডিপ্লোমা লাভ।

কিশোর উপন্যাস *'সবাই যাকে করল হেলা'* প্রকাশিত। করাচিতে অনুষ্ঠিত নিলিল পাকিস্তান লেখক সম্মেলনে যোগদান।

প্রকাশিত গ্রন্থ

সবাই যাকে করলো হেলা কিশোর উপন্যাসন। রচনাকাল: ১৯৫৪। প্রথম প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ১৯৫৯। প্রকাশক: মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৬/১৮ বাবুবাজার, ঢাকা। মুদ্রণ: মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম। কালচারাল প্রেস, ১৪/১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা। উৎসর্গ: যে ছেলেরা এবং মেয়েরা লেখাপড়ায় ভালো নয়,/সবাই যাদের নিন্দা করে/হেলা করে/যারা নীরবে মনে মনে দুঃখ বয়ে বেড়ায়/কেউ যাদের মূল্য

Dhaka University Institutional Repository

দেয় না, ভালোবাসে না/তাদের উদ্দেশ্যে। দাম: ১৭।. সাইজ: ১/৮ ক্রাউন; টাইপ; পাইকা; পৃষ্ঠা: ১১০+৮।

১৯৬১ উপন্যাস *কাঞ্চনমালা* প্রকাশিত।

প্রকাশিত গ্রন্থ

'কাঞ্চনমাল' উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ; ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ (১৯৬১)। প্রকাশক: মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৬/১৮ বাবুবাজার, ঢাকা। মুদ্রণ: মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম। কালচারাল প্রেস, ১৪/১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদপট: প্রাণেশকুমার মণ্ডল। মূল্য: চার টাকা। সাইজ: ১/৮ ডিমাই। টাইপ: পাইকা টাইপ। পৃষ্ঠা: ২২৫+৪। দ্বিতীয় প্রকাশ: ২৪শে ভাদ্র ১৩৭২। ছেপেছেন এ.আর চৌধুরী, কোহিনুর প্রেস। ৩৫ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা-১। সাইজ: ১/৮ ক্রাউন সাইজ। মূল্য: চার টাকা, পৃষ্ঠা: ২২৪।

১৯৬৪ উপন্যাস সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ।

১৯৭১ প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহর করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। মুজিবনগর সরকারের পক্ষে সরকারি সমর্থন লাভের জন্যে এবং নির্যাতিত বাঙালিদের পক্ষে সহানুভূতিশীল মনোভাব গড়ে তুলতে ব্যক্তিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি। সে উদ্যোগের অংশ হিসেবে তিনি ইতালীয় ভাষায় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য ও ক্ষ্য সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৯৭২ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রথমবার অল্পদিনের জন্য আসেন।

The Battle of Bangladesh অবলম্বনে বাংলা উপন্যাস *কাঞ্চনগ্রাম*-এর একটি ছোট বাংলা সংস্করণ প্রণয়ন। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন। কিন্তু ছাপা হয়নি। ব্যাপক পরিবর্ধন পরিমার্জন চলতে থাকে বেশ কয়েক বছর ব্যাপী।

১৯৭৩ উপন্যাস *জায়জঙ্গল* প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত গ্রন্থ

জায়জঙ্গল, উপন্যাস। রচনাকাল: ১৯৭৩। প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৮ ॥ প্রকাশক: লেখক নিজে। প্রচ্ছদ; কাইয়ুম চৌধুরী। উৎসর্গ: আমার মা-মণি, কমল-মণি, ক্যামেলিয়ার জন্মদিনে। পৃষ্ঠা: সাইজ: ১/৮ ডিমাই।

ভূমিকা

শ্রীহট্টের জঙ্গল এলাকায় একবার একটি বৃহৎ সাপ এবং হাতির যুদ্ধের সময় তাদের উভয়ের ক্রন্দন আমাকে খুবই বিচলিত করেছিল। আমি তখন হাতিটির প্রতিই অধিক মমত্ববোধ করেছিলাম। মানুষের নানা ক্রন্দন ও আর্তনাদও আমাকে সারাজীবন কষ্ট দিচ্ছে; কিন্তু ঐ ঘটনাটি আমাতকে পরবর্তী জীবনে সর্বদা কর্তব্যের প্রতি সজাগ ও সতক'ই রেখে এসেছে।

প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের লেখা *কাশবনের কন্যা* বইখানা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই আমি এই নবীন ঔপন্যাসিককে অজস্র প্রশংসা করেছিলাম। এটা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। এরপর দীর্ঘকাল যাবৎ ইউরোপ প্রবাসী থেকেও বিদেশে বসেই যত্ন করে বাংলাদেশের পরিবেশের স্মৃতিচারণ করে স্বদেশ-প্রীতির প্রামন করেছেন। তাঁর সমস্ত রচনার ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ, আর অসুন্দরের প্রতি বিকর্ষণ। 'সুন্দরবনে' হোক অথবা অন্য 'বনে'ই হোক, তিনি 'বাঘ'-এর সঙ্গেও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বিষয়েও সজাগ। কিন্তু প্রকৃতিলালিত সেই জন্তু ও অসঙ্গত আক্রমনে উদ্যোগী হলে তিনি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তার মুখোমুখি হতে পশ্চাৎপদ নন। তাঁর এই বর্তমান উওপন্যাস *জায়ঙ্গল* তারই প্রমাণ বহন করেছে। জীবজন্তু ও উদ্ভিদজগৎও আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁরই সৃষ্ট দেশ-প্রকৃতি ও মানুষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সৌন্দর্য ও মূল্যবোধের প্রধান কারিগর। একে বিনষ্ট করে মানুষের সাময়িক নানা চাহিদা মিটলেও পরিণামে তা মানুষেরই সুন্দর বৃত্তিকে ধ্বংস করবে - এই মূল বক্তব্যের সঙ্গে এই গ্রন্থে দেশের এক অনন্য পটভূমিতে যে রসময় চিত্র উপস্থিত তিনি করেছেন তা ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করে কেউ প্রকাশ করেন নি।

বর্তমান উপন্যাস এ-বিষয়ে পাঠক সমাজের চিন্তাকে সাহায্য করতে পারলে লেখকেরও শ্রম সার্থক হবে এবং আমিও আনন্দিত হবো।

* কাজী মোতাহার হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

* সাহিত্য প্রকাশের মুদ্রণে কাজী মোতাহার হোসে কর্তৃক লিখিত ঐ একই ভূমিকার নীচে বাংলাদেশ জাতীয় অধ্যাপক পরিচিতি রয়েছে।

সবিনয় নিবেদন

আঞ্চলিক জীবনোপযোগী ভাষা-ব্যবহারের প্রচেষ্টা পরীক্ষামূলক; এর মধ্যে লেখকের প্রাচীন রীতির দোষারোপ অন্যায় হইবে, গ্রন্থটি যাহাতে অধিক সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই বক্ষ্যমান আঙ্গিক ব্যবহার করিয়াছি।

কোনওদিন আমার কোনও বইর সঙ্গে পরিচয়পত্র দিই নাই। দেশ ও সমাজের স্বকীয় বিজ্ঞাননির্ভর ঐশচিন্তা এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের পরিচয়পত্রটির জন্য তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

পরম কল্যাণীয়া সেলিনা বাহার জামানের প্রচেষ্টা এবং তাহার পরিবারের সকলের উদ্যম উৎসাহ এবং পরিশ্রম ব্যতিরেকে এই বই হয়তো কোনোদিনই লোকসমক্ষে উপস্থাপনের সুযোগ হইতো না।

ঢাকা — লেখক

অগ্রাহয়ণ পূর্ণিমা, ১৩৮৫

প্রথম সাহিত্য প্রকাশ মুদ্রণঃ ফাল্গুন ১৪০৯, ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ॥ প্রকাশকঃ মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৩৭/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। হরফ বিন্যাসঃ কম্পিউটার প্রকাশ, ৩৭/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। মুদ্রাকরঃকমলা প্রিন্টার্স, ৬০/এ-১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। প্রচ্ছদ চিত্রঃ কাইয়ুম চৌধুরী কৃত 'সুন্দরবন' সিরিজের তৈলচিত্র। মূল্যঃ একশ টাকা; টাইপঃ সুতন্বী, বিজয় সফটওয়্যার। সাইজঃ ১/৮ ডিমাই, পৃষ্ঠাঃ ১৪২।

১৯৭৮ স্বল্প সময়ের জন্য স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। স্বউদ্যোগে উপন্যাস *জায়জঙ্গল*-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ।

১৯৭৯ সকন্যা পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ, কয়েকদিন লন্ডণে অবস্থান।

১৯৮৫ উপন্যাস *মনের মতো ঠাঁই* প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত গ্রন্থ

মনের মতো ঠাঁই, উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, প্রকাশক: চিত্তরঞ্জন সাহা; মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১; মুদ্রাকর: প্রভাংশুরঞ্জন সাহা, ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১; প্রচ্ছদ-শিল্পী: হাশেম খান, মূল্য: সাদা : ২২.০০, নিউজপ্রিন্ট: ১৬.০০; পৃষ্ঠা: ৯২, সাইজ: ১/৮ ডিমাই, টাইপ: প্রগতি; লেটার প্রেস-এ ছাপা।

১৯৮৬ উপন্যাস *সমুদ্র বাসর* ও *যার সাথে যার* প্রকাশিত।

প্রকাশিত গ্রন্থ

সমুদ্র বাসর উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬, জানুয়ারি। প্রকাশক: চিত্তরঞ্জন সাহা; মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১; মুদ্রাকর: প্রভাংশুরঞ্জন সাহা, ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১; প্রচ্ছদ-শিল্পী: আবুল বারক আলভী। উৎসর্গ পাতার লেখা: জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, বেগম জাহান আরা মুকসুদ আলীকে। মূল্য: সাদা : ৭৫.৫০, লেখক কাগজ: ৫৫.০০; সাইজ: ১/৮ ডিমাই, টাইপ: প্রগতি; পৃষ্ঠা: ৩৩৯।

মূল উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৪৭-৪৮, বর্তমান আংশিক পুনর্লিখন ও সংস্করণ ১৯৮০-৮১ সালে। আঞ্চলিক সাদৃশ্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রাচীন গদ্যরীতি ব্যবহৃত।

যার সাথে যার উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬, ডিসেম্বর। প্রকাশক: চিত্তরঞ্জন সাহা; মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১; মুদ্রাকর: ওবায়দুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রচ্ছদ-শিল্পী: গোলাম সারোয়ার। উৎসর্গ: আলবার্তো মোবাভিয়া সুহৃৎ-সুজনেষু। মূল্য: সাদা : ৪৫.০০, লেখক কাগজ: ৩০.০০; সাইজ: ১/৮ ডিমাই, টাইপ: মনোটাইপ; পৃষ্ঠা: ১৪৩।

১৯৮৭ ছোটগল্প সংকলন *পুঁই ডালিমের কাব্য* প্রকাশিত।

কাশবনের কন্যা উপন্যাসের পরিমার্জিত রজতজয়ন্তী সংস্করণ প্রকাশিত।

উপন্যাস *নবান্ন* প্রকাশিত।

বৃহদকায় উপন্যাস *কাঞ্চনগ্রাম* রচনা ও পরিমার্জনা সম্পন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত গ্রন্থ

মজাগাঙের গান, গল্প-সংকলন। প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭। প্রকাশক: চিত্তরঞ্জন সাহা; মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১; মুদ্রাকর: প্রভাংশুরঞ্জন সাহা, ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১; প্রচ্ছদ-শিল্পী: সিরাজুল হক। মূল্য: সাদা : ৩০.০০, লেখক: ২২.০০; ভেতরে প্রতিটি গল্পে ছবি আছে। সিরাজুল হকের আঁকা সম্ভবত। উৎসর্গ পাতায় লেখা আছে: বেগম আনোয়ার বাহার চৌধুরীকে। গল্পসূচী: ১. রক্তের স্বাদ, ২. নকল, ৩. নেপথ্যে, ৪. ওয়েভলেংথ, ৫. মানস কন্যা, ৬. মজাগাঙের গান, ৭. সুটকেস, ৮. দায়-দাবি, ৯. কথা, ১০. একটি প্রবন্ধের গল্প। সাইজ: ১/৮ ডিমাই, টাইপ: স্মল পাইকা, পৃষ্ঠা: ১০২। গল্পগুলি ১৯৭২-৮৩ সালে লিখিত এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত।

পুঁই ডালিমের কাব্য, গল্প-সংকলন। প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৯৪। প্রকাশক: চিত্তরঞ্জন সাহা; মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১; মুদ্রাকর: প্রভাংশুরঞ্জন সাহা, ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১; প্রচ্ছদ-শিল্পী: হাশেম খান, উৎসর্গ: ডক্টর শিশির কুমার বরাট, সুহৃদ্বরেষু। মূল্য: সাদা : ৪৫.০০, লেখক: ৩২.০০; সাইজ: ১/৮ ডিমাই, টাইপ: আধুনিক রোমান হ্যান্ড কম্পোজ; পৃষ্ঠা: ১৪২।

১৯৭২ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। সুতরাং রচনাকালের আনুমানিক সময়ও সেইভাবে ধরে নিতে হবে। একটা পরিবর্তনশীল সমাজের বিভিন্ন চিত্রকল্প এবং সামাজিক ইঙ্গিতগুলোই মুখ্য।

গল্পসূচী: ১. পুঁই ডালিমের কাব্য, ২. জীবন-শিল্পী, ৩. লালবাত্তি, ৪. কায়কারবার, ৫. ভাঙন, ৬. গায়ের আগুন, ৭. সেই লোকটি আর সেই পাখিটির কথা, ৮. সেই লোকটি, সেই মেয়েটির আর সেই মাছটির গল্প, ৯. সেই মেয়েটি ও তার কাঠ গোলাপের গাছটির কথা, ১০. রাগ বিরাগের নানাজি, ১১. ম্যাজিক-লণ্ঠন, ১২. মরম না জানে (রচনাকাল: রোম ২০ মে ১৯৭৯), ১৩. যৌল (রচনাকাল: রোম ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬)।

নবান্ন, উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭। প্রকাশক: চিত্তরঞ্জন সাহা; মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১; মুদ্রাকর: প্রভাংশুরঞ্জন সাহা, ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১; প্রচ্ছদ-শিল্পী: হাশেম খান, ছবি: সুমনা (সঙ্গীত শিল্পী সুমনা হক), মূল্য: ৩২.০০,

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠাঃ ৯৪, সাইজঃ ১/৮ ডিমাই, আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং বহুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক শিল্প-সাহিত্যের ও বিভিন্ন গুণান্বিত চারিত্র্য জীবন-ধ্যান ও যাপনে যার কোনও দ্বৈততা নেই। একদিন যার প্রতিভা জাতির গর্বের কারণ হবে বলে বিশ্বাস করি।

অধ্যাপক এ.এম. হারুন-অর রশীদ

১৯৮৯ নবান্ন উপন্যাসের ইংরেজি ও ইতালীয় সংস্করণ The Garden of Cain Fruits -এর রচনা শুরু। গ্রন্থকারে কখনো প্রকাশিত হয়নি।

১৯৯৩ স্বাধীনতা আন্দোলন ভিত্তিক রচনা The Garden of Cain Fruits -এর পাঠ চূড়ান্ত করণ।

১৯৯৫ The Garden of Cain Fruits পরিমার্জন পরিবর্তন।

১৯৯৭ ১০ জানুয়ারি (আনুমানিক) তার মৃত্যু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লেখকের মৃত্যুর প্রকৃত তারিখ জানা কঠিন। স্বদেশ থেকে বহুদূরে পরবাসে নির্জনে মৃত্যুবরণ করেছেন এ কালজয়ী কথাসাহিত্যিক। ইতালিতে যেদিন তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, সেদিন ছিলে ১০ জানুয়ারি। তবে মৃত্যু যে ওই তারিখের আগেই হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। কেনা তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষ বলেন, ১০ জানুয়ারি, ১৯৯৭ তারিখ স্নানাগারে পানির পাইপ মেরামতের জন্য একজন মিস্ত্রি তার এ্যাপার্টমেন্টে আসে। কোন সাড়া না পেয়ে মিস্ত্রি বাড়ির দ্বার রক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বহুকালের পুরনো এই দ্বার রক্ষক অ্যান্টোনিয়ো কযেক দিন তাঁকে দেখেনি বলে জানায়।

তাই তারা ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেয়। ফায়ার ব্রিগেড কর্মী পেছনের জানালা দিয়ে ঢুকে সোফা-বেডের উপর তাঁর মৃত দেহ দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মৃত দেহের দায়িত্ব গ্রহণ করে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে 'সিমিটেরো কমিউনালে দেল ভেরোনা' (Cimetero Comunale Del Verona) নামে পরিচিত রোমের প্রধান কবরস্থানে তাঁর মৃতদেহ দাফন করা হয়। 'পোস্টমর্টেম' রিপোর্টে উল্লেহিত তাঁর মৃত্যুর কারণ এবং সঠিক তারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ রাজি

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে, 'গত ৭ মার্চ, ১৯৯৭ ভোরবেলা চায়ের টেবিলে 'ভোরের কাগজ' আর 'জনকণ্ঠে' দেখলাম কালমা ভাইয়ের মৃত্যুর খবর।গত পাঁচ তারিখে রোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১ শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের মৃত্যুর সংবাদ ঢাকায় এসেছে লেখক ও সাংবাদিক জনাব আবদুল মতিনের মাধ্যমে। ২ শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুর খবর তাঁর কাছ থেকে জানতে পারে। '২৭ দিন আগে নাকি তাঁর মৃত্যু হয়েছে আর আমরা জানলাম ২৭ দিন পর'। ৩ 'প্রখ্যাত সাহিত্যিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম আর নেই। গত মঙ্গলবার ইতালির রাজধানি রোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর'।৪

বিশিষ্ট কথাশিল্পী শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম প্রায় ৪০ বছরদেশের বাইরে বসবাস করার ফলে জীবনসায়াহ্নে তিনি দেশবাসীর কাছে অতীতের মানুষরূপে পরিণত হন। তাঁর মৃত্যুর পর দু'একটি পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাঁর সাহিত্যকর্ম অনুপস্থিত, সবই স্মৃতচারণমূলক। তাঁর সম্পর্কে আমাদের যোগযোগহীনতা এর অন্যতম কারণ। শুধু আত্মীয়-স্বজন নয়, স্বদেশের সমসাময়িক কথাশিল্পী ও সমালোচকদের সঙ্গেও তাঁর দুঃখজনক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। প্রচারবিমুখতা এবং আত্মভিমান এ দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। ফলে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ রোম থেকে ঢাকা পৌঁছতে পুরো দু'মাস সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। ' শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম পঞ্চাশের পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী, পরিণত বয়সে প্রিয়জনহীন পরবাসে পরলোক গমন করেছেন ১০ জানুয়ারি, ১৯৯৭।' ৫ 'সেটি এক বিস্ময়কর ঘটনা সন্দেহ নেই। কারণ তিনি শের শাহের শামসনকালে ইতালিতে মারা গেলেও একমাসের আগেই বাংলাদেশের সাহিত্যজগতে পৌঁছে যেত তাঁর মৃত্যুর খবর।'৬ শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের প্রকৃত মৃত্যুর তারিখ হয়তো আর কোননোদিনই জানা যাবে না, যেমন জানা যাবে না তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল কিনা। কেননা, লেখকের একমাত্র আত্মজা ক্যামেলিয়া পত্রিকায় এবং তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ক্যামেলিয়ার কথা'য় দাবি করেছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটেনি। ফলে দু'টো বিষয়ই এখনও রহস্যাবৃত। তাঁর' জন্মতারিখেরও নির্ভরযোগ্য কোন উৎস নেই। তাঁর পাসপোর্টের তথ্য অনুযায়ী তার জন্ম তারিখ ১ এপ্রিল ১৯২৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৮ মৃত্যুর পর বৃহদকায় উপন্যাস *কাঞ্চনগ্রাম* প্রকাশিত।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কাঞ্চনগ্রাম, উপন্যাস। প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮। প্রকাশকঃ সাহিত্য প্রকাশ, মফিজুল হক, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। হরফ বিন্যাসঃ কম্পিউটার প্রকাশ। মুদ্রকরঃ কমলা প্রিন্টার্স, ৪০/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। উৎসর্গঃ জননী ও জনক গুলমেহের মেহের খানম মুনশী আকরাম আলী এবং ভ্রাতৃপ্রতিম অধ্যাপক মকসুদ আলীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

প্রথম রচনা-খসড়াঃ জুন-জুলাই, ১৯৭২ ঢাকা এবং রোম প্রথম বাংলা ও ইংরেজি চিত্রনাট্য জুন-জুলাই এবং জানুয়ারি ১৯৭২। পুনর্লিখনঃ অক্টোবর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, রোম, মিলান হাসপাতাল (সান রাফায়েল) এবং মার্চ-এপ্রিল ঢাকা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিকরণে সহায়তাঃ সিনোরিনা কনসটানজা দি পালমা, অধ্যাপিকা মেরী চৌধুরী, বন্যা আহমদ, অ্যাডভোকেট হাবীবুর রহমান, গিরীশচন্দ্র রায় এবং হাবীবুর রহমান।

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় অবস্থান কালে লেখা শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে রোম ফিরে যাওয়ার পর *কাঞ্চনগ্রাম* এর পাণ্ডুলিপি সম্পন্ন। ১৯৮৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে রোম ও মিলান শহরের সান রাফায়েল হাসপাতালে লেখক উপন্যাসটি পুনর্লিখনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসের ঢাকায় অবস্থানকালে পুনর্লিখন সমাপ্ত। মূল্যঃ তিনশত পঞ্চাশ টাকা। সাইজঃ ১/৮ ডিমাই সাইজ। টাইপঃ কম্পিউটার কম্পোজঃ সুতন্বী ফন্ট, বিজয় সফটওয়্যার; পৃষ্ঠাঃ ৫৮৪।

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

সোনারগাঁও, দুমুড়ি সময়, কল্যাণীয়াসু, সিরতাকী, ক্ষীরসাগর, পালতোলা নাও,ঢেউভরা নদী, সাগর ঠিকানা, কূল-উপকূল, জীবনকতো, ঈষদাভাস (আত্মজীবনী প্রথম খণ্ড) এবং একমাত্র ইংরেজি উপন্যাস *দি গার্ডেন অব কেইন ফ্রুটস*। রয়েছে প্রব'নধ সংকলন জয় জীবন।

Dhaka University Institutional Repository

আরো কিছু জীবন-তথ্য

বার্ট্রান্ড রাসেল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জওহরলাল নেহেরু, একে ফজলুল হক, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পত্র যোগাযোগ ছিল। চল্লিশের দশকে দুটি নাটক লিখেছিলেন; একটি কবি শেলির জীবন অবলম্বনে অন্যটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *মহেশ* গল্প অবলম্বনে।

দেশভাগের আগে শুরু হয়ে নয় ফর্মা ছাপা হওয়া উপন্যাস *পলিমাটির দেশ* দাঙ্গার কারণে মুদ্রণ শেষ না হওয়া পাণ্ডুলিপি সহ ছাপা অংশ এবং কিশোর উপন্যাস *দুঃখমোচন* এর কপি নিকটাত্মীয়ের বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে। ওগুলো ঐ নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে সংরক্ষিত রাখা ছিল। *পাল তোলা নাও, ঢেউ ভরা নদী, সাগর ঠিকানা, ক্ষীরসায়রের উপন্যাস, নাট্যমণ্ডপ, চরবৈশাখী* (দৈনিক আজাদ পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়েছিল, আজাদ পত্রিকা কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার সময় লেখাটি হারিয়ে যায়) তাঁর অপ্রকাশিত ও খোয়া যাওয়া উপন্যাস।

কল্যাণীয়াসু বা ক্যামেলিয়ার চিঠি নামে তাঁর আর একটি পাণ্ডুলিপি নিকটাত্মীয়ের বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে। সম্ভবত ঐ লেখাগুলোর কয়েকটি সাপ্তাহিক *পূর্বাণী* পত্রিকায় আশির দশকে প্রকাশিত হয়েছিল।*জয় জীবন* নামে অপ্রকাশিত একটি প্রবন্ধের বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল। কবি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তাঁর গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।চল্লিশের প্রথম দিকে রাজনৈতিক সংগঠন 'রেভোলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি' বা 'আর এস পি'এর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। স্কুলের ছাত্র থাকাকালে 'শিশু-সাথী' পত্রিকায় প্রায়ই লিখতেন। তিনি 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। আনুমানিক ১৯৪৯ সালে স্থানীভাবে বসবাসের জন্য তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন।জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব খাদ্য কার্যক্রমের অধীনে গণসংযোগ বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবে দীর্ঘকাল কাজ করেন। মৃৎশিল্প, চিত্রাঙ্কন, ফটোগ্রাফি, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। নিজে সেতার বাজাতে পারতেন। রোমে চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইতালির চলচ্চিত্রজগত ও সাহিত্যজগতের অনেকের সঙ্গেই নিবিড় ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল।